অপারেশন কাশ্মীর

গজনবীর দেশ থেকে সোমনাথের পথে

অপারেশন কাশ্মীর

গজনবীর দেশ থেকে সোমনাথের পথে

রচনা

- হাফেজ আকরামুল্লাহ
- আমজাদ বেলাল
- শামশীর খান
- শের খান

অনুবাদ

মনজুর হাসান (রহঃ)

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

আসাদ বিন মাকসূদ

জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন্স

গজনবীর দেশ থেকে সোমনাথের পথে

প্রকাশক

মুফতী আবদুল হাই

চেয়ারম্যান, জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন্স

তালতলা, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি ১৯৯৭

দশম প্রকাশ

আগস্ট ২০০৩

কম্পিউটার কম্পোজ

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

আশ্-শামস্ কম্পিউটার

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

GAZNAVIR DESH THEKEY SOMNATHER PATHEY, Published by Mufti Abdul Hai, Chairman, Jago Mujahid, Publications, Taltala, Khilgaon, Dhaka-1219. First Edition January 1997, Tenth Edition August 2003.

Price : Taka Fifty only

ভূমিকা

কাশ্মীর উপত্যকায় এখন আগুন জ্বলছে। সাতচল্লিশ বছর আগে আমরা যখন বৃটিশের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস গ্রহণ করি, যখন সমগ্র উপমহাদেশের মানুষ দুইশত বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীন আবাস রচনা করে, তখন নিজ মাতৃভূমিতে কাশ্মীর উপত্যকার মানুষ আবার বন্দী হয়ে পড়ে স্বদেশী উপনিবেশবাদের বন্দী শিবিরে। নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

শেরে কাশ্মীর শেখ আব্দুল্লাহ এই উপমহাদেশের মুক্তি আন্দোলনের প্রথম শ্রেণীর নায়ক ছিলেন। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের অগ্রসেনানী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বহুদিন। তার বড় ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন শেখ আব্দুল্লাহ। ভারতবাসী ও আমাদের মত কাশ্মীরীরাও আশায় বুক বেঁধে ছিল স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণের জন্যে। নেহেরু কাশ্মীরের হিন্দুরাজা হরি সিংকে আলিঙ্গন করে নিলেন আর কাশ্মীরের সিংহপুরুষ শেখ আব্দুল্লাহকে জেলে পুরলেন, বন্দুকের নল ঘুরিয়ে দিলেন কাশ্মীরের জনগণের দিকে।

কিন্তু কাশ্মীরের মুসলমানদের কী হল? ওরা তো ইংরেজ বা অন্য কারো দাস ছিল না! কোন পণ্ডিতের শিষ্যও নয় ওরা! ওরা কোন জাতীয়তাবাদের বন্দেগী করে না। ভারতবর্ষ ওদের ভাগ্যবিধাতা নয়। কাশ্মীরের মুসলমানদের বিধানদাতা, প্রতিপালক, পরওয়ারেদিগার মহান আল্লাহ। তাদের কাণ্ডারী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)।

চৌদ্দশত বছর ধরে যে কাফেলা পৃথিবীর পথ ধরে চলছে, ওরা দুনিয়াকে শান্তির পথ দেখিয়েছে, ইনসাফ কায়েম করেছে, মানবতাকে মহান করেছে এবং তাদের এক দল মর্দে মুমিন কখনো তরবারী কোষবদ্ধ করেনি। ওরা যুগে যুগে মুসলমানকে অপমান ও শৃঙ্খল থেকে মুক্ত রেখেছে। বর্তমান পৃথিবীতে এই কাফেলাটি তার পদচারণা কায়েম রেখেছে, ভবিষ্যতেও রাখবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা চালু থাকবে। কেননা, এটি ছিল নবীজীর ওসিয়ত। আজ আফগানিস্তানে, ফিলিস্তীনে, লেবাননে, ফিলিপাইনে, চেচনিয়ায়, বসনিয়ায় এই কাফেলা যেমন পথ অতিক্রম করছে, তেমনি কাশ্মীর উপত্যকাও ওদের পদভারে অবিরত কাঁপছে। মুজাহিদের আযান আজ সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকার পাহাড়-পর্বতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কাফির আর তাগুতের কানে তালা লাগার

উপক্রম হয়েছে। কাশ্মীর শার্দূলদের হুংকারে ওদের কানে বাজ পড়ছে মুহুর্মুহু। কাশ্মীরের বাগানে আজ সত্যিকার অর্থে আগুন জ্বলছে, চারদিকে শুধু বারুদের গন্ধ। স্বাধীন, স্বতন্ত্র আবাস ও ইসলামী জীবন কায়েমের সংগ্রামে লিপ্ত কাশ্মিরী জনতা ও মুজাহিদরা প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ মরণপণ লড়াই করে চলছে। মুক্তিযুদ্ধের এই দীর্ঘ ইতিহাস বিশ্বজগতের অজানা নয়। একটি স্বাধীনতাকামী জাতির প্রতি কী নিষ্ঠুর আচরণ করে চলছে আরেকটি জাতীয়তাবাদী উম্মাদ জাতি, যা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করছে বিশ্ববিবেক। বিশ্ব সংস্থাসমূহের কোন উপদেশ, কোন সমাধান, কোন মীমাংসারই ধার ধারে না এই আধিপত্যবাদী শক্তিটি।

কাশ্মীর উপত্যকার সবুজ প্রান্তরকে উর্বর করে তুলেছে উম্মতে মুহাম্মদী। মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত কাশ্মীর থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখতে পারে না কোন ঈমানদার মুসলমান। কাশ্মীরের হাহাকার শুনে লক্ষ কোটি কর্ণ বধির হয় হোক, কিন্তু মুসলিম নামের প্রতিটি অন্তর পৃথিবীর যেখানে যত আছে আজ আর নিশ্চুপ রয়ে নেই।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহকে সিজদাহকারী দলকে বন্দুকের গুলীতে ভূলুণ্ঠিত করে দেবে এটা বরদাশ্‌ত করা যাবে না। তাই প্রতি উত্তরে বন্দুক গর্জে উঠেছে সাথে সাথে। এখন আর পাখির মত উড়িয়ে দিতে পারে না স্বাধীনতার বীর সেনানীদের। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সশস্ত্র মুজাহিদদের এই বাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছেন দুর্ধর্ষ সেনাপতিরা।

এদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন, আফগান ফেরত পোঁড়খাওয়া দুর্ধর্ষ কমান্ডার নাসরুল্লাহ মনসুর, কমান্ডার আমজাদ বেলাল, কমান্ডার শের খান ও কমান্ডার শামশীর খান। এই চার ঈমানদীপ্ত জানবাজ কমান্ডারের বাস্তব কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত এই বইটি।

লেখাগুলি অনূদিত হয়ে মাসিক জাগো মুজাহিদে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পাঠকদের আগ্রহে এটি বই আকারে প্রকাশে এগিয়ে এসেছে 'জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন্স'।

চেয়ারম্যান

জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন্স

সূচীপত্র

কমান্ডার নাসরুল্লাহ্ মনসূর

গজনবীর দেশ থেকে সোমনাথের পথে

[প্রখ্যাত মুজাহিদ ও জানবাজ গেরিলা কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ্ মনসূর (লেংড়িয়াল) এক দল মুজাহিদ নিয়ে ১৯৯২ সনের ৩১ শে অক্টোবর পাকিস্তান থেকে রওনা হয়ে জিহাদরত নির্যাতিত কাশ্মিরী মুসলমানদের সহযোগিতার জন্য অধিকৃত কাশ্মীরে প্রবেশ করেন।

কাশ্মীরের আকাশচুম্বি বরফঢাকা পাহাড় ও দুর্গম পার্বত্য উপত্যকা অতিক্রম করে কিভাবে তিনি নির্দিষ্ট স্থানে পৌছলেন এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে আক্রমণ চালিয়ে সাফল্য লাভ করলেন, তার বিবরণ তাঁরই সহযাত্রী মুজাহিদ হাফেজ আকরামুল্লাহ্‌র জবানীতে এখানে তুলে ধরা হল]

যাত্রা হল শুরু

১৯৯২ সালের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আমরা কাশ্মীরে প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। প্রতিদিনই ভাবতাম, আজ হয়ত রওনা হয়ে ওপারে গিয়ে পৌছব। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য আমাদের যাত্রা বিলম্বিত হতে লাগল। আমরা নিজ অবস্থান থেকে কয়েকবার বের হয়েও ছিলাম; কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। বারবার ফিরে এসে সস্থানে অপেক্ষা করতে হয়েছে।

অবশেষে ৩১শে অক্টোবরের সকালের সূর্য আমাদের জন্য নিয়ে এল সুখবর। আমরা সকাল সকাল বের হয়ে পাকিস্তানকে 'আল-বেদা' জানিয়ে সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে একটি পাহাড়ী ঝর্ণার কিনারা ধরে অগ্রসর হতে থাকি। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ঝর্ণাটি দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। আমরা তার মোহনায় বসে বিশ্রাম নিলাম। কাশ্মীরের মাটিতে এটাই আমাদের প্রথম বিশ্রাম, প্রথম অবস্থান।

বিশ্রামের পর আমরা ঝর্ণাটা পেছনে রেখে পাহাড়ে উঠতে শুরু করলাম। এখানে আমাদের বেশীক্ষণ অবস্থান করা সম্ভব ছিল না। ডানে-বাঁয়ে ভারতীয় সৈন্যদের পোস্ট। অতি সতর্কতার সাথে কখনো ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে, কখনো মাথা নীচু করে নুয়ে নুয়ে কখনও বা হামাগুড়ি দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকি।

এক স্থানে এসে আমাদের বাধ্য হয়ে থেমে যেত হল। এ পাহাড়ের কাছাকাছি দু'টি চূড়ায় ভারতীয় সৈন্যদের দু'টি পোস্ট, যার মধ্য দিয়ে দিনের বেলা অতিক্রম করা একেবারে অসম্ভব।

দিনের বেলাটা বসে বসে কাটিয়ে দিলাম। রাতে অন্ধকার ছেয়ে গেলে আমরা দু' পোস্টের মধ্য দিয়ে সামনে অগ্রসর হই। এবার আমাদের আর একটি পানির নালা ধরে তার পাশে পাশে চলার কথা। কিন্তু নালার কিনারায় তাঁবু টানানো দেখে আমাদের সন্দেহ হল, হয়ত ভারতীয় সৈন্যরা এখানে তাঁবু ফেলে পাহারা দিচ্ছে। তাই পথ পরিবর্তন করে আমরা ঝর্ণা ও চূড়ার উপরে পোস্টের মধ্য বরাবর বেরিয়ে গেলাম।

এ ভাবে ছয়টি বিপজ্জনক পোস্ট অতিক্রম করে আমরা নভেম্বরের দু' তারিখ সবচেয়ে উঁচু পাহাড় 'ওঝিটাপ' এর উপর পৌঁছতে সক্ষম হই। এবার আমাদের ঢালু পথ ধরে নীচে নামতে হবে।

আমাদের গ্রুপে ৩২ জন মুজাহিদ ছিল। কমান্ডার নাসরুল্লাহ মনসূর কমাণ্ডিংয়ের দায়িত্ব পালন করছিলেন। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে আফগান জিহাদে অংশ নেয়ার ফলে কাফেলার সকলেই যুদ্ধের কলা-কৌশল সম্পর্কে ছিল অভিজ্ঞ।

সর্বশেষ চূড়ায় পৌছার পর আমাদের মুজাহিদরা দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হতে লাগল। আমাদের সাথে দু'জন গাইড (পথপ্রদর্শক) ছিল। একজন ১৬ জন সাথী নিয়ে প্রথমে অগ্রসর হয়। নাসরুল্লাহ্ মনসুরসহ আমরা পেছনের গ্রুপে ছিলাম। পদচিহ্ন ধরে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়ে পেছনে ফিরে দেখি, সাথীরা কেউ আসছে না। একটি পাথরের আড়ালে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ক্লান্তিতে আমার চোখে ঘুম নেমে এল।

হঠাৎ পায়ের শব্দে চমকে উঠি। দেখি, আব্দুল গফুরসহ পাঁচজন সাথী এগিয়ে আসছে। বাকী সাথীরা এখনও পেছনে রয়ে গেছে। আমি পিঠের বোঝা নীচে নামিয়ে রেখে দ্রুত সামনে অগ্রসর হলাম, যাতে অগ্রবর্তী গ্রুপকে থামানো যায়।

ঢালু পথ বরফে ঢাকা, তাই বেশী দ্রুত অগ্রসর হতে পারছিলাম না। ঘন্টাখানিক চলার পরও সাথীদের নাগাল পেতে ব্যর্থ হলাম। পেছনে ফিরে এসে দেখি, নাসরুল্লাহ্ মনসুর গাইডসহ সাথীদের নিকট পৌঁছে গেছেন।

নাসরুল্লাহ্ মনসুর ১৯৮১ সন থেকে কাবুল বিজয় পর্যন্ত আফগানিস্তানেই ছিলেন। নিজ হাতে রাশিয়ান হেলিকপ্টার ও ট্যাংক ধ্বংস করেছেন। সাথীরা তাকে 'ট্যাংক বিধ্বংসী' উপাধি দিয়েছেন। তিনি বহুবার আহত হয়েছেন। তাঁর উরুতে অনেকগুলো গুলী বিদ্ধ হয়েছিল। তখন থেকে তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটেন। ক্রমাগত হাঁটা এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তাঁর আহত পায়ে ব্যাথা শুরু হয়। তিনি ছাড়া আরো কয়েকজন মুজাহিদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে দিনে বিশ্রাম করে রাতে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ্ মনসুর আমাদের থেকে কিছু দূরে আরেকটি পাথরের আড়ালে কয়েকজন সাথী নিয়ে বসে ছিলেন। যে পাথরগুলোর আড়ালে আমরা

বসে ছিলাম, সেগুলো উচ্চতায় কম ছিল। আমরা খঞ্জর দিয়ে মাটি খুঁড়ে তার মধ্যে বসার চেষ্টা করলাম। তবুও পুরোপুরি মাথা লুকানো সম্ভব হল না। উপরন্তু এখানে বসে ফায়ার করার সুবিধাও ছিল না। প্রায় ৬০ বর্গমিটার এলাকা নিয়ে আমরা আলাদা হয়ে পড়ি।

শত্রুর সাথে প্রথম সংঘাত

আমাদের গাইড সামনে অগ্রসর হয়ে আশপাশের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে বিশ মিটার অগ্রসর হতেই হঠাৎ চমকে উঠে সে। তার সামনেই একজন ভারতীয় সৈন্য দাঁড়িয়ে। সৈন্যটি গাইডকে অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করার আহবান জানাচ্ছে।

তাদের কথার শব্দ শুনে আমি একটি পাথরের ছিদ্র দিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখি, সেখানে তিনজন ইন্ডিয়ান সৈন্য দাঁড়িয়ে গাইডের সাথে কথা বলছে। আমি বুঝতে পারলাম, সৈন্যরা আমাদের ঘিরে ফেলেছে। কান পেতে তাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করলাম। একজন সৈন্য গাইডকে ফাঁসানোর জন্যে চাতুরী করে বলছে, 'গুরু, তুমি আত্মসমর্পণ করলে তোমাকে কিছুই বলব না।'

গাইড বলল, 'তুমি শিখ হলে তোমার দাড়ি কোথায়?'

সে বলল 'দাড়ি রাখা আমাদের জন্যে আবশ্যক নয়।'

গাইড আবার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পাগড়ি কোথায়?'

সে জবাব দিল, 'সকাল বেলা তো, তাই পরে আসিনি।'

গাইড বলল, 'তবে তোমার চুল কোথায়?' শিখ সৈন্যটি তার মোড়ানো বেনী খুলে তাকে দেখাল।

সে গুরু নানকের কসম খেয়ে আবার বলল, 'আমরাও স্বাধীনতা চাই। আমি জিয়াউল হকের সময় পাকিস্তান গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে এসেছি। তবে এভাবে লড়াই করে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। স্বাধীনতা আলোচনার টেবিলে বসে আদায় করে নিতে হয়।'

সৈন্যরা এত কাছাকাছি ছিল যে, আমরা একত্রিত হয়ে পরামর্শ করতে পারছিলাম না, এখন আমরা কী করব। সকলে নিজ নিজ স্থানে বসে সজাগ দৃষ্টি রাখতে থাকি।

শিখ সৈন্যের নরম কথায় গাইড অস্ত্র ফেলে দিয়ে হাত তুলে দাঁড়াল। তৎক্ষণাৎ কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ্‌র একটি গুলী এসে একজন সৈন্যের মাথায় বিদ্ধ হয়। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কমান্ডার একের পর এক গুলী ছুড়ে সাথীদের আক্রমণ করার জন্য উচ্চস্বরে আদেশ দিতে লাগল।

তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে আমরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে পাহাড়ী উপত্যকা মুখরিত করে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অত্যন্ত ঝুঁকির সাথে পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে গুলী চালাতে হচ্ছিল, কারো ম্যাগজিনের গুলী শেষ হলে সে পাথরের আড়ালে চলে আসত, আর একজন তার স্থানে নেমে আবার গুলী চালাত।

সকালে শুরু হওয়া যুদ্ধ দুপুর পর্যন্ত গড়ায়। শত্রু সৈন্যরা ক্লাশিনকোভ, রকেটলাঞ্চারের গোলা এবং অসংখ্য গ্রেনেড বর্ষণ করছে। আমাদের সাতজন সাথী শহীদ ও একজন গ্রেফতার হয়। বাকী সাতজনের মধ্যে কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ মনসুরসহ অধিকাংশ সাথী আহত হয়। আমরা এ অবস্থায় তায়াম্মুম করে পাথরের আড়ালে বসে জোহরের নামাজ আদায় করে নেই।

মাজরুহুল ইসলামের শাহাদাত

মাজরুহুল ইসলাম একজন প্রবীণ মুজাহিদ। তিনি অত্যন্ত পরহেজগার মুত্তাকী এবং মিষ্টিভাষী মানুষ। তিনিও তায়াম্মুম করে জোহরের নামাজ আদায় করেন। নামাজ পড়ে তিনি কেবলামুখী হয়ে এক সৈন্যের উপর গুলী চালান। মুজাহিদ মুহাম্মদ আসেম তাঁর সাথে ছিল। সে বলল, 'আমি দেখলাম, গুলী খেয়ে সৈন্যটি লুটিয়ে পড়ে। আর অপর দিক থেকে একটি গুলী এসে মাজরুহুল ইসলামের কপালে বিদ্ধ হয়। তিনি কেবলামুখী হয়ে দুই হাঁটুর উপর বসে পড়েন এবং সোজা সেজদায় চলে যান।

আমরা ধারণা করতে পারিনি যে, তাঁর কপালে গুলী লেগেছে। মনে করেছি, ইন্ডিয়ান সৈন্যকে হত্যা করার শুকরিয়া জানাতে তিনি সেজদায় লুটিয়ে পড়েছেন। অনেক সময় অতিবাহিত হবার পরও তিনি মাথা না উঠালে আমার সন্দেহ হয়। কয়েকবার ডাক দিলাম, কিন্তু কোন জবাব নেই। মনে করলাম, হয়ত যখমী হয়েছেন। উঠাবার চেষ্টা করতেই কপাল থেকে দর দর করে রক্ত পড়তে শুরু করে। তখন আর তিনি বেঁচে নেই। তাঁর আত্মা জান্নাতে পৌঁছে গেছে'। মাজরুহুল ইসলাম এই যুদ্ধের সর্বশেষ শহীদ।

অবরুদ্ধ অবস্থায়

তিনশ' ভারতীয় সৈন্য এ আক্রমণে অংশ নেয়। তারা কয়েক লাইনে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে ঘিরে রাখে। তাদের প্রথম বেস্টনী লাইন ছিল আমাদের থেকে মাত্র পঞ্চাশ মিটার দূরে। মাঝে-মধ্যে সৈন্যরা সামনে অগ্রসর হয়ে পাথরের আড়ালে গ্রেনেড ছুড়ে মারত।

আমাদের হাতে দু'টি রকেটলাঞ্চার ছিল। একবার এক সৈন্য আব্দুশ শুকুরকে লক্ষ্য করে একটি গ্রেনেড ছুড়ে মারে। আব্দুশ শুকুর দ্রুত গ্রেনেডটি তুলে বাইরে নিক্ষেপ করে। এতে তাঁর কাছে রক্ষিত রকেটলাঞ্চারে গ্রেনেডের একটি টুকরোর আঘাত লাগে, যার ফলে রকেটলাঞ্চারটি অকেজো হয়ে যায়।

খানিক পরে একটি হেলিকপ্টার আমাদের মাথার উপর ঘুরতে আরম্ভ করে। তার সাথে ছিল ছয়টি মেশিনগান ফিট করা। হেলিকপ্টার থেকে আমাদের উপর মুষলধারে গুলী বর্ষণ হতে থাকে। কিন্তু এতে আমাদের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি।

মাত্র একটি রকেটলাঞ্চার দিয়ে আমরা হেলিকপ্টারের মোকাবেলা করি। এরপর দুশমনরা কয়েকটি মর্টার তোপের গোলাবর্ষণ করে, যা ডানে ও বাঁয়ে পড়ে বিস্ফোরিত হয়। মর্টারের গোলার পর তারা আবার জোরদার আক্রমণ চালায়।

আমি যে পাথরের আড়ালে মোর্চা নিয়েছি, তার উপর চড়ে একজন ভারতীয় সৈন্য আমাকে বের হতে বলল। আমার মোর্চা এত সংকীর্ণ ছিল যে, এর মধ্যে ভাল করে বসতে পারছিলাম না। সৈন্যদের দিকে তাকাবারও সুযোগ পাচ্ছিলাম না। সৈন্যটি আমার উপরে একটি হ্যান্ডগ্রেনেড ছুড়ে মারে, যা আমার পেটের উপর পড়তেই ধরে বাইরে নিক্ষেপ করে ফেলে দেই।

যখন সৈন্যটি দেখল, গ্রেনেড দিয়ে একে ঘায়েল করা যাবে না, তখন সে এক নতুন চাল চালে। আমাকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল, 'তোমার ট্রেনিং দেখে আশ্চর্য হয়েছি। আমাদের তোমার মত সুশিক্ষিত যুবকের খুবই প্রয়োজন। তুমি বাইরে চলে এসো; তোমার যোগ্যতার জন্যে তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।'

আমি শুধু কথার আওয়াজ শুনছিলাম, কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি তাকে ডেকে বললাম, তুমি আমার সামনে এসে কথা বল।

কিন্তু সে আমার সামনে আসতে সাহস না করে আমার উপর আরও একটি গ্রেনেড ছুড়ে মারে। গ্রেনেড লক্ষ্যচ্যুত হয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়ে। তার গ্রেনেড ফুরিয়ে গেলে সে ফিরে চলে যায়। এ সুযোগে আমি মোর্চা থেকে বের হয়ে পাথরের আড়ালে পজিশন নিয়ে বসি।

জীবনবাজীর লড়াই যখন শেষ হল

কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ মনসুর পাথরের আড়ালে অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যখনই কোন সৈন্যের মাথা নজরে আসত, তখনই সেটা নিশানা বানাতেন। তাঁর হাতের টিপ ছিল নিখুঁত। অযথা গুলী খরচ না করে ঠাণ্ডা মাথায় তিনি এক একজন করে শিকার করতে থাকেন।

একদিকে আমাদের সাথীরা যেমন শহীদ হয়েছে, অপর দিকে দুশমনদেরও লাশের স্তূপ পড়ে গেছে। সন্ধ্যা বেলায় আব্দুশ শুকুর আওয়াজ দিল, 'আকরাম, যদি জিন্দা থাক, তবে জবাব দাও।'

আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ, আমি জীবিত আছি।

সে ক্রোলিং করে প্রত্যেকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। সর্বপ্রথম সে কমাণ্ডারের কাছে যায়।

ওদিকে শত্রুরা কমাণ্ডারকে বলছে, 'ও আল্লাহু আকবারের বাচ্চা, আত্মসমর্পণ কর।'

কমাণ্ডার জবাবে বললেন, 'আমাদের সাথে আল্লাহ্ আছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশ্বাস আছে, কোন সাথী হাতিয়ার ফেলতে রাজী নই।'

রাতে সৈন্যরা কিছু দূরে অবস্থান নিয়ে গুলী চালাতে থাকে। রাতের পর সারা দিন ধরেও গুলী বিনিময় চলতে থাকে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় কমাণ্ডার গুলী চালানো বন্ধ করার নির্দেশ দেন। যখন কয়েকঘন্টা পর্যন্ত আমাদের পক্ষ থেকে গুলী বন্ধ থাকে, তখন দুশমনরা মনে করে সকল মুজাহিদ নিহত হয়েছে। তারাও আস্তে আস্তে গুলী চালানো বন্ধ করে দেয়। লড়াইয়ে তারা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ায় রাতে নিজ অবস্থান থেকে আর সামনে অগ্রসর হয়নি।

রাত দু'টায় কমান্ডার সকল মুজাহিদকে একস্থানে ডেকে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন, ফিরে যাবার কথা যেন কেউ চিন্তা না করি। যেভাবেই হোক আমাদের সামনের দিকে এগুতেই হবে। যদিও গাইড ধরা পড়েছে, রাস্তা আমাদের চেনা নেই, তবুও আমরা অনুমানের উপর নির্ভর করে অগ্রসর হব। ইনশাআল্লাহ্ আমরা পথের সন্ধান পেয়ে যাব।

আমাদের কাছে বারুদের যে মাইন ছিল, সেগুলি শহীদ সাথীদের চারপাশে বিছানো হল, যাতে শত্রুরা শহীদের লাশের কোন অমর্যাদা করতে চাইলে সাথে সাথে তার প্রতিফল পায়।

কাজ শেষে আমরা অতি সতর্কতার সাথে এক একজন করে একদিকে বের হয়ে এলাম। আল্লাহ্র শোকর, সকল সাথীসহ আমরা শত্রুর বেষ্টনী পার হয়ে এক পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেলাম। সকলে ক্ষুধা-পিপাসায় খুবই ক্লান্ত। তাই আজকের মত এখানে বিশ্রাম নিয়ে রাতে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পাহাড়ের চূড়া থেকে যুদ্ধক্ষেত্র ছিল অনেক নীচে। সকাল আটটায় ভারতীয় সৈন্যরা গুলী করতে করতে সামনে অগ্রসর হয়। যখন জবাবে কোন গুলী বর্ষিত

হল না, তখন তাদের সাহস বেড়ে গেল। তাদের ধারণা জন্মাল যে, এখন আর কোন মুজাহিদ জীবিত নেই। তারা নিহত সাথীদের তল্লাশী নেয়ার জন্যে সামনে অগ্রসর হয়ে কাছাকাছি পৌঁছতেই একটি মাইন বিস্ফোরিত হয়। এতে কয়েকজন সৈন্য হতাহত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। অন্য পাশ থেকে অগ্রসর হওয়া সৈন্যরাও একটি মাইন বিস্ফোরণের কবলে পড়ে হতাহত হয়।

সাধারণ সৈন্যরা মাইন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। মাইন তুলে পথ পরিষ্কার করতে সৈন্যদের বিশেষ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মাইন সুইপার ইউনিট সাথে না থাকায় সৈন্যরা তাদের তল্লাশী অভিযান মুলতবী রাখতে বাধ্য হয়।

সে লড়াইয়ে ৩৬ জন সৈন্য নিহত ও অসংখ্য আহত হয়েছিল। আমাদের আটকাপড়া গাইডকে ভারতীয় সৈন্যরা পরে এসব হতাহতের প্রতিশোধ স্বরূপ বিনা বিচারে গুলী করে হত্যা করে।

অজানা পথে যাত্রা শুরু

কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ এবার গাইডের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করেন। আমি সবার আগে আগে চলে রাস্তা দেখে নিতাম, বাকী সাথীরা সে পথ ধরে অগ্রসর হত। চলতে চলতে একসময় একটি পাহাড় থেকে একশ্' মিটার নীচে নেমে দেখি, দশ মিটার দূরে চারজন সৈন্য জড়সড় হয়ে একস্থানে বসে শীতে কাঁপছে।

শীতের প্রচণ্ডতা থেকে বাঁচার জন্যে একে অপরের শরীর জড়াজড়ি করে বসে আছে তারা। এত কাছে পৌঁছার পরও তারা আমার উপস্থিতি টের পায়নি। ইচ্ছে করলে এক ব্রাশ ফায়ারেই চারজনকে ঘায়েল করা যেত। কিন্তু এ মুহূর্তে বন্দুকের আওয়াজ করা ঠিক হবে না বলে নিজেকে সংযত করলাম। এখন আমাদের আসল উদ্দেশ্য কাশ্মীর পৌঁছা। কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ্ পথে সকল প্রকার সংঘাত এড়িয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। একান্ত যদি বিপদ এড়ানো না যায়, তবেই গুলী করার অনুমতি রয়েছে।

আমি অতি সন্তর্পণে পেছনে ফিরে এসে পথ পরিবর্তন করে সাথীদেরকে যথা সম্ভব নিঃশব্দে অগ্রসর হতে বললাম। আধা কিলোমিটার অগ্রসর হওয়ার পর আমরা অনেকগুলি বড় বড় পাথর দেখতে পাই। সাথীরা ক্ষুধা-পিপাসা ও ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে; কারো আর চলার মত শক্তি নেই। একমাত্র দৃঢ় মনোবলই তাদের সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এবার পাথরের ভাল আড়াল পেয়ে সাথীরা সেখানেই বসে পড়ে। অতঃপর বাধ্য হয়ে আমরা একদিন একরাত সেখানে বিশ্রাম নিলাম।

পরের দিন দুপুরের দিকে ত্রিশ-পয়ত্রিশজন সৈন্যের একটি টহলগ্রুপ এ পথে টহল দিতে আসে। তাদের সাথে দু'টি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরও ছিল। আমি যে পাথরের আড়ালে বসা ছিলাম, একজন সৈন্য সে পাথরের উপর এসে দাঁড়ায় এবং তার সঙ্গী কুকুরটি আমাকে দেখে ফেলে। আমি কুকুরের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগলাম। আল্লাহ্‌র কুদরতে কুকুর কোন আওয়াজ না করে পাথর থেকে নীচে নেমে গেল।

পঞ্চাশ মিটার অগ্রসর হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে বসে সৈন্যরা গাল-গল্প করতে থাকে। তারা চা তৈরী করে পান করে। আমার সামনের দুশমনরা হাসি-ঠাট্টায় মেতে ছিল। আমি তাদের দিকে ক্লাসিনকোভ তাক করে বসে ছিলাম। কিন্তু তারা আমাদের সন্ধান না পাওয়ায় আমরা কমাণ্ডারের নির্দেশ অনুযায়ী শিকার হাতের কাছে পেয়েও ছেড়ে দিলাম।

সন্ধ্যা হতেই আমরা আবার সফর শুরু করি। চারঘন্টা পথ চলার পর ক্লান্তির জন্যে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। আহত সাথীরা মোটেই চলতে পারছিল না। স্বয়ং কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ্‌র শরীরের তিন স্থানে যখম ছিল। বাকী সাথীরাও প্রায় সবাই কম বেশী আহত, সবার জামা-কাপড় রক্তে ভেজা। কমাণ্ডার বললেন, 'দেখ কোথাও লুকিয়ে থাকার মত জায়গা পাওয়া যায় কিনা?'

আমি খোঁজাখুঁজি করে একটি স্থান নির্বাচন করি। বাকী রাত ও পরদিন সেখানে কাটাবার পর সাথীরা ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। চতুর্থ রাতে আবার ঘন্টাচারেক চলার পর বিশ্রাম নিলাম। এভাবে অল্প অল্প করে অগ্রসর হয়ে সপ্তম রাতের শেষে একটি লোকালয় দেখে ভাবলাম, আমরা কাশ্মীর উপত্যকায় পৌঁছে গেছি।

কিন্তু বস্তির অধিবাসীদের সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা ছিল না, এটা মুসলমানদের গ্রাম না হিন্দুদের। গ্রামে সৈনদের ক্যাম্প আছে কিনা সে ব্যাপারেও কোন তথ্য আমাদের জানা ছিল না। অপর দিকে ক্ষুধা নিবারণের জন্যে কমাণ্ডার আমাদের সবাইকে থামতে নির্দেশ দিলে আমরা একস্থানে বসে পড়ি। আমার সাথে একজন সাথী দিয়ে কমাণ্ডার প্রথমে বস্তির কাছাকাছি গিয়ে বস্তির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে বললেন। আমরা নীচে নেমে একটি ঝোপের আড়ালে বসে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকি।

দেখে মনে হল, মুসলমানদের গ্রাম। আশে-পাশে সৈন্যদেরও কোন ক্যাম্প দেখতে পেলাম না। দু'টি বালিকা কতগুলি ছাগল নিয়ে পাহাড়ে চড়াতে যাচ্ছিল। আমি নরম সুরে একটি বালিকাকে কাছে ডেকে প্রথমে তার নাম, বাপের নাম, গ্রামের নাম ও আশ-পাশের গ্রামের নামও জিজ্ঞেস করলাম। তার জবাব শুনে আমাদের অবস্থান এবং আমাদের গন্তব্যের দিক-নির্দেশনাও পেলাম।

গ্রাম থেকে ৫০০ মিটার দূরে সৈনিকদের পোস্ট। তাই গ্রামের ভিতরে প্রবেশ না করে কমাণ্ডারের কাছে ফিরে এসে তাঁকে সকল বিষয়ে অবগত করলাম। সব কিছু শুনে তিনি বললেন, 'যাও, প্রথমে গ্রামপ্রধানের সাথে দেখা করে কিছু খাবার যোগাড় করে নিয়ে আস।'

গ্রামপ্রধান বাড়ী ছিলেন না। তিনি গম ভাঙ্গানোর জন্যে পাশের গ্রামে গিয়েছেন। আমি তাঁর ঘরের লোকদের কাছে খাবার চাইলে তারা আমাকে অল্প কিছু ভুট্টার রুটি দিয়ে বিদায় করতে চাইল। বুঝলাম, তিনি না এলে কাজ হবে না। তাই তাঁর আসার অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি ফিরে আসলে তাকে সবকথা বুঝিয়ে বললাম।

আমরা কোথা থেকে এসেছি, পথে যে যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং সাথীদের অবস্থা খুলে বলার পর তিনি গ্রাম থেকে দু'জন লোক আমাদের সাথে দিয়ে দিলেন। আমরা তাদের নিয়ে উপরে গিয়ে সাথীদের খুঁজতে লাগলাম।

আমাদের সাথে দু'জন অপরিচিত লোক দেখে সাথীরা কোন সাড়া দিচ্ছিল না। আমরা আওয়াজ দিয়ে বললাম, কোন ভয় নেই, এরা গ্রামের লোক। এ গ্রামের লোকেরা মুজাহিদদের সহযোগী।

অবশেষে কমাণ্ডার হাত তুলে ইশারায় আমাদের কাছে ডাকেন। পরে সাথীদের নিয়ে গ্রামে চলে আসি।

গ্রামের লোকজন আমাদের জন্যে ভাল খাবারের ব্যবস্থা করে। অনেকদিন পর পেট ভরে খেতে পেয়ে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলাম। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে গ্রামের লোকজন আমাদের কাছে পথের খবর জানতে চাইল। আমাদের পথে সংঘটিত সকল ঘটনা শুনে তারা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে। বলল, 'আফগান মুজাহিদ বলেই আল্লাহ্ আপনাদেরকে এমন সহায়তা করেছেন।'

যে পথ দিয়ে আমরা এসেছি, সে পথ সম্পর্কে তারা বলল যে, এ পথের দু'পাশে কয়েকশ' সরকারী সৈন্যের পোস্ট। সব সময় এ পথে সৈন্যরা টহল দিয়ে ফিরে। নিরাপদে এ পথ পার হয়ে আসায় বিস্ময় প্রকাশ করল তারা।

নিকটেই সৈন্যদের পোস্ট। তাই গ্রামে বেশী সময় কাটানো বিপজ্জনক। তাছাড়া আমাদের নিরাপদ স্থানে পূর্ণ বিশ্রামেরও প্রয়োজন। তাই গ্রামের লোকেরা আমাদেরকে অন্য এক বস্তিতে পৌঁছিয়ে দিল।

ক্রেক ডাউনের মুখোমুখী

এখানে আমরা পৌঁছে আমাদের প্রথম গ্রুপের সাথীদের খবর নিলাম। ভাই ওমায়েরসহ অন্যান্য সাথীরা পরদিন আমাদের সঙ্গে মিলিত হল। তারা বলল,

মাত্র দু'দিন দু'রাতে তারা এ পথ অতিক্রম করেছে। অথচ, আমাদের লেগেছে টানা সাত দিন।

আমরা এখান থেকে আরও এক মাইল অতিক্রম করার পর কমাণ্ডার নাসরুল্লাহর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ায় তাঁকে শ্রীনগর নিয়ে যাওয়া হয়। মুহাম্মদ আসেম এবং মুহাম্মদ সাবেরও তাঁর সাথে শ্রীনগর চলে যায়। আমি (আকরামুল্লাহ্) ও কারী আব্দুস শুকুর এখানেই থেকে গেলাম।

সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই গ্রামের লোকজন এসে আমাদের ক্রেক ডাউনের খবর শোনাল। এটা আমার জীবনের প্রথম ক্রেক ডাউনের অভিজ্ঞতা। আমাকে অস্ত্র ছাড়া একজন সাধারণ মানুষের মত দুশমনদের সামনে দাঁড়াতে হবে, আমি একজন কাশ্মিরী, আমি কখনও ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কোন কর্মকাণ্ডে অংশ নেইনি ইত্যাদি প্রমাণ করতে হবে।

মনে মনে ভাবলাম, এটা অসম্ভব। তারা আমাদেরকে চিনে ফেলবে। এছাড়া দুশমনদের গুপ্তচররা তো অতি সহজেই আমাদের চিহ্নিত করতে পারবে।

প্রথমে চেষ্টা করলাম ক্রেক ডাউন থেকে বের হওয়ার জন্যে। কিন্তু কোন রাস্তা খুঁজে পেলাম না। অগত্যা লাইনে দাঁড়িয়ে 'সনাক্তি প্যারেডে'র অপেক্ষা করতে থাকি।

আমাদের জানা ছিল না যে, এই ক্রেক ডাউন শুধু আমাদের ধরার জন্যেই করা হয়েছে। এজন্যই আমরা কোন প্রস্তুতি নেইনি। আমাদের পরনে পাকিস্তানী সেলোয়ার-কোর্তা। তাতে রক্তের উপর ময়লা জমে কালো হয়ে গেছে। যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে, এরা এ অঞ্চলের লোক নয়।

আমরা ঐ অবস্থায়ই জীপে বসা গুপ্তচরের সামনে দিয়ে কয়েকবার আসা যাওয়া করি। প্রতিবার যাওয়ার সময় আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছি। আল্লাহ্ গুপ্তচরদেরকে যেন অন্ধ করে দিলেন। তিন হাজার লোকের লাইন থেকে তারা আমাদের একজনকেও খুঁজে পেল না। অথচ লাইনে দাঁড়ানো প্রতিটি লোক আমাদের আফগান মুজাহিদ বলে সম্বোধন করেছে।

মহিলারা যখন ঘর থেকে খাবার দিয়ে যেত, তখন তারা নিজেরা না খেয়ে ভাল অংশ আমাদের দিকে এগিয়ে দিত। একবার জামাতে নামাজ পড়ার পর পেছন থেকে এক লোক উচ্চস্বরে ইমাম সাহেবকে বলল, 'আমাদের সাথে যে বিদেশী মেহমান মুজাহিদরা আছেন, তাদের নিরাপত্তার জন্য দু'আ করুন।'

ইমাম সাহেব বিশেষভাবে দু'আ করেন। সকলে 'আমীন' 'আমীন' বলে সে দু'আয় অংশ নেয়।

আমরা দু'দিন ক্রেক ডাউনের অবরোধের মধ্যে ছিলাম। এ দু'দিনে মোট ছ'বার আমাদের গুপ্তচরের সম্মুখ দিয়ে হেঁটে যেতে হয়েছে। প্রতিবারই আমরা

আল্লাহর কাছে দু'আ করতে করতে অগ্রসর হয়েছি। তাঁর বিশেষ রহমতে আমরা তাদের হাত থেকে রক্ষা পাই।

ক্রেক ডাউন তুলে নেয়ার পর সেনাদের গ্রুপকমাণ্ডার গ্রামের লোকদের একত্রে বসিয়ে ভাষণ দেয়। আমরাও তার ভাষণ শোনার জন্যে বসে যাই। ভাষণে সে বলল, 'আমরা জানতে পেরেছি, এ এলাকায় তিনজন আফগানী দুষ্কৃতিকারী এসে আশ্রয় নিয়েছে। দু'দিন তল্লাশী অভিযান চালিয়েও তাদেরকে ধরতে পারলাম না। এর আগেই তারা পালিয়ে গেছে। এখন আপনাদের এলাকায় কোন দুষ্কৃতিকারী নেই।'

সে আরও বলল, 'আমরা দুষ্কৃতিকারীদের চেহারা দেখলে চিনতে পারি। আমাদের সিপাহীরা যখনই কোন এলাকায় ক্রেক ডাউন করেছে, সেখানের দুষ্কৃতিকারীদের ধরে ফেলেছে।'

কর্নেলের কথা শুনে আমরা মনে মনে তার আহম্মকির জন্যে হাসলাম। ভারত সরকার ও তার সিপাইরা নিজেদের উপর এরূপ মিথ্যা আত্মবিশ্বাসই পোষণ করে থাকে। তাদের পায়ের তলা থেকে যে মাটি সরে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে তাদের কোনই খবর নেই।

ক্রেক ডাউন শেষে কর্নেল হাসিমুখে জীপে চড়ে বিদায় নিল। এবার আমাদেরও হুঁশ ফিরে এল।

এখানকার যুবকরা সাধারণতঃ প্যান্ট-শার্ট পরে এবং বৃদ্ধরা পরে সাদা রংয়ের জামা-পাজামা। তবে সকলের গায়ে ঢোলা কোর্তা চাপানো থাকে। প্রত্যেকের সাথে ছিল একটি করে কাংরি। কাশ্মীরের লোকেরা তীব্র শীত থেকে বাঁচার জন্যে একটি বিশেষ ধরনের পাত্রে গরম কয়লা রেখে শরীর ছেকে নেয়। এসব পাত্রকে কাশ্মিরীরা 'কাংরি' বলে। তাদের গায়ের উপর মোটা অথবা পশমী কাপড়ের বিশেষ ধরনের ঢোলা কোর্তাটিকে তারা বলে 'ফেরন'।

ক্রেক ডাউন তুলে নেয়ার পর এলাকার নারী-পুরুষ ও শিশুরা আমাদের ঘিরে ধরে। মহিলারা নিজ নিজ বাড়ি থেকে নানা ধরনের সুস্বাদু পিঠা, নাড়ু আমাদের জন্যে নিয়ে আসে। এখান থেকে বিদায় নেয়ার আগে গ্রামের সকল লোক এসে মোবারকবাদ জানিয়ে আমাদের হেফাজতের জন্য দু'আ করে।

আমরা এখান থেকে সোজা শ্রীনগর পৌছে কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ মনসুরের সাথে মিলিত হই। কমাণ্ডার সাহেবের পায়ের ব্যথা বেশী হওয়ার কারণে লাগাতার বিশদিন একটি ঘরে থাকতে হয় তাকে।

সাবের ভাইয়ের হাত বরফে অবশ হয়ে গেছে, সে এখনও ঠাণ্ডা পানি ধরতে পারে না। আমি নিজেও একমাস ধরে বিছানায় পড়ে ছিলাম। ডাক্তাররা বলল, আমার পা কেটে ফেলতে হবে। আমি পা কাটাতে রাজী হলাম না। ভালো

হওয়ার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে থাকি 'হে আল্লাহ! আমি এখানে এসেছি তোমার পথে জিহাদ করে মজলুম কাশ্মিরী মা-বোনদের ইজ্জত বাঁচাতে। পা কেটে ফেললে জিহাদ করব কী করে! তুমি আমার পা ভালো করে দাও'।

এখানে আমি এক মুজাহিদের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তাঁরা আমার যে খেদমত করেছে, তার ঋণ কোনদিনই কিছু দিয়ে শোধ করা যাবে না। যদি আমি নিজের ঘরেও থাকতাম, তাহলেও এমন খেদমত পেতাম কিনা সন্দেহ। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

তাঁরা দিনে কয়েকবার লেবুর পানি দিয়ে আমার পা ধুইয়ে দিত। আর যখন যা প্রয়োজন হত, সাথে সাথে তা উপস্থিত করত। আমার মনে হয়, ওই লোকদের এখলাস ও খেদমতের বিনিময়ে আল্লাহ আমার পাটা সম্পূর্ণ ভালো করে দিয়েছেন।

কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ্‌র পায়ের জখম মোটামুটি ভালো হওয়ার পর পুরনো মুজাহিদদের একত্রিত করে পরামর্শ করলেন। এখান থেকে আমরা অন্যস্থানে চলে গেলাম। পুরাতন ট্রেনিং সেন্টারের স্থান পরিবর্তন করে ডোডা জেলার সুউচ্চ পর্বতমালার পাদদেশে নতুন ট্রেনিং সেন্টান স্থাপন করা হল।

আক্রমণের পরিকল্পনা

কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ জীবনের এক দীর্ঘ সময় যুদ্ধের ময়দানে অতিবাহিত করেছেন। যুদ্ধ তার কাছে ছেলে খেলার মত। তিনি প্রায়ই বলেন, 'আমরা খেলা মনে করে লড়াই করি ঘুর্ণিঝড়ের আবর্তের সাথে'।

সকাল-সন্ধ্যা ভারতীয় সৈন্যদের রাস্তায় অবাধ চলা-ফেরা ও বাজারে তাদের নিশ্চিন্তে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তার রক্ত গরম হয়ে উঠে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুশমনের রক্তে হোলি খেলার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠে তার মন।

তিনি সকাল-সন্ধ্যা ঘুরে ঘুরে এলাকা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। অভিজ্ঞ সাথীদের একত্রিত করে রোজই পরামর্শ করতে থাকেন। অবশেষে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলে আমাদেরও অপেক্ষার দিন শেষ হয়ে এল। স্থির হল, যেহেতু এখানকার সকলে আমাদের আফগান মুজাহিদ বলে জানে, সেহেতু প্রথম হামলায়ই সফল হয়ে তাদেরকে আরো আশান্বিত করে তুলতে হবে। ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করতে হবে, যেন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রতিশোধ নেয়ার সাহস হারিয়ে ফেলে।

সফল অপারেশন

অভিজ্ঞ মুজাহিদদের সাথে পরামর্শ করে লাগাতার কয়েকদিন খবরাখবর নেয়ার পর কাজীগুণ্ড ও টুল পোস্টের মধ্যবর্তী রাস্তায় টহলদার সৈন্যদের উপর

হামলা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। প্রতিদিন বাইশজন করে সৈন্য মহাসড়ক হেফাজতের জন্যে এ পথে টহল দিত।

অতি ভোরে আমরা রাস্তার কিনারায় মোর্চা বানিয়ে ওঁত পেতে বসে গেলাম। আমরা মোট বারজন মুজাহিদ দুই গ্রুপে সমান বিভক্ত হয়ে পজিশন নিয়ে দুই স্থানে বসে রইলাম।

মোর্চায় পৌঁছার আগে কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ্ কয়েকবার ঘাড় বাকিয়ে হামলা করার কৌশল রপ্ত করেন। আমরা সকলে নিজ নিজ অবস্থানে বসে শিকারের অপেক্ষা করতে থাকি। আমি ছিলাম দ্বিতীয় গ্রুপে।

১৯৯৩ সনের ৩০ শে জানুয়ারী। রাস্তার আশেপাশে হালকা বরফ জমে আছে। সূর্যোদয়ের পর একজন মেজরের নেতৃত্বে ছয়জন সৈন্যের প্রথম দলটা সামনের দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের সকলের সামনের মোর্চায় ছিল মুজাহিদ মুহাম্মদ খালেদ। কমাণ্ডার তাকে আগে-ভাগে গুলী ছুড়তে নিষেধ করে দেন। তাকে বলে রেখেছেন, 'দুশমনরা পুরোপুরি রেঞ্জের মধ্যে পৌঁছে গেলে আমি সম্মুখ থেকে প্রথমে গুলী করব। এরপর তুমি পেছন থেকে গুলী চালাবে, যাতে কেউ পালিয়ে যেতে না পারে'।

যখন সৈন্যরা মুজাহিদদের একদম কাছে পৌঁছে যায়, তখন একজন সৈন্য মেজরকে থামিয়ে বলে, 'স্যার, বরফের উপর পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। সাবধানে চলা উচিত, কোন দুষ্কৃতিকারী ওঁত পেতে থাকতে পারে।'

মেজর তার অধীন সাধারণ সিপাহীর কথায় কর্ণপাত না করে বলল, 'এখানে কোন দুষ্কৃতিকারী আসার সাহস পায় না। কোন ভয় নেই এখানে।'

এরা তখন পুরোপুরি আমাদের রেঞ্জের মধ্যে এসে গিয়েছিল। পায়ের নিশানা দেখে ফিরে যেতে চাইলেও তাদের শেষ রক্ষা হত না।

মেজর সকলের আগে, তার পেছনে একই লাইনে বাকি পাঁচজন সৈন্য অগ্রসর হচ্ছে। তারা নিশ্চিন্ত মনে হেঁটে কমাণ্ডার নাসরুল্লাহর সামনে গিয়ে পৌঁছতেই তিনি উচ্চ কণ্ঠে 'হল্ট' বলে উঠলেন।

মেজর যেন কিছুই বুঝতে পারল না। চলতেই থাকে সে। এবার কমাণ্ডার আরও জোরে 'হল্ট' বলে উঠলেন। তার প্রচন্ড গর্জন পাহাড়ের চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হয়ে সমগ্র উপত্যকা জুড়ে অনুরণিত হল।

এবার মেজরের টনক নড়ে। সে নিজের ক্লাসিনকোভ বোল্ড করে নাসরুল্লাহর প্রতি গুলী বর্ষণের চেষ্টা করে। নাসরুল্লাহর ক্লাসিনকোভ আগে থেকেই প্রস্তুত; ট্রিগারে আংগুল দিয়ে একটু চাপ দিতে যা দেরী।

আঙ্গুলের সামান্য ছোঁয়া পেতেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী বেরিয়ে মেজরকে ঝাঁঝরা করে দিয়ে যায়। কমাণ্ডারের অস্ত্র গর্জে উঠতেই বাকী পাঁচজন মুজাহিদের ক্লাশিনকোভ থেকেও অগণিত গুলী বের হতে শুরু করে।

দেখতে না দেখতে ছয়জন ভারতীয় সৈন্য ধূলায় গড়াগড়ি খেতে লাগল। মুজাহিদরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে রাস্তায় নেমে এসে সৈন্যদের অস্ত্র, ক্যাপ ও ব্যাজ নিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে চলে যায়।

মুজাহিদদের কোনই ক্ষতি হল না। উপরন্তু গনীমত হিসেবে বেশ কিছু আধুনিক অস্ত্র মুজাহিদদের হস্তগত হয়।

টহলদার বাকী ষোলজন সৈন্য জীপে করে টুলপোস্ট গিয়েছিল। যাওয়ার সময় তারা জীপ থেকে এ সৈন্যদের পথে নামিয়ে দিয়ে যায়। এদের পরিণতি সম্পর্কে ঐ সৈন্যদের কিছুই জানা ছিল না।

ডিউটি শেষে তাদের তুলে নেবার জন্যে জীপগুলি এসে ঠিক সেইখানে এসে দাঁড়ায়। জীপের স্টার্ট বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের অস্ত্রগুলো আবার গর্জে ওঠে। গোলাগুলীর শব্দ শুনে ড্রাইভার দ্রুত গাড়ী চালিয়ে পালিয়ে যায়। আমাদের গুলীতে তিনজন সৈন্য নিহত ও তেরজন আহত হয়।

মোট নয়জন নিহত ও তেরজন আহত হওয়ায় এলাকার সৈন্যরা ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। রাস্তায় টহল বন্ধ করে দেয় তারা। এলাকার কোন গ্রামে ক্রেক ডাউন করা থেকেও বিরত থাকে।

এলাকার সেনাপ্রধান একজন অসামরিক লোকের মারফত নাসরুল্লাহ মনসুরের কাছে একটি চিঠি পাঠায়। চিঠিতে সে লেখে, আপনারা আমাদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থেকে অন্য জায়গায় কাজ করুন, আমরা আপনাদেরকে কিছুই বলব না।'

কমাণ্ডার নাসরুল্লাহ মনসুর চিঠির জবাবে লিখে দেন 'এত তাড়াতাড়ি হিম্মত হারানো ঠিক নয়, আসল খেলা তো শুরুই হয়নি। বাহাদুর মুজাহিদের আকাঙ্খা, তাঁরা তাদের দুশমনদের সাথে সামনা-সামনি লড়াই করবে। আপনারা কাশ্মীর ছেড়ে চলে যান, তাহলে অন্ততঃ কাশ্মীর প্রশ্নে আমরা আপনাদের প্রতি একটি গুলীও ছুড়ব না।'

দিক-নির্দেশনামূলক ভাষণ

হামলার পর কমাণ্ডার সকল মুজাহিদকে একত্রিত করে সুশৃঙ্খলভাবে আক্রমণ পরিচালনার জন্যে তাদের ধন্যবাদ জানালেন। তিনি বললেন, 'আমরা যখনই কোন আক্রমণের প্রোগাম তৈরী করি, সর্বপ্রথম এ চিন্তা করি যে, যদি বিজয় লাভ করতে না পারি, তবে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেব। এ ধরনের চিন্তা

করাটাও একরকম দুর্বলতা। এ ধরনের চিন্তা খুব বেশী ফলদায়ক হয় না। আমরা যদি তারিক বিন যিয়াদের মত গাজী হওয়ার কিংবা শাহাদাতের তামান্না নিয়ে আক্রমণ করি, তবে অতি স্বল্প ও সাধারণ অস্ত্র নিয়েও আমরা দুশমনের বড় বড় ঘাঁটির উপর বিজয় লাভ করব।

দুশমনের সাথে আমাদেরকে এ প্রত্যয় নিয়ে লড়তে হবে যে, তাদের প্রত্যেককে খতম করে তবে আমরা ক্ষান্ত হব। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, আমাদের আক্রমণের ফলে সাধারণ মুসলমানদের যেন কোন ক্ষতি না হয়। আমরা কোন গ্রাম বা বস্তি থেকে সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালাব না। এতে সৈন্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে সাধারণ মানুষের উপর প্রতিশোধ নেবে।

আমরা আক্রমণের পর কোন মহল্লায়ও আশ্রয় নেব না। এতে ক্রেক ডাউন বসানোর ফলে এলাকাবাসীর উপর চরম দুর্ভোগ নেমে আসার চেয়ে আমরা সৈন্যদের পাহাড়-জংগলে ব্যতিব্যস্ত করব। যুদ্ধ এখন শহর ছেড়ে ময়দানে হবে। যদি শহরের কোন বাংকারে আমাদের আক্রমণ চালাতে হয়, তবে এমনভাবে পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে, যাতে ব্রাশ ফায়ারে একটি সাধারণ লোকও গুলীবিদ্ধ না হয়।'

আফগান জিহাদের উদাহরণ দিয়ে কমাণ্ডার পাহাড় ও ময়দানের জিহাদের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন। তিনি আমাদের বলেন, 'বিজয়ের পর কেউ যেন গর্বিত না হয়। আমাদের বিজয় মহান আল্লাহর বিশেষ রহমতের জন্যে হয়। অতএব, যত বিজয় আসবে, তত বেশী করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করবে। শেষ রাতে সেজদায় লুটিয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবে।

মুসলমানদের কামিয়াবী ও বিজয় একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। অর্থ, শক্তি ও সম্পদে সোভিয়েত ইউনিয়ন কারো থেকে পিছিয়ে ছিল না; কিন্তু আজ তার অবস্থা কত করুণ, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা-ই এখন তার দায়।'

তিনি ভারতীয় সৈন্য ও মুজাহিদদের তুলনা করে বলেন, 'ছয় লাখ ভারতীয় সৈন্যের মোকাবেলায় অল্প কিছু মুজাহিদ কোনই গুরুত্ব রাখে না। তাদের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের মোকাবেলায় আমাদের কয়েকটি গুলী কী-ইবা করতে পারে? তাদের মাটির নীচের পাকা বাংকার আর আমরা খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের তো কোন অস্তিত্ব থাকার কথা নয়।

আমরা কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ডের জন্যে লড়াই করছি না। আমাদের লক্ষ্য আল্লাহর এই বিশ্বে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা। আমরা শুধু কাশ্মীরকে স্বাধীন করে ক্ষান্ত হব না। মাহমুদ গজনবীর দেশ থেকে বের হওয়া এ কাফেলা ক্রমে সোমনাথের দিকে অগ্রসর হবে। আমরা আবার হিন্দুদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সুলতান

মাহমুদের রক্ত তাঁর সন্তানদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত রয়েছে। কাশ্মীরের এ লড়াই ভারত আযাদীর লড়াই। স্বাধীন কাশ্মীর হল স্বাধীন ভারতের সূচনা মাত্র।

হিন্দুস্থান মুসলমানদের দেশ। এদেশ শাসন করার অধিকার একমাত্র মুসলমানদেরই আছে। মুসলমানরা কখনও হিন্দুদের মত সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে রাজ্য শাসন করেনি, করবেও না। বরং মুসলমানদের শাসনে সকল ধর্ম ও মতের মানুষ নিজ সন্তানের মত পালিত হয়েছে। জাত-পাতের ভেদাভেদ করে কারও উপর সামান্য অবিচার করা হয়নি। মুসলিম শাসনামলে বিধর্মীদের সাথে এমন উত্তম ব্যবহার করা হয়েছে যে, আজকের সভ্যতার দাবীদার ইউরোপ, আমেরিকাও তার কোন নজীর পেশ করতে পারবে না।'

লক্ষ্যস্থল শ্রীনগর

আমাদের দ্বিতীয় টার্গেট শ্রীনগরের বুধরগীর (কাউডারাহ) বাংকারের উপর আক্রমণ করা। এ বাংকার মহাসড়কের উপর দু'টি গ্রামের মধ্যবর্তী এলাকায় খোলা ময়দানে অবস্থিত।

আমার নিয়ম অনুযায়ী এমন টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে সাধারণ লোকদের কোন ক্ষয়-ক্ষতি না হয়।

হামলার জন্যে এগারোজন মুজাহিদ নির্বাচন করা হয়। মুজাহিদ মুহাম্মদ আমেরকে কমাণ্ডারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

বাংকারের কাছাকাছি পৌঁছে মুজাহিদরা একটি টিলার আড়ালে অবস্থান নিয়ে বাংকারের সৈন্যদের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখতে থাকে।

প্রচণ্ড রোদে সৈন্যরা বাংকারের মধ্যে বসে ছিল। একমাত্র পাহারাদার রাস্তার অপর পাশে রোদে বিছিয়ে দেয়া কম্বলগুলো উল্টিয়ে দিচ্ছিল।

নয়জন মুজাহিদকে টিলার উপর রক্ষণভাগে অবস্থানের জন্যে দাঁড় করিয়ে রেখে মাত্র দু'জন একটি মটর সাইকেলে চড়ে আক্রমণ করার জন্যে বাংকারের দিকে রওনা হয়।

রক্ষী তখন কম্বলগুলো তুলে রাস্তা পার হচ্ছিল। মটর সাইকেল চালক দ্রুত চালিয়ে সাইকেলটা তার গায়ের উপর উঠিয়ে দেয়। রক্ষী তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। চালক সাইকেলটি রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে তাকে হাত ধরে তুলে মাফ চাইতে থাকে। অপর মুজাহিদ এ ফাঁকে বাংকারে প্রবেশ করে গুলী চালিয়ে বাংকারে অবস্থানরত পাঁচজন সৈন্যকে গুলীবিদ্ধ করে। বাংকার থেকে বের হয়ে তার মধ্যে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে গুলীবিদ্ধ সৈন্যরা মারা যায় ও বাংকারের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

এদিকে সাইকেলের নীচে চাপা খাওয়া আহত পাহারাদার মোকাবেলা করার জন্যে দাঁড়ালে তাকেও গুলী করে চিরতরে রাস্তার উপর শুইয়ে দেয়া হয়।

ছয়জন সৈন্যকে হত্যার করার পর আবার মোটর সাইকেলে চড়ে মুজাহিদ দু'জন পেছনের সাথীদের সাথে মিলিত হয় এবং কোন বাধা-বিপত্তি ছাড়াই তারা মারকাজে ফিরে আসে।

এ আক্রমণ মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এমন সুশৃঙ্খলার সাথে সম্পন্ন হয়েছে যে, দুশমনরা একটি গুলী ছোড়ারও অবকাশ পায়নি। এ আক্রমণের ফলে স্থানীয় জনসাধারণকেও কোন ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হতে হয়নি।

মারকাজে ফিরে মুজাহিদরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় কর। তাদের এ আক্রমণে শুধু দুশমনরাই পরাজিত হয়নি, স্থানীয় জনসাধারণও অবাক্ হয়েছে। প্রথমবারের মত সাধারণ মানুষ দেখল যে, মুজাহিদরা এমন একটি সাফল্যজনক হামলা পরিচালনা করেছে, যাতে তাদের নিজেদেরও কোন ক্ষতি হয়নি এবং স্থানীয় লোকদেরও কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হল না।

পুলিশ অফিসার হলেন মুজাহিদ

একদিন কমাণ্ডার আমাকে একটি গ্রামে পাঠালেন। সেখানের জনসাধারণ আমাদের অত্যন্ত মহব্বত করত এবং নানাভাবে আমাদের সহযোগিতায় হাত প্রসারিত রাখত। কমাণ্ডার বললেন, 'ওখানে গিয়ে জিহাদের ফযিলত সম্পর্কে আলোচনা কর, যাতে লোকদের মধ্যে জিহাদের উদ্দীপনা আরও বৃদ্ধি পায়'।

আমি লোকদের একত্রিত করে জিহাদের উপর আলোচনা শুরু করলাম। ঐ মজলিসে একজন পুলিশ অফিসার বসা ছিলেন। প্রথমে আমি জানতাম না যে, এই মজলিসে কোন সরকারী লোক উপস্থিত আছেন। আলোচনা শেষ হবার পর পুলিশ অফিসার আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার বাড়ি কোথায়?'

আমি বললাম, আমি এ এলাকার লোক নই, অন্য এলাকা থেকে এসেছি।

তিনি আমাকে আলাদা একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে অনেক কথা বললেন। আমিও তাকে অনেক প্রশ্ন করলাম। জবাব শুনে তাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল। তাঁর হৃদয়ে মুজাহিদদের প্রতি মহব্বত ও কাশ্মিরীদের আযাদীর প্রতি আন্তরিকতা আছে বলে উপলব্ধি করলাম।

তিনি বললেন, 'আপনার কথা-বার্তা ও চেহারা-সুরত দেখে কাশ্মিরী বলে মনে হয় না। আমি আজ পর্যন্ত জিহাদের উপর এত সাহসী বক্তব্য দিতে কাউকে দেখিনি। আপনার এত বড় হিম্মত কিভাবে হল?'

পরে তাঁর উপর আমি পুরোপুরি আস্থাশীল হলে আমার সঠিক পরিচয় দিয়ে তাকে বললাম, আমি আফগানী।

তাকে প্রশ্ন করলাম, আপনি একজন সরকারী লোক, উপরন্তু পুলিশে চাকুরী করেন; তা সত্ত্বেও মুজাহিদদের প্রতি আপনার এত সহানুভূতির কারণ কি?'

আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, 'আমার মনে মুজাহিদদের প্রতি এত দয়া হত না, যদি এমন একটা ঘটনা আমি না দেখতাম, যার কারণে আমার মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে। আমি তখন থেকে মুজাহিদদেরকে খোঁজ করছিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, তাদেরকে পেলেই পুলিশী পোষাক ফেলে দিয়ে তাদের সাথে মিলিত হয়ে জিহাদে অংশ নেব।'

'নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তান থেকে একদল মুজাহিদ কাশ্মীরে প্রবেশ করে। পথে এরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক গ্রুপ আগে পৌঁছে যায়, অন্য গ্রুপ পেছনে থেকে যায়। পেছনের গ্রুপকে ইণ্ডিয়ান সৈন্যরা ঘিরে ফেলে। তাদের নির্মূল করার জন্যে সৈন্যরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। গ্রেনেড, ক্লাসিনকোভ ও রকেটলাঞ্চারের অগণিত গোলা নিক্ষেপ করে তাদের উপর। কিন্তু তাঁরা বীরত্বের সাথে লড়তে থাকে। ইণ্ডিয়ান সৈন্যদের মর্টার তোপের হাজারো গোলা বর্ষণের মুখেও এরা যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হল না।

অবশেষে হেলিকপ্টার নিয়ে এসে তাদের উপর মেশিনগান দ্বারা বৃষ্টির মত গুলী বর্ষণ করা হয়। এ মুজাহিদরা দুই দিন দুই রাত অবিরাম লড়াই করে সকলে শাহাদাত বরণ করেন। তাদের কেউ-ই জীবন বাঁচাবার জন্যে আত্মসমর্পণ করেনি

একজন মুজাহিদ পাথরের নীচে লুকিয়ে ছিল। ইণ্ডিয়ান সৈন্যরা পাথরের উপরে উঠে তাঁর উপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যুদ্ধ শেষ হবার পর সেখানে ঐ মুজাহিদের ফটো পাওয়া গেছে, কিন্তু তাঁর লাশ পাওয়া যায়নি।

যদিও এরা সকলে নিহত হয়েছে, কিন্তু দুই দিন পর্যন্ত এদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই দেখে ভারতীয় সৈন্যরা অবাক্ হয়ে যায়। সৈন্যরা পুলিশকে ওদের লাশ উঠিয়ে নেয়ার জন্যে খবর পাঠায়। ভারতীয় সৈন্যরা কোন মুজাহিদকে শহীদ করতে পারলে তাঁর লাশ পুলিশের মারফত নিজ এলাকায় পৌঁছিয়ে দেয়, যাতে করে স্থানীয় জনসাধারণ লাশ দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নিজ নিজ সন্তানদেরকে জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত রাখে।

মুজাহিদদের এ গ্রুপের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের খবর সেনাবাহিনী ও পুলিশদের মধ্যে ব্যাপক আশংকা ও ভীতির সঞ্চার করে। সর্বত্রই মুজাহিদদের সাহস ও হিম্মতের কথা আলোচিত হতে থাকে। সফরের অবস্থায় ইতিপূর্বে কখনও কোন গ্রুপের এত সফল আক্রমণের ইতিহাস কাশ্মীরে এটাই মনে হয় প্রথম। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তারা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় সেনাদের বেষ্টনির মধ্যে থেকেও কেউ আত্মসমর্পণ করেনি।

পুলিশ যখন তাদের লাশ নিয়ে উপত্যকায় আসে, তখন সৈন্য ও পুলিশের বিপুলসংখ্যক সদস্য তাদের লাশ দেখার জন্য একত্রিত হয়। আমিও এ খবর পেয়ে লাশ দেখার জন্যে ওখানে যাই। কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও লাশগুলি তরতাজা ছিল। একজন নওজোয়ান– যার মাথায় লম্বা লম্বা চুল ছিল, দেখতে অনেকটা আফগানী বলে মনে হচ্ছিল– তাঁর মাথায় দু'টি গুলী বিদ্ধ হয়েছিল। তার লাশ থেকে বের হওয়া রক্তের খুশবুতে সমগ্র এলাকা বিমোহিত হয়ে পড়ে।

এখানকার লোকজন নানাভাবে তাদের সাহস ও বাহাদুরীর প্রশংসায় মেতে উঠে। পাশে দাঁড়িয়ে লাশ দেখার পর আমার নিজের মধ্যেও বিরাট এক পরিবর্তন লক্ষ্য করি। আমি তখনই বিশ্বাস করে নেই, একে যুদ্ধ বলা যায় না; বরং একেই বলে 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ'। এ কেবল কাশ্মীরের আযাদীর আন্দোলন নয়, এতো ইসলামের বিজয়ের আন্দোলন।

অতএব, আমি স্থির করেছি, যারা এ গ্রুপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আগেই যথাস্থানে পৌঁছে গেছে, আমি তাদের তালাশ করে বের করবই এবং তাদের সাথে মিলিত হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে শরীক হব। আপনি তো আফগান মুজাহিদ, যদি আপনি এদের কোন সন্ধান আমাকে দিতে পারেন, তবে আপনার মঙ্গলের জন্যে চিরদিন আমি দু'আ করব।'

এ সময় পুলিশ অফিসার তাঁর পূর্ণ পরিচয় আমাকে দেন। তাঁর বাড়ির ঠিকানাও জানালেন। যে এলাকায় তাঁর বাড়ী ঐ এলাকা সম্পর্কে আমার পরিপূর্ণ ধারণা ছিল। তিনি কোন কথা গোপন না রেখে সবকিছুই আমাকে বলল। সত্যিই তিনি ওই মুজাহিদদের খোঁজ করছিল।

আমি তাঁকে বললাম, আমি সেই গ্রুপেরই একজন সাধারণ মুজাহিদ।

আমার কথা শুনতেই তিনি বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকান এবং দাঁড়িয়ে আমাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কাঁদতে শুরু কর। এরপর তিনি আমার প্রতিটি কথা অবাক্ হয়ে শুনতে থাকেন।

আমি ত্াকে বললাম, সেই কাফেলার সবাই শহীদ হননি। সাতজন শহীদ হয়েছেন এবং বাকী আটজন বেষ্টনি থেকে জীবিত বের হয়ে এসেছেন।

তিনি বললেন, 'কিন্তু লাশ তো পাওয়া গেছে আটটা'!

এবার বুঝতে পারলাম, আমাদের যে গাইডকে ওরা ধোঁকা দিয়ে গ্রেফতার করেছিল, তাকেও ওরা শহীদ করে দিয়েছে। আমি বললাম, আপনি যে চুলওয়ালা মুজাহিদের কথা বলছেন, তাঁর নাম মাজরুহুল ইসলাম।

তিনি আবার বললেন, 'ভারতীয় সৈন্যদের বিশ্বাস, সেখান থেকে কেউ জীবিত ফিরে যেতে পারেনি। তারা এদেরকে তিন লাইনে বেষ্টন করে রেখেছিল

তিন লাইন অতিক্রম করে কারও পক্ষে বের হয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। তবে তাদেরকে অবাক্ হতে হয়েছে এই দেখে যে, মুজাহিদরা সবাই তাদের লাশের হেফাযতের জন্যে পাশে মাইন বিছিয়ে রেখেছিল, যার বিস্ফোরণে দু'জন সৈন্য নিহত হয়েছে।

তারা আরও আশ্চর্যান্বিত হয়েছে এই দেখে যে, এক সৈন্য পাথরের নীচে এক মুজাহিদকে গ্রেনেড মেরে হত্যা করেছিল। কিন্তু পরে সেখানে তার ফটোসহ কার্ড পাওয়া গেছে; কিন্তু তাঁর লাশ বা অস্ত্র কিছুই পাওয়া যায়নি। তার ফটো নিয়ে ইণ্ডিয়ান সৈন্যরা শিকারী কুকুর দিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছে; কিন্তু কোথাও তাঁর লাশ পাওয়া যায়নি। জানি না, তাকে মাটি খেয়ে ফেলেছে না আসমানে তুলে নেয়া হয়েছে।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, না, তাকে মাটিও খেয়ে ফেলেনি আকাশেও তুলে নেয়া হয়নি। সে এখন আপনার সামনেই বসে আছে। আমি তখন যখম ও পা পুড়ে যাওয়ার দাগ দেখালাম, যার উপর তখনও পট্টি বাধা ছিল।

তিনি আবার আমাকে বুকে চেপে ধরে বার বার চুমু খেতে থাকেন এবং শিশুর মত কাঁদতে শুরু করেন। তিনি বললেন, 'আর আমি পুলিশের ডিউটিতে যাব না। আমি আপনাদেরই খোঁজ করছিলাম। আপনাদের পেয়ে গেছি। এখন আপনাদের সাথে মিলে জিহাদ করব।'

আমি তাকে বললাম, আপনি চাকুরী ছাড়বেন না, চাকুরীতে থেকেও আপনি অনেক সহযোগিতা করতে পারেন।

আমার কথার অর্থ তিনি বুঝতে পেরে ঠিক করলেন, পুলিশের মধ্যে থেকে শত ঝুঁকির মধ্যেও তিনি মুজাহিদদের সহযোগিতা করবেন। ঐ পুলিশ অফিসার আরও বললেন যে, ঐ যুদ্ধে ঘটনাস্থলে ২৬ জন সৈন্য নিহত হয়েছে এবং ১০ জন মারাত্মক আহত হয়ে হাসপাতালে মারা গেছে।

অবশেষে তাঁর সাথে ওয়াদা করলাম, শীঘ্রই এমন একজন মহান কমাণ্ডারের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব, যিনি বাকী সাথীদের শুধু ভারতীয় সৈন্যদের ঘেরাও থেকে বের করে উপত্যকায়ই পৌঁছিয়ে দেননি, পরবর্তিতে বড় বড় যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের পরাজিতও করেছেন। এ কথা শুনেই তিনি কমাণ্ডারের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেন।

কমাণ্ডার আমজাদ বেলাল

কাশ্মীর রণাঙ্গনে আল্লাহর সাহায্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি

[কমাণ্ডার আমজাদ বেলাল ১৯৯১ সনের নভেম্বর মাসে অধিকৃত কাশ্মীরে প্রবেশ করেন। সেখানে সুদীর্ঘ এক বছর অবস্থান করে আবার তিনি পাকিস্তানে ফিরে আসেন। কাশ্মীরে তিনি কিভাবে পৌঁছলেন, সফরে কি কি সমস্যায় পড়েছেন, সেখানকার মুসলমানদের মানসিকতা কেমন, সেখানে ইণ্ডিয়ার সৈন্যরা কিভাবে ক্রেক ডাউন করে, তিনি কিভাবে সৈন্যদের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং আল্লাহ্‌র যে সব মদদ তিনি নিজ চোখে দেখেছেন, তাঁর বিবরণ এ লেখায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর এ ঘটনাবহুল এক বছরের ইতিহাস আমরা তাঁর জবানীতেই হুবহু পেশ করছি]

আল্লাহ্ তা'আলার অসীম রহমতে আমি বেশ কয়েক বছর আফগান জিহাদে শরীক ছিলাম। সেখানকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

ছাত্র অবস্থায় আমার মনে কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য জিহাদ করার আগ্রহ জাগে। আর সে প্রেরণায়ই আমি ঘর ছেড়ে হাজার মাইল দূরে আফগান ভূমিতে জিহাদ করার জন্যে উপস্থিত হই। সেখানে মুজাহিদ ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর জিহাদে যোগদান করি।

১৯৯১ সালের নভেম্বরে একটি মুজাহিদ সংগঠনের গ্রুপ কমাণ্ডার হিসেবে আমাকে কাশ্মীরে পাঠানো হয়। এর আগে এক অপারেশনে আমি আহত হই। আঘাত থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়ায় সংগঠনের চীফ কমাণ্ডার আমাকে আরো কিছুদিন বিশ্রাম নেয়ার পর রওনা করার পরামর্শ দেন। কিন্তু সাথীদের আবেগ ও আগ্রহ দেখে আমার আর বসে থাকতে ইচ্ছে হল না। চীফ কমাণ্ডারকে বারবার অনুরোধ করে অনুমতি আদায় করে নিলাম।

আমাদের গ্রুপে মোট একত্রিশ জন মুজাহিদ। এর মধ্যে 'আল-বারক' নামক একটি সংগঠনেরও বেশ কিছু মুজাহিদ ছিল। এদের সকলের জিম্মাদারী আমার উপর ন্যস্ত করা হয়। আমাদের গ্রুপের আগে আরও চারটি গ্রুপ আজাদ কাশ্মীর থেকে অধিকৃত কাশ্মীরে রওনা করেছিল। ইণ্ডিয়ান সৈন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে পথ তৈরি করতে না পারায় তারা ফিরে আসে।

১৮ই নভেম্বর পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট মুনাজাত করে রওনা করলাম। আমাদের একত্রিশজনের মধ্যে ত্রিশজনই অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দা।

একমাত্র আমি ছিলাম আজাদ কাশ্মীরের। নির্যাতিত মুসলমান ভাইদের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশ ও জীবনের মায়া ত্যাগ করে সশস্ত্র অবস্থায় দুর্গম পাহাড়ী পথে রওনা করলাম। অধিকৃত কাশ্মীরের সীমান্তে প্রবেশের পর আমাদের চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচু একটি পাহাড় অতিক্রম করতে হয়। সাধারণতঃ এ পাহাড়ে উঠতে দশ ঘন্টার মত সময় লাগে। আমরা দ্রুততার সাথে চলে সাত ঘন্টায় সেখানে উঠি। এ দীর্ঘ চলার পথে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে এবং আল্লাহর সাহায্য আমরা নিজ চোখে অবলোকন করি।

আল্লাহর প্রথম সাহায্য

সন্ধ্যার পর আমাদের সফর শুরু হয়। রাত দু'টার দিকে আমরা সোজা পূর্ব-মুখো হয়ে সফর অব্যাহত রাখি। চলতে চলতে আমরা ভুলক্রমে ভারতীয় সৈন্যদের দু'টি পোস্টের মধ্যবর্তী স্থানে ঢুকে পড়ি। দু' পোস্টের ব্যবধান বড়-জোর দু'শ মিটার। মাঝখানে একটি তার ঝুলানো। তারের সাথে টিনের ঘন্টি বাধা। উদ্দেশ্য, কেউ মধ্যবর্তী স্থান অতিক্রম করলে তারের টানে ঘন্টিটা বেজে উঠবে এবং দু'পাশের পোস্টের সৈন্যরা এ উপস্থিতির খবর জেনে যাবে।

আমি অবস্থার ভয়াবহতা বুঝতে পেরে ইশারায় সাথীদের বসে যেতে বললাম। এরপর তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি যে, আর পিছু হটা যাবে না, সামনে পিছনে সমান বিপদ। যেভাবে হোক সামনে এগুতেই হবে। সবাইকে অবস্থার ভয়াবহতা বুঝিয়ে বলে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকি।

দুশমনরা অবশ্যই আমাদেরকে দেখতে পেয়েছিল। আমরা অপেক্ষায় ছিলাম, কখন তারা হামলা করে। ইতিমধ্যে আমরা অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী পোস্টের লোকজনের কথার আওয়াজ শুনতে পাই। সেখান থেকে কেউ নিকটবর্তী পোস্টের কমাণ্ডারকে ওয়ারলেসে বলছে, 'মনে হচ্ছে আমাদের পোস্টের মধ্যে দুশমন ঢুকে পড়েছে'।

নিকটবর্তী পোস্টের কমাণ্ডার বলল, 'না তেমন তো কিছু দেখছি না। আর এর মধ্যে কার ঢুকতে সাহস হবে?'

দূরবর্তী পোস্টের কমাণ্ডার বলল, 'ভাল করে দেখ, আমার মনে হয় কিছু দেখতে পাচ্ছি'। অপর কমাণ্ডার দৃঢ়তার সাথে তার ধারণা খণ্ডন করল।

তারা ঠিকই আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা লড়াই করতে রাজী ছিল না। সম্ভবতঃ তারা মনে করেছিল, এত সাহস নিয়ে যারা এ পর্যন্ত এসেছে, তাদের উপর আঘাত করলে পাল্টা আক্রমণ অবশ্যই হবে। এ মধ্যরাতে তাদের এতবড় ঝুঁকি নেয়ার সাহস ছিল না।

আমরা আধা ঘন্টা অবস্থানের পরও দেখলাম, তারা আমাদের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। অতঃপর একটা লাঠির সাহায্যে তার উঁচু করে ধরে নীচ দিয়ে একে একে ক্রোলিং করে সবাই বেরিয়ে আসি।

আমাদের সহযোগী অন্য গ্রুপের সাথীদের ইসলাম ও জিহাদের ব্যাপারে তেমন একটা জ্ঞান ছিল না, এমন কি নামাজের ব্যাপারেও তারা উদাসীন ছিল। আমি আস্তে আস্তে তাদেরকে আল্লাহ্‌র কুদরতের বর্ণনা দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখি। পথে যখনই আমরা বিশ্রাম নিতাম বা নামাজের সময় হত, সবাইকে নামাজের তাগাদা দিতাম। আল-হামদু লিল্লাহ্‌, আমাদের কাফেলার সকল সাথী পথেই পাকা নামাযী হয়ে যায় এবং তারা আমার সাথে ওয়াদা করে, কখনও আর নামাজের ব্যাপারে গাফলতি করবে না।

আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় সাহায্য

তীব্র শীতের মওসুম শুরু হওয়ার আগে আমাদের কাফেলাই ছিল সর্বশেষ কাফেলা। বরফপাতের জন্যে আগামী ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় কোন কাফেলার কাশ্মীরে প্রবেশ সম্ভব হবে না। এ সময় সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যদের সংখ্যাও বেশী ছিল। তারা গুপ্তচরের মাধ্যমে সর্বদা কাফেলার আগমনের খবর জানার চেষ্টা করত। আমাদের আগমনের খবর তারা আগেই পেয়ে যায়। একশ' চল্লিশজনের এক ইণ্ডিয়ান সেনাদল আমাদের ধরার জন্যে পথে ওঁত পেতে থাকে। তারা পাহাড়ের এমন দু'টি চূড়ায় অবস্থান নেয়, যার মধ্য থেকে যাওয়া ছাড়া আমাদের কোন উপায় ছিল না। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে বুঝতে পারলাম, দুশমন আমাদের ঘিরে ফেলেছে। এমন কঠিন অবস্থায় লড়াই করাও যুক্তিসংগত নয়। অতএব আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে নতুন কৌশল অবলম্বন করলাম।

সাথীদেরকে একটি পাহাড় দেখিয়ে আমি বললাম, তোমরা সামনে অগ্রসর হয়ে ঐ পাহাড় পর্যন্ত যাবে এবং সেখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে আবার ফিরে আসবে। এভাবে একজন মুজাহিদ চার পাঁচবার করে আসা-যাওয়া করবে। আল্লাহ্‌র রহমতে আমরা এ কৌশলে দুশমনকে ধোঁকায় ফেলতে সক্ষম হই। তারা গুপ্তচর থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশজনের এক গ্রুপের খবর পেয়েছিল। এবার আমাদেরকে তারা মনে করল, কয়েক'শ মুজাহিদের বিরাট এক কাফেলা। ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বিনা যুদ্ধেই তারা ময়দান ত্যাগ করে চলে যায়।

আটদিন সফরের পর আমরা কাশ্মীরের এক গ্রামে পৌছি। সেখান থেকে 'আল-বারক' গ্রুপের মুজাহিদরা আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে নিজ এলাকায় চলে যায়। আমরা কেন্দ্রের নির্দেশের অপেক্ষায় সেখানে অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

সাতদিন পর্যন্ত এ গ্রামে অবস্থান করে আমরা আমাদের আমীরের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু তাঁর সাথে কোন যোগাযোগ করতে না পারায় আমরা আরো দু'দিন সফরের দূরত্বের এক গ্রামে যাবার সিদ্ধান্ত নেই।

পরিকল্পনা অনুযায়ী সে গ্রামে উপস্থিত হলাম। সেখান থেকে শ্রীনগর, সোপুর ও কুপওয়ারার দিকে দু'টি পথ চলে গেছে। আমার কাশ্মিরী সাথীরা অনেকদিন পাকিস্তানে ছিল এবং এ অবস্থায় আমীরের সাথে যোগাযোগ না হওয়ায় তারা কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ে এবং আমার কাছে বার বার ছুটির অনুমতি চাইতে থাকে। অনেক দিন ধরে পিতা-মাতা ভাই-বোনদের সাথে তাদের দেখা সাক্ষাৎ নেই। স্বাভাবিকভাবেই বাড়ী যাবার জন্যে তাদের মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। তাদের মানসিক অবস্থার কথা ভেবে সকলকে নির্দিষ্ট শর্তে ছুটি দিলাম। শুধু একজন মুজাহিদ আমার সাথে থেকে গেল। যাবার সময় বার বার তারা আমাকে সঙ্গে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ জানায়। আমি কেন্দ্রের নির্দেশনা মত চলার ইচ্ছে প্রকাশ করে তাদের অনুরোধ রক্ষা সম্ভব নয় বলে জানাই।

আমার বাকী সাথীরাও একদিন শ্রীনগর-সোপুরের পথ ধরে চলে যায়। একজন গাইড সাথে নিয়ে আমি এবার আমীর সাহেবের নিকটবর্তী এক গ্রামে পৌঁছি। এখানে আমি এক মুজাহিদের ঘরে অবস্থান নেই। সে মুজাহিদ অন্য গাঁয়ে অবস্থান করত। পাঁচদিন অবস্থানের পরও আমীর সাহেবের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হলাম না।

এদিকে সর্বত্র প্রচার হয়েছে যে, এ গ্রামে একজন আফগান মুজাহিদ এসেছে। ইণ্ডিয়ান সৈন্যরা তাই আমাকে ধরার জন্যে পঞ্চম রাতে সমগ্র গ্রাম ঘেরাও করে। অর্থাৎ– রাতের পর সকালে ঐ গ্রামব্যাপী ক্রেক ডাউন। এ সময় সমগ্র গ্রাম ঘেরাও করে কারফিউ জারী করা হয়। প্রতিটি ঘর থেকে পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধদের বের করে এক মাঠে সমবেত করা হয়। তারপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছেড়ে দেয়া হয়, যাতে কেউ লুকিয়ে থাকতে না পারে। মাঠের মধ্যে একে একে সবার পরিচয় যাচাই করে দেখা হবে কোন মুজাহিদ বা সন্দেহভাজন ব্যক্তি আছে কিনা। ক্রেক ডাউনের সময় যেসব অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়, তার বর্ণনা ভাষাতীত। গ্রামের লোকেরা সবাই আমাকে জানত। তারা এসে বলল, 'ভাইসাব! ইণ্ডিয়ান সৈন্যরা গ্রাম ঘিরে ফেলেছে। ভোরেই ক্রেক ডাউন হবে, আপনি যেভাবেই হোক আত্মরক্ষা করুন।'

আমি যে ঘরে ছিলাম, সে ঘরে আমার দু'জন মুসলমান বোন ছিল। তারা আমাকে ভাই বলে ডাকত। তারা এসে বলল, 'ভাইজান! আপনি অপেক্ষা করুন, আমরা রাতের আঁধারে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আসি। দেখি বের হওয়ার কোন রাস্তা বের করা যায় কিনা।'

ঘন্টাখানেক পরে এসে তারা বলল, 'সৈন্যরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বেষ্টনী তৈরী করেছে। প্রতি পাঁচ মিটার অন্তর অন্তর একজন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। তবে এক স্থানে একটি পানির নালা আছে। তার দু'পাশের পাহারাদার দু'জনের মাঝখানে একটু বেশী ফাঁকা দেখা যায়। যদি এর মধ্য দিয়ে বের হতে পারেন, এছাড়া বের হবার বিকল্প কোন পথ নেই।'

দুই সৈন্যের মধ্য দিয়ে বের হওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। আমি ক্লাসিনকোভ লোড করে শরীরে কোট চাপিয়ে টুপি খুলে সে দিকে রওনা দিলাম। পথে অনেক দু'আ পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে গায়েবী সাহায্য প্রার্থনা করলাম। আমার ক্লাসিনকোভ লোড করা ছিল। যদি ধরা পড়ার আশংকা দেখা দেয়, তবে ওদের উপর সোজা গুলী করব। শাহাদাতের আগে যে ক'জন নিয়ে যেতে পারি তা-ই লাভ।

পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আস্তে আস্তে সৈন্যদের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলাম। অন্ধকারে আমার কোটের চমক দেখে সৈন্যরা ধোঁকায় পড়ে যায়। তারা আমাকে তাদের অফিসার মনে করে জিজ্ঞেস করে 'কোথায় যাচ্ছেন স্যার?'

আমি বুঝতে পারলাম, তারা ধোঁকায় পড়েছে। দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, 'আমি প্রস্রাব করে আসছি, এদিকে খেয়াল রেখ।'

কারও পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব নয় যে, মুজাহিদরা এত সাহসী হতে পারে এবং ক্লাসিনকোভ হাতে নিয়ে সৈন্যদের মধ্য দিয়ে এভাবে পথ অতিক্রম করতে পারে। আমি গ্রাম থেকে বের হয়ে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে উঠে এক ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকি।

সকাল হতেই ভারতীয় সৈন্যরা গুপ্তচর সাথে নিয়ে গ্রামে ঢুকে পড়ে। আমি একটা ঝোপের আড়ালে বসে গ্রামের দিকে তাকিয়ে থাকি। সৈন্যরা ঘরে ঘরে গিয়ে সকল জোয়ান, বৃদ্ধ ও শিশুদেরকে টেনে টেনে এক মাঠে জমা করে। মহিলাদের উপর চালায় পাশবিক নির্যাতন। তারা যেভাবে মহিলাদের একত্র করে ও যেভাবে তাদের সাথে হিংস্র পশুর মত ব্যবহার করে, তা দেখে লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়। যার যার ঘরে আমি থাকতে পারি বলে সন্দেহ হয়, তাদের সবার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় পাষণ্ড সৈন্যরা। সবার কাছেই তাদের এক প্রশ্ন, 'কোথায় সেই আফগান মুজাহিদ?'

আমার জীবন ঐসব সম্মানিত গ্রামবাসীর জন্যে কুরবান হোক, যাদের উপর এত জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও তারা আমার সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশ করেনি। ইতিপূর্বে এরা অনেকবার আমাকে বলেছে, 'পুরো গ্রাম শেষ হতে পারে। আমরা সব কিছু কুরবানী দিতে পারি; কিন্তু আপনার কোন ক্ষতি হোক তা আমরা বরদাস্ত করব না। যে কোনভাবেই আমরা হোক আপনার হেফাজত করবই। আপনি আমাদের মেহমান, আমাদের মুক্তির মহান দূত।'

ভারতীয় সৈন্যরা দুপুর নাগাদ ঘেরাও তুলে গ্রাম থেকে বের হয়ে যায়। যাওয়ার সময় চারজন নওজোয়ানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। সৈন্যরা চলে যেতেই গ্রামের লোকেরা আমার খোঁজে বের হয়, সারা গ্রাম তন্ন তন্ন করে আমাকে খুঁজতে থাকে। বেলা দু'টোর দিকে আমি পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসি। আমাকে জিন্দা দেখা মাত্র সারা গ্রামের লোক একত্র হয়ে আমাকে মোবারকবাদ জানাতে থাকে। কেউ চুমু খেতে থাকে, কেউ বুকে জড়িয়ে ধরে। যেন তারা তাদের সব দুঃখ, সব নির্যাতনের বিষাদ আমাকে জিন্দা পাওয়ার আনন্দে ভুলে গেছে।

যে চারজন গ্রামবাসীকে সৈন্যরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তারা যদিও মুজাহিদ ছিল না; কিন্তু তারা আমার সম্বন্ধে ভালোভাবে জানত। আমার ভয় হচ্ছিল, যদি নির্যাতনের মুখে তারা আমার খবর এবং যে ঘরে আমি থাকি, তা তাদের বলে দেয়, তবে অবস্থা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

দিনের আলোতেও সৈন্যরা কিছু দেখতে পেল না

প্রথম ক্রেক ডাউনের পরও আমি এ গ্রামে রয়েছি, সে খবর ভারতীয় সৈন্যরা জানতে পেরে দু'দিন পর পুনরায় গ্রামে ক্রেক ডাউন বসায়। এবার তারা রাত সাড়ে বারোটায় গ্রাম ঘিরে ফেলে। পাঁচ হাজার ফৌজের এক বিশাল গ্রুপ এ তল্লাশী অভিযানে অংশ নেয়। রাত দু'টার সময় আমার কাছে ক্রেক ডাউনের খবর পৌঁছে। তখন গ্রাম থেকে বের হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কোন উপায় না দেখে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে থাকি। এর মধ্যে আমার সেই কাশ্মিরী দু'বোন এসে হাজির। শলা-পরামর্শের পর তারা বলল, 'আমাদের ঘরের এক পাশে ঘাসের স্তূপ রয়েছে, তার মধ্যে লুকানো ছাড়া এখন আত্মরক্ষার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।'

অন্য কোন উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত তাদের পরামর্শে রাজী হলাম। তারা দু'বোন অনেক যত্নসহকারে এক পাশের ঘাস সরিয়ে আমাকে তার মধ্যে রেখে ঘাস পুনরায় আগের মত সাজিয়ে রাখে।

ভোরে সৈন্যরা গ্রামে প্রবেশ করে ঘরে ঘরে তল্লাশী চালায়। যেখানে যা পায় ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলে, মূল্যবান জিনিসগুলো লুটে নেয় এবং অন্য সব জিনিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। ধ্বংস তাণ্ডবের পর শেষে একটা গ্রুপ ঘাসের স্তূপের কাছে এসে দাঁড়ায়। একজন সৈন্য অফিসারকে লক্ষ্য করে বলল, 'স্যার! এ ঘাসের স্তূপে তল্লাশী নিয়ে দেখবো?'

অফিসার ধমক দিয়ে বলল, 'এর মধ্যে কিছুই নেই। প্রথমে দুষ্কৃতিকারীরা এ সবের মধ্যে অস্ত্রপাতি লুকিয়ে রাখত। আমরা তা টের পেয়ে এতে আগুন

লাগাতে থাকি। এখন তারা সাবধান হয়ে গেছে। এখন তারা এর মধ্যে কিছুই রাখে না।'

'তবুও স্যার একটু দেখে নেই?' অনুরোধের সুরে সিপাহী অফিসারকে বলল।

বিরক্ত হয়ে অফিসার তার পকেটের দিয়াশলাইটি হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'যাও আগুন ধরিয়ে দাও!'

তারা যা কিছু বলছে, তা আমি কান পেতে শুনছিলাম। লোড করা ক্লাসিনকোভ আমার হাতেই ছিল। এক লাফে বের হয়ে কয়েকজন সৈন্যকে জাহান্নামে পাঠানো আমার পক্ষে এখন অতি সহজ। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমগ্র গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে; তাই তা থেকে বিরত থাকলাম।

সৈন্যটি স্তূপের এক পাশে দাঁড়িয়ে দিয়াশলাই জ্বালানোর চেষ্টা করছে। আমার মনে হল, স্তূপের ওপাশে আগুন লেগে গেছে। এবার সে অন্য পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাচের কাঠি ঘষছে। ধারণা করলাম, সে এক সাথে উভয় পাশে আগুন লাগাতে চাচ্ছে, যাতে তাড়াতাড়ি এটি জ্বলে শেষ হয়ে যায়। এরপর তৃতীয় কাঠি জ্বালাবারও আওয়াজ পেলাম। মনে মনে ভাবলাম, আগুন হয়ত আমার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এক লাফে বাইরে বেরিয়ে এ দু' ইণ্ডিয়ানকে প্রথমে জাহান্নামে পাঠাব। তারপর যা হবার হবে।

তৃতীয় কাঠি জ্বালাবার পর পরই অফিসারের কর্কশ আওয়াজ শুনতে পেলাম, 'হারামখোর কোথাকার, একটা ম্যাচও জ্বালাতে পার না।'

সৈন্যটি বিনয়ের সাথে বলল, 'স্যার, দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বলছে না, একটি কাঠি বাকী আছে। নিন, এটা আপনিই জ্বালান।'

অফিসার রাগে-গোস্বায় জ্বলতে জ্বলতে দিয়াশলাই তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে খোঁচা মারল। আমিও এক লাফে বের হতে তৈরী হলাম। এমন সময় শব্দ পেলাম, অফিসার ম্যাচটিকে সজোরে নীচে ফেলে বুট দিয়ে পিষে দিচ্ছে। লজ্জায়-গোস্বায় জ্বলতে জ্বলতে সেপাইকে বলল, 'যাও, ঐ ঘর থেকে ম্যাচ নিয়ে এস।'

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন সৈন্য সেখানে এসে পৌঁছে। সারা ঘরের মালপত্র নীচে ফেলে তারা দলাই-মালাই করে। কিন্তু কোথাও ম্যাচ খুজে পাচ্ছে না। অথচ ম্যাচ তাদের চোখের সামনে চুলোর পাশেই রাখা ছিল। আল্লাহ্ তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছেন, তাই দিবালোকেও তারা ম্যাচ খুঁজে পেল না। ইতিমধ্যে অফিসার ডাক পাড়ল, 'আমি বলেছিলাম না, এর মধ্যে কিছু নেই, খামোখা সময় নষ্ট করছ!' একথা শুনে সৈন্যরা ফিরে যায়।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা করার মত ভাষা আমার নেই। তিনি ভাষার মুখাপেক্ষী নন এবং হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করার ক্ষমতাও আমাদের

নেই। আমরা পারি তার দরবারে সেজদায় লুটিয়ে পড়তে। আল্লাহ্র এ প্রত্যক্ষ মদদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি তাঁর দরবারে দু'আ করতে থাকলাম।

গাড়ী চলার শব্দ শুনতে পেলাম, ইণ্ডিয়ান সৈন্যরা ক্রেক ডাউন তুলে ফিরে যাচ্ছে। তারা যাবার আগে গ্রামের মেয়েদের সাথে এমন অশালীন আচরণ করেছে, যা বর্ণনা দিতেও লজ্জাবোধ হয়।

সৈন্যরা চলে যেতেই আমার দু'বোন এসে ঘাস থেকে আমাকে বের করল। আমাকে জীবিত দেখে তাদের সে কি কান্না। তাদের সশব্দ কান্না দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। আমি বেঁচে যাওয়ায় তারা যে আনন্দ প্রকাশ করল, তাতে লজ্জিত না হয়ে পারলাম না। আমি বার বার ভাবতে লাগলাম, এরা আমাদের কাছে কত বড় আশা রাখে। অথচ আমরা কত দুর্বল, তাদের আযাদীর জন্যে আমরা কতটুকু-ই করতে পারছি!

দেখতে দেখতে গ্রামের সকল লোক এসে আমার চার পাশে জড়ো হয়। পুরুষ-মহিলা, বৃদ্ধ-শিশু সবার চোখ থেকে খুশিতে আনন্দাশ্রু বের হচ্ছে। আমি নিরাপদে বেঁচে যাওয়ার জন্যে তারা একে অপরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছে। জানতে পারলাম, ঘেরাওয়ের সময় কয়েকজন মহিলা নামাজ পড়ে আমার জন্যে দু'আ করেছে। আমাকে জীবিত ও সুস্থ দেখে তারা যে কত আনন্দিত হয়েছে, তা মুখের ভাষায় বুঝানো সম্ভব নয়।

সশস্ত্র অবস্থায় শ্রীনগর যাত্রা

এ গ্রামে আমি এগারোদিন ছিলাম। বার বার ক্রেক ডাউন হওয়ায় রাতে গ্রামে থাকা ঠিক নয় ভেবে দিনের বেলা গ্রামে কাটিয়ে রাতে পাহাড়ে চলে যেতাম। আমার সাথে গ্রামের তিনটি কিশোর রাত কাটাতে পাহাড়ে যেত। তারা মোর্চা খুঁড়ে সেখানে আমাকে ঘুম পাড়াত ও নিজেরা পালা করে পাহারা দিত। তাদের জিহাদী জযবা ও ভারতের প্রতি প্রবল ঘৃণা দেখে আমি বিস্মিত হতাম। আমার কাছে একটি ক্লাসিনকোভ ও দু'টি পিস্তল ছিল। তারা ক্লাসিনকোভ ও পিস্তল নিয়ে মোর্চার আশেপাশে পাহারা দিত আর আমি নিরাপদে ঘুমাতাম। তারা আমার কাছে অস্ত্রের ট্রেনিং নিত এবং সর্বদা বলত, 'কাশ্মীর আমাদের, আমরা মুসলমান, কাশ্মীরের আযাদী আমরা ছিনিয়ে আনব-ই।'

আমার কারণে এ গ্রামে দু' বার ক্রেক ডাউন হয়েছে। আবারও হবার সম্ভাবনা আছে। ভারতীয়রা আফগান মুজাহিদদের যমের মত ভয় করে। করবেই বা না কেন? তাদের আদর্শিক গুরু রুশদের নাকানি-চুবানি খাইয়েছে এই শক্তপেশী ও ইস্পাতকঠিন ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান আফগানীরা। অতএব যতদিন

তারা গ্রামে কোন আফগান মুজাহিদের অবস্থানের কথা শুনবে, ততদিন ক্রেক ডাউন চলতেই থাকবে।

এ জন্যে অন্যত্র চলে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করতে থাকি। এ কথা দু' একজনের কাছে প্রকাশ করতেই গ্রামের সব লোক আমার নিকট এসে অনুনয়-বিনয় করে বলতে শুরু করে, 'আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমাদের ছেড়ে চলে যাব না আপনি'।

যদিও তারা আমার কোন যুদ্ধের প্রোগ্রাম দেখেনি, শুধু লোক মুখে আফগান মুজাহিদদের বীরত্বগাঁথা শুনে আমাকেও একজন বীর মুজাহিদ বলে ধারণা করছে। তারা বার বার বলতে থাকে, 'আমরা বহুদিন ধরে হয়ত আপনারই প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমরা এ আশা নিয়ে জিহাদ শুরু করেছি যে, আফগানী ভাইয়েরা এসে আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুলতান মাহমুদ ও আহমদ শাহ আবদালীর মত এ পবিত্র ভূমি থেকে মূর্তিপূজারী পৌত্তলিকদের চিরতরে বিতাড়িত করবে। আমরা আপনাদের বহু বীরত্বগাঁথা ও কেরামতের কথা শুনেছি। এবার তা চাক্ষুষ দেখলাম। আমরা গ্রামের সকলে শহীদ হয়ে যাব, নিজেদের সব কিছু বিসর্জন দেব, তবুও আপনার হেফাজতে বিন্দুমাত্র গাফলতী করব না। আপনি আমাদের এখানেই থাকুন। আমরা আশা করি, যতদিন আপনি এ গ্রামে থাকবেন, ততদিন আল্লাহ্র রহমত আমাদের উপর বর্ষিত হতে থাকবে।'

তাদের অনুরোধে আমি এ গ্রামে থেকেই আমীর সাহেবের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু কোন প্রকার যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ায় অগত্যা গ্রাম ছেড়ে শ্রীনগর যাওয়ার প্রস্তুতি নেই।

গ্রামের সকল পুরুষ-মহিলা, শিশু-কিশোর জড়ো হয়ে আমাকে বিদায় জানায়। তারা আমার সাথে সাথে গ্রাম থেকে দু' কিলোমিটার দূর পর্যন্ত হেঁটে এসে আমাকে বিদায় দেয়। সকলের চোখে অশ্রু দেখে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে এসে আমার দু'বোন দোপাট্টা উড়িয়ে আমাকে বিদায় জানায়। আর তাদের মা দু'হাত উঁচু করে আল্লাহর কাছে আমার নিরাপত্তার জন্যে দু'আ করতে থাকে। যে বালক তিনটি পাহাড়ে আমাকে পাহারা দিত, বাসষ্ট্যাণ্ড পর্যন্ত তারা আমাকে এগিয়ে দিয়ে যায়।

সব কিছু গ্রামে রেখে শুধু ক্লাসিনকোভ, পিস্তল ও গ্রেনেডটি সাথে নিয়ে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে রওনা হলাম। ক্লাসিনকোভ কাঁধে ঝুলিয়ে তার উপর কাশ্মিরী আলখেল্লা জড়িয়ে নিলাম।

বাসে উঠার সময় কন্ট্রাক্টর আমাকে সহযোগিতা করতে হাত বাড়ালে তার হাতের নীচে ক্লাসিনকোভ পড়ে। সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করে 'মৌলভী সাব! আপনি কোথা থেকে এসেছেন, যাবে কোথায়?'

তার কাশ্মিরী ভাষার প্রশ্নের জবাবে আমি উর্দুতে বললাম, 'আমি শ্রীনগর যাব।'

সে বলল, 'আপনি এ বাসে যেতে পারবেন না।'

আমি বললাম, কেন পারব না?

আমার ভাষা শুনে ও চেহারা-সুরত দেখে সে ধারণা করেছে, আমি কাশ্মিরী নই, আফগানী কিংবা পাকিস্তানী হব। আবার সে বলল, 'এখন পর্যন্ত কোন সশস্ত্র লোককে এ বাসে করে শ্রীনগর নেইনি। তাছাড়া এখান থেকে শহর পর্যন্ত দশটি চেকপোস্ট আছে। প্রতিটি পোস্টে তন্ন তন্ন করে তল্লাশী করা হয়। সকল যাত্রীকে নীচে নামিয়ে দেহ-তল্লাশী করা হয়। আপনি কোন্ সাহসে এভাবে শ্রীনগর রওনা করেছেন?'

যাত্রীদের মধ্যেও আমার বিষয়ে গুঞ্জন শুরু হয়। সবাই বলল, 'আপনি এপথ সম্পর্কে খবর রাখেন না। নেমে যাওয়াই আপনার জন্যে নিরাপদ।' তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আমাকে ধমকীও দিতে লাগল, 'ভালোয় ভালোয় নেমে পড়, নইলে . . . . . .।

এবার আমি কঠিন স্বরে জবাব দিলাম, 'নিজ নিজ সিটে চুপচাপ বসে থাকুন। আমার জীবন আমার নিকট কম প্রিয় নয়। কিছুই হবে না, ঠিকমত পৌঁছে যেতে পারব।'

আমার ধমকী খেয়ে তারা আস্তে আস্তে চুপ হয়ে যায়। কন্ট্রাক্টরকে বললাম, আমাকে যেতে দাও, পরে যা হবার হবে, সেজন্যে চিন্তা করি না।

বাস ছাড়তেই আমি সিটে বসে দু'হাত তুলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে মুনাজাত করতে লাগলাম, হে খোদা! আমি তোমার রাস্তায় তোমার দ্বীনকে বিজয়ী করতে, লাঞ্ছিত মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করতে মাতৃভূমি ছেড়ে সুদূর প্রবাসে একাকী পথ চলছি। তুমিই আমার একমাত্র সহায়, আমাকে হেফাযত কর এবং নিরাপদ পথ প্রদর্শন কর। তুমি ছাড়া আমার দ্বিতীয় কোন সহায় ও সাহায্যকারী নেই।

আমি কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করতে থাকি। বাস দ্রুতবেগে এগিয়ে চলছে। কন্ট্রাক্টরসহ সকল যাত্রী আমার ব্যাপারে কানাঘুষায় লিপ্ত। ইতিপূর্বে আমি অনেকবার আল্লাহ্র সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছি। অতএব নিশ্চিন্ত মনে নীরবে আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলাম।

আর মাত্র এক কিলোমিটার দূরে ইণ্ডিয়ান সৈন্যদের প্রথম চেকপোস্ট। যাত্রীদের চেহারা আতঙ্কে পাণ্ডুর। একটু আগেও আবহাওয়া ছিল সুন্দর, আকাশও ছিল পরিষ্কার; এরই মধ্যে হঠাৎ বরফপাত শুরু হয়। দেখতে না দেখতে সাদা বরফে ঢেকে যায় সমগ্র এলাকা। শীত মওসুমের এটাই প্রথম বরফপাত।

ইণ্ডিয়ান সৈন্যরা রাস্তার উপর তাঁবু ফেলে রেখে নিরাপদ আশ্রয়ে কোথাও চলে গেছে। আমি বুঝতে পারলাম, আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হচ্ছে। বিনা তল্লাশীতে আমরা চোকপোস্ট পার হলাম। প্রথম বাধা নিরাপদে অতিক্রম করায় যাত্রীদের ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে। তারা আমাকে নানা প্রশ্ন শুরু করল। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? কোন সংগঠনের সাথে আপনার সম্পর্ক? ইত্যাদি হরেক রকমের প্রশ্ন।

কন্ট্রাক্টর কাছে এসে বলল, 'আজ পর্যন্ত এমন সাহসী মুজাহিদের দেখা পাইনি, যে অস্ত্র নিয়ে এভাবে নির্ভয়ে শ্রীনগর প্রবেশ করার সাহস পেয়েছে।

আমি বললাম, আল্লাহ্‌র সাহায্য আমাদের সাথে অবশ্যই আছে। আমরা সকলে নিরাপদে শ্রীনগর পৌঁছে যাব ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ্‌র অপার রহমতে শ্রীনগর পর্যন্ত পথের কোন পোস্টের সৈন্যরা বরফপাতের জন্য রাস্তায় এসে তল্লাশী করার সুযোগ পায়নি। শ্রীনগর এসে বাস থেকে নেমে দেখলাম, চারিদিক সাদা বরফে ঢাকা।

নিরাপদ আশ্রয়ে

আজমল নামক এক মুজাহিদের নাম-ঠিকানা আমার জানা ছিল। একটা ট্যাক্সি নিয়ে তার বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। পথে ড্রাইভার কাশ্মিরী ভাষায় আমাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। আমি সবকিছু না বুঝেও তার কথায় হা না বলে আমার ব্যাপারে তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করি। মহল্লায় পৌঁছার পর সে আমার অস্ত্র দেখতে পেয়ে নীচে নেমে হেঁটে আমার কাছে এসে অনেক প্রশ্ন করতে থাকে। আমি নিজের ব্যাপারে সামান্য ধারণা দিয়ে তাকে বিদায় করে দেই।

বরফপাতের জন্যে রাস্তা জনমানবশূন্য। চারিদিক নীরব-নিস্তব্দ। আমি সড়কের কিনারা ধরে একা একা হাঁটছি। এর মধ্যে একটি ফৌজী জীপ আমার কাছে এসে থেমে যায়। তারা আমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করতে থাকে। আমি সে দিকে মোটেও ভ্রুক্ষেপ না করে পথ চলতে থাকি। কিছুক্ষণ পর জীপটি তাদের গন্তব্যে চলে যায়। এরপর আরও একটা জীপ এসে আমাকে দেখে চলে যায়।

কিছুক্ষণ পরে সাঁজোয়া গাড়ি আসার শব্দ পেলাম। সাঁজোয়া গাড়ি সম্পর্কে শুনা যায় যে, এরা বিনা প্ররোচনায় লোকের শরীরের উপর দিয়ে চালিয়ে যায়। আমি রাস্তা ছেড়ে কিনারায় নেমে পড়লাম। বরফ পড়ে আমার কোট, টুপি সব সাদা হয়ে গেছে। তাই তারা আর আমাকে দেখতে পেল না। গাড়ি চলে গেলে আমিও রাস্তায় উঠে আবার হাঁটা শুরু করলাম।

পথে কোন লোকজন নেই। কারো কাছে আজমলের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে না পেরে এক ঘরের দরজায় কড়া নাড়লাম। একটি বালিকা বের হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চান?'

আমি বললাম, আজমলকে, সে কি এ মহল্লায় থাকে?

আমি কাশ্মিরী ভাষা বলতে না পারায় মেয়েটি মনে মনে ভেবেছে, কোন পাহাড়ী এলাকা থেকে এসেছি। (কাশ্মীর উপত্যকার বাহিরের অধিবাসীরা কাশ্মিরী ভাষা জানে না। তাদেরকে পাহাড়ী বলা হয়) তাই সে আমাকে আপদ মনে করে বলল, 'এ পাড়ায় আজমল নামে কেউ থাকে না।' বলেই ঝট করে দরজাটা লাগিয়ে দিল।

আমি ভাবতে লাগলাম, এখন কার কাছে জিজ্ঞেস করব। সবার কাছে জিজ্ঞেস করাও নিরাপদ নয়। পঞ্চাশ গজ দূরে গিয়ে একটি দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে বরফ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করলাম। দেখলাম, ঐ বালিকাটি জানালা দিয়ে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছে। আমার অসহায়ত্ব দেখে তার দয়া হল। সে এবার জানালা দিয়ে আমাকে কাছে ডাকে।

কাছে আসলে জানতে চাইল, 'আপনি কোন্ আজমলকে খুঁজছেন? সে কী কাজ করে?'

আমি আজমলের কিছু বিবরণ দিতেই সে দরজা খুলে ঘরে বসতে দেয়। এবার তার বড় বোন ও মা এসে আমার পাশে বসে। এক বোন গরম অঙ্গার এনে আমার পাশে রাখে শরীর গরম করতে। ছোট বোন নুন চা এনে আমাকে পান করতে দেয়।

একটু গরম হওয়ার পর বৃদ্ধা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কেন আজমলের কাছে এসেছ?'

আমি বললাম, তার সাথে ব্যক্তিগত কাজ আছে। শুধুমাত্র তাকেই বলা যাবে

বৃদ্ধা বলল, 'সে এখানে নেই। ইণ্ডিয়া গেছে।'

আমি বললাম, তার ঘর পর্যন্ত আমাকে পৌঁছিয়ে দিন; আমি সেখানে থেকে তার অপেক্ষা করব।

তার এক বোন বলল, 'এটাই আজমলের ঘর। আর আমরা তার বোন। ইনি আমাদের মা।'

এদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার পর আমিও বললাম, 'আমি আফগানিস্তানের মুজাহিদ, পাকিস্তান থেকে এসেছি।'

একথা শুনতেই তারা তিনজন কেঁদে ফেলল। আজমলের বৃদ্ধা মা কান্না জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগল, 'আপনি মা-বাপ, ভাই-বোন ফেলে আমাদের সাহায্য

করতে এত দূরে এসেছেন? যতদিন আজমল না আসে ততদিন আপনি এখানে থাকবেন। আমরা যথাসাধ্য আপনার হেফাযতের ব্যবস্থা করবো।'

এক ট্রেনিং সেন্টার কেড়ে নিল হাজার সৈন্যের মনোবল

আমাদের আমীর সাহেব এসময় কাশ্মীরের বাইরে ভারতের অন্যত্র সফরে ছিল। আজমল তাঁর সফর সংগী। ফোনে তাঁরা আমার পৌঁছার খবর পেয়ে সফর সংক্ষিপ্ত করে শ্রীনগর ফিরে আসেন। আমরা এক গোপন স্থানে কেন্দ্র থেকে দেয়া প্রোগাম নিয়ে পরামর্শে বসি। তাতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, এখানে একটি পরিপূর্ণ ট্রেনিং সেন্টার খোলা হবে। সেখানে সকল সাথী একত্রিত হওয়ার পর পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

আফগানিস্তানের ট্রেনিং ক্যাম্পে অনেক কাশ্মিরী ট্রেনিং নিয়ে কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তারা ইতিমধ্যে বহু সফল অভিযানে অংশ নিয়েছে। তবে বিশেষ কারণে তারা তাদের সংগঠনের নাম প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে।

এবার নতুন সেন্টারে পুরাতন সাথীদের সঙ্গে নতুন সাথীদেরও আফগানী ক্যাম্পের নিয়ম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। একই নিয়ম ও পদ্ধতিতে ট্রেনিং চলছে। কখনো দৌড়-ঝাপ, কখনো অস্ত্রের ট্রেনিং, যুদ্ধের মহড়া। এরপর আল-কুরআন, ঈমান-আকীদা বিষয়ক দার্‌স। সাথে সাথে পাহারাদারী ও মরিচা খোদাইও করানো হচ্ছে।

ভোর রাতে সেজদায় পড়ে হৃদয়ের সমস্ত আঁকুতি দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করা একটা নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে। আমরা পূর্ণ অভিজ্ঞতার আলোকে সর্বপ্রথম ট্রেনিং সেন্টারের হেফাজতের ব্যবস্থা গ্রহণ করি এবং এক ডাকে সব মুজাহিদ কমাণ্ডারের কাছে সমবেত হওয়ার মহড়া দেই। চতুর্দিকে অনেক দূর পর্যন্ত মরিচা খোদাই করা হয়।

ট্রেনিং ক্যাম্পে যাওয়ার পথেই দু'ধারে ওয়ারলেসসহ কড়া পাহারা বসানো হয়। অল্প দিনের মধ্যেই ট্রেনিংয়ের কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। দেখতে না দেখতে সকল পুরাতন সাথী ট্রেনিং সেন্টারে পৌঁছে যায়।

আমাদের ট্রেনিংয়ের ধরন দেখে অন্যান্য মুজাহিদ গ্রুপও দলে দলে তাদের সাথীদের আমাদের কাছে পাঠাতে শুরু করে। মুজাহিদদের অধিকাংশ গ্রুপ থেকে আমাদের মারকাজের প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলার জন্য ভূয়সী প্রশংসাপত্র আসতে থাকে। মূলতঃ আমরাই সর্বপ্রথম কাশ্মীরে পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই।

ট্রেনিংয়ের প্রোগাম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছিল। এমন সময় পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে ক্রেক ডাউন হয়। এবার এ ক্রেক ডাউনে অংশ নেয় কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ। তারা গ্রামের এক ছেলেকে মারধর করলে সে তাদেরকে বলে দেয় যে, আমাদের এখানে কিছু আফগান মুজাহিদ ঘুরাফেরা করছে। তার কথামত একজন গুপ্তচরসহ রিজার্ভ পুলিশের সদস্যরা আমাদের ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হয়। তাদেরকে আমাদের ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হতে দেখে আমাদের পাহারাদার সাথী ওয়ারলেসের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ আমাদের নিকট সে খবর পৌঁছে দেয়।

এ খবর শুনে ক্যাম্পের মুজাহিদরা তো খুশীতে আটখানা। বহুদিন ধরে তারা এমনই একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। একে অন্যকে তারা মোবারকবাদ জানিয়ে বলে, 'ওদেরকে এমনই শিক্ষা দেয়া হবে যে, কাশ্মীরকে জবর দখলে রাখার কত মজা, বেটাদের তা আজ বুঝিয়ে দেব।'

একটি সম্মুখ লড়াইয়ের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতিসহ সবাই অপেক্ষা করছে। শিকার নিজে এসে ধরা দিচ্ছে বলে ব্যস্ততার সাথে সবাই মরিচা সামলানোসহ প্রতিরোধ ব্যবস্থা মজবুত করতে থাকে। স্থির হল, ক্যাম্পের মধ্যে ঢোকার পর ঘেরাও করে সবাইকে খতম করা হবে। কাউকে জিন্দা ফিরতে দেয়া হবে না।

এদিকে গ্রাম থেকে তারা এক মাইল অগ্রসর হওয়ার পর ভাড়াটে গুপ্তচর তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

তারা বলল, 'এখানকার আফগানী ক্যাম্পে আমরা হামলা করব।'

এ কথা শুনে সে বিস্ময়ের সাথে বলল, 'সে কি করে সম্ভব! আপনারা সংখ্যায় এত কম, আর আফগানীরা সংখ্যায় অনেক। উপরন্তু তাদের রয়েছে উন্নত প্রশিক্ষণ। তারা ক্যাম্পে সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র তাক করে রেখেছে। আমার মনে হয়, সেখানে গেলে কেউ জিন্দা ফিরে আসতে পারব না।'

রিজার্ভ পুলিশের এ গ্রুপ কাশ্মীরে নতুন এসেছে। তারা কিছু একটা করে নিজেদের বাহাদুরী জাহির করতে চায়। তারা বলল, 'কোন চিন্তা কর না, আমাদের সাথেও দেড় হাজার বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিপাহী আছে। তাছাড়া আফগানীরা অন্য দেশ থেকে এসেছে। মানসিকভাবে তারা বহু দুর্বল। এখানে তারা সাহস নিয়ে লড়াই করার সাহস পাবে কই?'

রিজার্ভ পুলিশ আরো অগ্রসর হলে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্যরা বিষয়টা জানতে পেরে গাড়ি নিয়ে সরাসরি তাদের সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। তারা বলে 'ক্রেক ডাউন শেষ হয়েছে, এখন ভালোয় ভালোয় ফিরে যান।'

তবুও তারা অগ্রসর হতে চাইলে সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্যরা বলে, 'এ ক্যাম্পে হামলা করতে হলে পাঁচ হাজার সৈন্যসহ আরও বহু আধুনিক অস্ত্রের দরকার।'

অগত্যা তারা ফিরে যায়। যাওয়ার পথে গ্রামবাসীদের বলে গেল; 'তোমরা আফগানীদেরকে অস্ত্র সমর্পণ করতে বল, অন্যথায় তাদের বাঁচার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।'

আমরা একথা জানতে পেরে জবাবী চিঠি লিখে চ্যালেঞ্জ জানালাম, 'আমরা দশদিন পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষায় থাকব। আমরা ঘাঁটি থেকে দশ মাইল পর্যন্ত বাইরে এসে তোমাদের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত। তোমরা যত সৈন্য ও মারণাস্ত্র নিয়ে আসতে পার আস।' এ পয়গাম দুশমনদের এত ভীত করে দিয়েছিল যে, দশদিন পর্যন্ত তারা এদিকে আর পা-ই বাড়ায়নি।

এদিকে আরেকটা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে যায়। ক্রেক ডাউন তুলে সৈন্যরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তখন পাঁচজন সশস্ত্র মুজাহিদ ওই রাস্তা দিয়ে ক্যাম্পের দিকে আসছিল। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে তারা রাস্তার পাশে লুকিয়ে থাকে। গাড়ি চলে যাওয়ার পর রাস্তার উপর উঠে তারা সামনে অগ্রসর হতে থাকে। 'সামনে চল' এই রণ সংগীত তারা কোরাসের সুরে গাইতে গাইতে রাস্তার উপর দিয়ে চলতে থাকে।

ওই গাড়ির পেছনে আরেকটি গাড়িতে দ্রুত গতিতে একশ চল্লিশজন সিপাহীর একটি পদাতিক দল ধেয়ে আসছিল। পাঁচজন মুজাহিদকে দেখে তারা রাস্তার দু'পাশে লুকিয়ে যায়। তাদের অতিক্রম করে পেছনে ফেলে আসার পর একজন মুজাহিদ প্রস্রাব করতে বসার আগে পেছনে তাকিয়ে দেখে, সৈন্যরা রাস্তার নীচে নেমে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সাথীদের ডাক দিয়ে এ খবর দিলে একজন মুজাহিদ অপেক্ষা না করে তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লে সাথে সাথে পাঁচজন সৈন্য মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বাকীরা হতাহতদের তুলে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

আমরা পরে গ্রামবাসীদের জিজ্ঞেস করেছি, আমাদের মাত্র পাঁচজন মুজাহিদকে দেখে তারা পালাল কেন? উত্তরে গ্রামবাসীরা জানায় যে, সৈন্যরা বলেছে, তাদের জন্যে পাঁচজন মুজাহিদের সাথে লড়াই করা কোন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তাদের ভয় হচ্ছিল, ফায়ারের আওয়াজ শুনে পার্শ্ববর্তী মুজাহিদ ক্যাম্প থেকে মুজাহিদরা সাঁড়াশী আক্রমণ করলে তখন তারা কেউই যে জীবিত ফিরে আসতে পারবে না! দ্বিতীয়তঃ তাদের অন্যসব গাড়ি আগে চলে গিয়েছিল। যুদ্ধে নাকি তাদের পরাজয় ছিল নিশ্চিত। তাই বৃহৎ কোন ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপর্যয়ের মোকাবেলার তুলনামূলক অল্প ক্ষতি বরণকে তারা মেনে নিয়েছে। পালিয়ে জীবন বাঁচাতে পারাটাও তাদের এক বিরাট বিজয়! উপরন্তু মজবুত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, পরীক্ষিত ও চৌকস আফগান মুজাহিদদের সাথে লড়াই করার হিম্মত তাদের নেই।

আমাদের আহবান অনুযায়ী ভারতীয় সেনাদের জন্যে বিশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। তাদের পক্ষ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে এমনকি তাদের এদিকে আসার কোন লক্ষণ না দেখে কৌশলগত কারণে আমরা আমাদের ট্রেনিং সেন্টার অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাই।

আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে আমি পূর্ণ আস্থার সাথে বলতে পারি, যদি সেদিন ভারতীয় রিজার্ভ পুলিশ আমাদের উপর হামলা করত, তবে তারা একজনও জিন্দা ফিরে যেতে পারত না।

নিয়মিত আক্রমণ শুরু

নতুন স্থানে ট্রেনিংসেন্টার স্থাপনের সাথে সাথে চারিদিক থেকে বিভিন্ন সংগঠনের মুজাহিদরা ট্রেনিং গ্রহণের জন্য এখানে আসতে শুরু করে। এখানে নানাবিধ ট্রেনিংয়ের সাথে সাথে দ্বীনি তালীমেরও ব্যবস্থা করা হয়। অন্যান্য সংগঠনের মুজাহিদরা আমাদের নিয়ম-পদ্ধতি ও ক্যাম্পের দ্বীনি পরিবেশ দেখে আগ্রহের সাথে আমাদের সংগঠনে যোগ দিতে এগিয়ে আসে। আমরা সব সংগঠনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে তাদেরকে নিজ নিজ দলে থেকে কাজ করার পরামর্শ দেই। এর ফলে সকল সংগঠনের কাছে আমরা পরম শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হই।

একবার আমাদের সেন্টারের দিকে একদল ইণ্ডিয়ান সৈন্য চুপে চুপে অগ্রসর হতে থাকলে 'আল ওমরে'র মুজাহিদরা তাদের দেখতে পায়। সৈন্যদের গতি দেখে তারা বুঝতে পারে, সৈন্যরা আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের খবর না দিয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পথে তাঁরা সৈন্যদের গতিরোধ করে। এ লড়াইয়ে 'আল ওমর' গ্রুপের চারজন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করে। চারজন মুজাহিদের তাজা রক্তের বিনিময়ে আমাদের ক্যাম্প রক্ষা পায়।

ট্রেনিং চলছিল। এক গ্রুপের শেষ হতেই নতুন গ্রুপের শুরু হয়। এভাবে বহু মুজাহিদ ক্যাম্পে জমা হয়। তাদের প্রাণের দাবী, আক্রমণ শুরু করা হোক।

আমরা শুরার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিলাম, এখন থেকে নিয়মিত আক্রমণ চালানো হবে। তবে আক্রমণের ধরন এমন হতে হবে, যাতে আমাদের প্রভাব শত্রুর প্রতি আরও বৃদ্ধি পায়। দুশমনের হৃদয় থেকে আমাদের প্রভাব যেন এতটুকু কমে না যায়।

সে সময় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে 'অপারেশন টাইগারে' শরীক সৈন্যদের প্রতি কেন্দ্রের নির্দেশ ছিল, 'যে মহল্লা থেকে তোমাদের প্রতি গুলী ছোড়া হবে, সে মহল্লা পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেবে।'

আমরাও ঠিক করলাম, কোন গ্রাম বা মহল্লা থেকে ওদের প্রতি আক্রমণ করব না; বরং খোলা ময়দানে আমরা ওদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হব।

ছুরাহ পুলিশ স্টেশনের উপর আক্রমণ

শ্রীনগরে ছুরাহ ইনস্টিটিউট নামক একটি বড় হাসপাতাল আছে। তার সম্মুখে রাস্তার অপর পার্শ্বেই এক বিরাট পুলিশ স্টেশন। পুলিশ স্টেশনে কাশ্মিরী পুলিশেরও একটি ক্যাম্প আছে। তাদের পাশেই ইণ্ডিয়ান সৈন্যরা এক শক্তিশালী পোস্ট স্থাপন করেছে। পোস্টে দেড়শ' ফৌজী থাকে।

এই পোস্টে আক্রমণের প্রোগাম অনুযায়ী আমরা দিনের বেলা সমগ্র এলাকা পরিদর্শন করে পজিশনের স্থান নির্বাচন করি। পোস্টের পশ্চিম পার্শ্বে ছুরাহ ইনস্টিটিউট। পোস্টের মাত্র দু'টি গেট। একটি ইনস্টিটিউটের গেটের সোজাসুজি মেইন রোডের অপর পার্শ্বে অপরটি তার উত্তরে। একটি গেট কাশ্মিরী পুলিশ ও অপরটি ইণ্ডিয়ান আর্মিরা ব্যবহার করে।

পোস্টের উত্তরে এলাহীবাগ মহল্লা ও আনছার ঝিল। এখান থেকে উত্তর দিকের সড়কটি সামনে গিয়ে দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। এর একটির নাম নওসাহারা রোড, যা আলমগিরী হয়ে ডাউন টাউনের দিকে চলে গেছে। এ মোড়ে আলমগিরীতে ইণ্ডিয়ান সৈন্যদের একটি শক্তিশালী পোস্ট রয়েছে। অপর শাখার নাম আলীজান রোড, যা গানাই মহল্লার পাশ দিয়ে চলে গেছে।

ছুরাহ ক্যাম্পের দক্ষিণ পার্শ্বেই বিদ্যুৎনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। এ ক্যাম্পের পূর্ব দিক বাদে বাকী তিন দিক উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। তিন দিকের দেয়ালে কোন দরজা নেই।

প্রতিদিন নিয়মিত রাত সাড়ে দশটায় ভিসানাগ মন্দির থেকে একটা জীপ ও সাঁজোয়া গাড়ি খাবার নিয়ে ক্যাম্পে ঢোকে। আমরা প্রথমে এই গাড়ি দু'টির উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। তারপর পরিস্থিতি বুঝে ক্যাম্পেও হামলা করা হবে।

আঠারোজন সাথীকে বাছাই করা হল। গাড়ি ভিসানাগ মন্দির থেকে বের হয়ে গানাই মহল্লার পাশের ছোট রাস্তায় উঠে মেইন রোডে আসে। ছোট রাস্তার মুখে মাইন স্থাপন করে মোর্চায় সাথীরা রকেটলাঞ্চার, অপর পার্শ্বে ক্লাসিনকোভ ও এলএমজি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

যদি গাড়ি মাইনে ধ্বংস না হয় কিংবা সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে রকেট লাঞ্চার থেকে তার উপর রকেট নিক্ষেপ করা হবে। যদি কোন সৈন্য নেমে পালাবার চেষ্টা করে, তাকে ক্লাসিনকোভের ফায়ারে ঝাঁঝরা করে দেয়া হবে।

আমরা মোর্চায় বসে শিকারের জন্যে অধীরচিত্তে অপেক্ষা করছি। রাত বারোটায়ও গাড়ি আসার কোন আলামত দেখা যাচ্ছে না। অগত্যা সাথীদের ডেকে জমা করে মাইন তুলে সরাসরি পোস্টের উপর হামলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

ক্যাম্পে রকেট দাগার জন্য সুবিধাজনক স্থান মাত্র দু'টি। আমরা প্রথমে দক্ষিণ দিক দিয়ে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের পাশ দিয়ে হামলা করার চেষ্টা করি। কিন্তু সমস্যা হল, যদি গোলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রের কোন খুঁটির উপর আঘাত হানে, তবে সমগ্র শহরের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ রচনায় এ অসুবিধা দেখা দেয়ায় আমরা ঘুরে মেইন রোডে এসে দেয়াল থেকে মাত্র ষাট মিটার দূরে দাঁড়িয়ে রকেট নিক্ষেপ করার প্রস্তুতি নেই।

ইতিপূর্বে ছুরার পোস্টে মুজাহিদরা অনেকবার হামলা করেছে। এ পর্যন্ত প্রায় দেড় শতাধিক রকেট এর উপর বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু হামলাগুলি হয়েছিল অনেক দূরে থেকে, যার ফলে রকেট হামলায় পোস্টের তেমন ক্ষতি হয়নি।

রকেট নিক্ষেপ করার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। বাকী সাথীরা তিন ভাগ হয়ে ক্লাসিনকোভ ও এলএমজি নিয়ে একশ' মিটার দূরে পজিশন নিয়ে বসে যায়।

সবাই মিলে আল্লাহ্‌র দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকি। দু'আ শেষে একটি রকেট পোস্টের দিকে ছুড়ে দিলাম। ক্যাম্পের একটি জানালা দিয়ে মৃদু আলো দেখা যাচ্ছিল। এ কামরায় একজন অফিসার ঘুমাত। আমার রকেটটি সোজা গিয়ে জানালায় আঘাত হানে। প্রচণ্ড আওয়াজে রকেটটি বিস্ফোরিত হয়। সাথে সাথে ঐ কামরা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হতে দেখা গেল। রকেটের ছোট ছোট টুকরা অন্যান্য কক্ষে ছড়িয়ে পড়ায় আরও কয়েকটি কক্ষে আগুন ধরে যায়। যদিও রকেটের সামান্য একটি গোলা ভিতরে আঘাত হেনেছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে তাতে ক্যাম্পের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

রকেট ফায়ারের পর পাঁচ মিনিট পর্যন্ত চারদিক ছিল নীরব, নিস্তব্ধ। এরপর অন্যদিকে আরও একটি রকেট ছুড়ে দিলাম। এবারের রকেটটি ছাদে আঘাত হানে এবং ছাদ উড়িয়ে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় রকেটটি বিস্ফোরিত হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য সাথীরা তাদের ক্লাসিনকোভ ও এলএমজি দ্বারা অবিরামভাবে গুলী চালাতে থাকে।

আমাদের ফায়ারের শব্দ শুনে ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য পোস্টের সৈন্যরা ফায়ার করতে থাকে। আমরা তাদের রেঞ্জের বাইরে থাকায় আমাদের কেউ হতাহত হয়নি। কিন্তু ছুরাহ পোস্ট থেকে কেউ একটি গোলাও নিক্ষেপ করল না দেখে বিস্মিত হলাম। আমাদের আক্রমণের ফলে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পাল্টা আক্রমণের সাহস সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে তারা।

এরপর আমরা মেইন রোডে একটি মাইন স্থাপন করে পাশের মরিচায় অপেক্ষা করতে থাকি। ধারণা করেছিলাম, আক্রমণের পর ছুরাহ ক্যাম্পের দিকে সাহায্যের জন্য চারদিক থেকে গাড়ী আসতে থাকবে। কিন্তু আধা ঘন্টা অপেক্ষার পরও এদিকে কোন গাড়ী আসতে না দেখে মাইন তুলে নিয়ে চলে যাই। এ হামলায় কতজন দুশমন হতাহত হয়েছে, তা আমরা সঠিকভাবে জানতে পারিনি।

কাশ্মীরের নিয়ম হল, কোন গ্রুপের হামলা করার পর তার বিবরণ নিজ দলের নামে পত্রিকা অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিতে হয়। আমরা হামলার পর কোন পত্রিকা অফিসে খবর দেইনি। উপরন্তু আমরা এলাকাবাসীকে বলে এসেছিলাম, তারা যেন আমাদের সংগঠনের নাম প্রকাশ না করে। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য বাস্তবে সফল করে দেখাতে চাই– কোন প্রচারণায় আমরা বিশ্বাসী নই।

সাংবাদিকরা আক্রমণকারীদের সনাক্ত করতে না পেরে নিজেরাই মহল্লায় এসে খোঁজ নিতে শুরু করে। পরদিন আস্‌সফা, আফতাব, শ্রীনগর টাইম্‌স ও চটান প্রভৃতি পত্রিকায় হেড লাইনে আমাদের হামলার খবর প্রকাশিত হয়। এসব পত্রিকার হেড লাইনে লেখা ছিল "হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর মুজাহিদদের আক্রমণে ছুরাহ পুলিশ স্টেশন সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত।" অন্যান্য পত্রিকায় শিরোনাম দেয়া হয়, "হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী ও সৈন্যদের মধ্যে শ্রীনগরে এক দীর্ঘ লড়াই" ইত্যাদি।

পরদিন ইণ্ডিয়ান সৈন্যরা পার্শ্ববর্তী মহল্লায় হানা দিয়ে বেশ কয়েকজন নিরীহ লোককে গ্রেফতার করে। মহল্লার মধ্য থেকে হামলা না করে মেইন রোড থেকে আক্রমণ করায় তাদেরকে সামান্য জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেয়া হয়।

তসবীহ হল জীবনের রক্ষাকবচ

আমি বিশেষ প্রোগ্রামে শ্রীনগর থেকে বাসে ইসলামাবাদ যাচ্ছিলাম। সাড়ে বারোটায় বাস শ্রীনগর থেকে ছাড়ে। আমি বাস ছাড়ার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ি। পৌনে একটায় আমার ঘুম ভাঙ্গলে দেখলাম, বাস একটি ভারতীয় সৈন্যদের চেকপোস্টে দাঁড়ানো। দু'তিনজন সৈন্য যাত্রীদের নীচে নেমে আসতে বলছে।

চোখ মুছে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। পিছনের এক সৈনিককে উদ্দেশ করে আগেরজন আমার দিকে ইশারা করে বলছে, 'এর উপর সন্দেহ হচ্ছে, খেয়াল রেখ।'

সে তার পরবর্তী সৈনিককে বলল, 'একে দুষ্কৃতিকারী বলে মনে হয়।'

গেটে দাঁড়ানো সিপাহী আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'কোথা থেকে এসেছ?'

বললাম, শ্রীনগর থেকে।

'কি কাজ কর?'

মসজিদের ইমামতী করি।

'ইমামতী আবার কি জিনিস?'

মানে– নামাজ পড়াই।

এভাবে প্রশ্নের ধারা চলতে থাকায় আমার ভয় হতে লাগল। কেননা সাধারণ ভারতীয় সৈন্যরা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না। তারা সামান্য সন্দেহের বশে আমাকে বন্দী করতে পারে। আমি এদের চেয়ে বরং অফিসারের মুখোমুখি হওয়া শ্রেয় মনে করলাম। তারা মোটামুটি শিক্ষিত হয় ও তাদেরকে দলীল-প্রমাণ দিয়ে বুঝানোও যায়। একজন সৈন্যকে বললাম, তোমাদের অফিসার কোথায়? তার কাছে আমাকে নিয়ে চল, তার কাছে সব বলব।' সৈন্যটি আমাকে কিছু দূরে বসা কর্নেলের কাছে নিয়ে যায়।

কর্নেল জিজ্ঞেস করল, 'কোথা থেকে এসেছ?'

'বললাম, শ্রীনগর থেকে।'

'কোথায় যাবে?'

'অনন্ত নগর।'

'কি কাজ কর?'

'ইমামতি।'

'ইমামতি কি জিনিস?'

'নামাজ পড়াই।'

'ও আচ্ছা, আল্লাহ্, আল্লাহ্ কর, না?'

পেছনে দাঁড়িয়ে এক ক্যাপ্টেন গভীরভাবে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। আমার পা কাঁপছে কিনা, কণ্ঠে জড়তা আছে কিনা কিংবা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে আমার চেহারা ফ্যাকাশে হচ্ছে কিনা এসব লক্ষ্য করছে সে।

এবার কর্নেল বলল, 'তোমার রাইফেলটি কোথায়? তোমাকে ভদ্র মানুষ বলে মনে হয়। অস্ত্র জমা দিলেই ছেড়ে দেব।'

আমি বললাম, কি যে বলেন স্যার, আমি অস্ত্র পাব কোথায়?

সে এবার ধমক দিয়ে বলল, 'আর ন্যাকামি করতে হবে না। জলদী বল, তোমার অস্ত্র কোথায়?'

আমি বললাম, স্যার, আপনারা ভারত থেকে এসে আমাদের দুষ্কৃতিকারী বলেন; অপর দিকে মুজাহিদরা আমাদের বলে ইণ্ডিয়ান এজেন্ট। কিছু দিন আগে মুজাহিদরা ইণ্ডিয়ান এজেন্ট বলে কয়েকজন আলেমকে হত্যা করে তাদের লাশ চৌরাস্তা ঝুলিয়ে রেখে চলে যায়। আপনিই বলুন, এটা আমাদের দেশ, এদেশ ছেড়ে আমরা যাব কোথায়?

কর্নেল বলল, 'তুমি কথায় বড় পাকা। কড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তুমি। বল, এমন কোন ব্যক্তি আছে কি, যে তোমার জামানত দিতে পারে?'

তখন আমি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম বললাম। এ রকম বিপদে কাজে লাগবে বলে তাদের নাম-ঠিকানা আগেই মুখস্থ করে রেখেছিলাম। এর মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তিও ছিল, যারা সরকারের নিকট খুবই বিশ্বস্ত। জিহাদের সাথে তাদের কোন যোগাযোগ নেই।

কর্নেল বলল, 'এরাও তো দুষ্কৃতিকারীদের সহযোগী।'

আমি বললাম, কি-যে বলেন স্যার, এরা দ্বীনদার লোক। ধর্মের কাজ করেন। না এদের দুষ্কৃতিকারীদের সাথে কোন যোগাযোগ আছে, আর না আমিও কোন দুষ্কতিকারী।

পয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত এভাবে কথাবার্তা চলতে থাকে। বাসের সবার তল্লাশী শেষ হয়েছে। তারা অধীর অপেক্ষা ও আশংকায় আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা জানত, আমি কাশ্মিরী নই। হয়ত পাকিস্তানী অথবা আফগানী হব। আমার সরল কথায় কর্নেল মোটামুটি আশ্বস্ত হয়; কিন্তু দেহ তল্লাশী তখনও বাকী।

আমার গায়ে কাশ্মিরী আলখেল্লা জড়ানো। হাত দু'টো আলখেল্লার পকেটের মধ্যে রেখে মৃদু নাড়াচ্ছি ও তার সাথে সাথে দৃঢ়ভাবে কর্নেলের কথার জবাব দিচ্ছি। যে ক্যাপ্টেন আমার সামনে ছিল, তার দৃষ্টি হাতের উপর পড়তেই বলল, 'স্যার, নিশ্চয় এর পকেটে গ্রেনেড আছে। এখন ধরা পড়ার সময় নিজেও মরবে এবং আমাদেরও মারবে। তাকে দু' কদম পিছিয়ে সরে দাঁড়াতে বলুন।'

কর্নেল আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল এবং জোরে কমাণ্ড দিল। বলল, 'দু' কদম হেঁটে হাত উপরে তোল।'

মনে মনে বললাম, এবার আর গ্রেফতারী থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পথ নেই। আল্লাহ্‌র কাছে মদদ চাইলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ্‌র দ্বীনের হেফাজতের জন্যে এসেছি, এর থেকেও বড় বড় বিপদে তিনি সাহায্য করেছেন। নিশ্চয়ই এবারও তিনি আমার থেকে বিমুখ হব না; যেভাবেই হোক আমাকে হেফাজত তিনি করবেন-ই।

দু'কদম পিছনে সরে হাত উপরে তুললাম। হাতে এক ছড়া তসবীহ ছিল, যা এবার আমার জন্যে আবে-হায়াৎ হয়ে জীবন-রক্ষকের ভূমিকা পালন করে। তসবীহ দেখতেই মোমের মত গলে যায় কর্নেল। সে এবার বিনয়ের সুরে বলে, 'ওঃ ভগবান, আমাকে ক্ষমা কর, আমরা এক বেগুনাহ আদমীকে খামাখা কষ্ট দিচ্ছি।'

সে গর্জে উঠে বলে, 'কে এই শরীফ ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে? যাও একে বাসের মধ্যে সসম্মানে বসিয়ে দিয়ে এস।'

আমার সাথে বাসে হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী কাশ্মীরের আমীর সাহেবও বসা ছিলেন। আমাকে এভাবে ফিরে আসতে দেখে তার খুশীর অন্ত ছিল না। তিনি মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

নতুন পরীক্ষা

বাস চলা শুরু করলে সকল যাত্রী আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে। কে এই লোক? এতক্ষণ কর্নেলের সাথে কথাবার্তা বলল, কর্নেল তাকে গালিও দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিপাহীরা এসে সসম্মানে বসিয়ে দিয়ে গেল! দেহ তল্লাশীও করল না। নিশ্চয়ই লোকটি কোন সরকারী এজেন্ট হবে। প্রথমে বুঝতে না পেরে কর্নেল তাকে গালি-গালাজ করেছে। পরে পরিচয় পাওয়ায় ছেড়ে দিয়েছে। হয়ত এদের মধ্যে কোন গোপন সংযোগ আছে!

বাসের সকলে আমাকে ভারতীয় গুপ্তচর মনে করে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগল। কে আমি? কোথা থেকে এসেছি? কর্নেলের সাথে এতক্ষণ কি কথা হয়েছে? ইত্যাদি হরেক রকমের প্রশ্ন।

আমি যতটা সম্ভব তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে, আমি কোন গুপ্তচর নই; আমাকে তারা মুজাহিদ বলে সন্দেহ করেছিল। অনেক ওজর আপত্তি করে গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হয়েছি।

তারা কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না। বাসে এর বেশী বলাও সম্ভব নয়। কেননা এখানেও কোন ভারতীয় গুপ্তচর থাকতে পারে। নামার সাথে সাথে তারা আমাকে ধরে ফেলবে। অপর দিকে আশ্বস্ত না করতে পারলে ইসলামাবাদ যাওয়াও নিরাপদ নয়। তারা কোন মুজাহিদ গ্রুপের কাছে ভারতীয় চর বলে আমাদেরকে ধরিয়ে দিতে পারে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলাম। দেখলাম, প্রতিটি যাত্রীই আমার ব্যাপারে আলোচনায় ব্যস্ত এবং সকলেরই মারমুখী মনোভাব। অগত্যা নিজের আসন ছেড়ে সবার সামনে এসে দাঁড়ালাম। হাত দু'টি দু' পকেটে ঢুকিয়ে গ্রেনেড দু'টি বের করে এনে তাদেরকে দেখিয়ে বললাম, এ দু'টি ছিল আমার পকেটে। যদি কর্নেলের সামনে আমার দেহ তল্লাশী হত, তবে আর বাঁচার উপায় ছিল না।

এবার সবার ভুল ভাঙ্গল। তারা নিজ নিজ মন্তব্যের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে লাগল। যে ব্যক্তি দু'টি গ্রেনেড পকেটে রেখে এভাবে পয়তাল্লিশ মিনিট কর্নেলের জেরার মোকাবেলা করতে পারে, তাদের দৃষ্টিতে সে অতি বড় মুজাহিদ বটে। বাস থেকে নামার সাথে সাথে তাঁরা আমাকে সাথে নিয়ে নিরাপদ এলাকায় পৌছিয়ে দেয়। তাদের ভালোবাসা ভোলার মত নয়।

একটি ঘরে নিয়ে বাসের যাত্রীরা গরম পানি দিয়ে আমার পা ধুইয়ে দেয়। আমি এক নওজোয়ান আর আমার পিতার বয়সী এক বৃদ্ধ পা ধুইয়ে দেয়ায় লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কোনক্রমেই এদেরকে বিরত রাখতে পারছিলাম না।

তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা কবে আসছেন?'

আমি জানালাম, আমাদের কমাণ্ডার শীঘ্রই এসে পৌঁছাবেন। তিনি আসলেই নিয়মিত লড়াই শুরু হবে।

সকলে তাদের নাম-ঠিকানা আমার ডাইরিতে লিখে দেন। যখনই ডাক আসবে হাজির হয়ে আমাদের কমাণ্ডে জিহাদ করবে বলে ওয়াদা করে তারা।

হৃদয়-বিদারক এক নির্যাতনের কাহিনী

মুহাররম মাসের দশ তারিখে আমি সোপুর গিয়েছিলাম। সেখানে একজন সাথী আমাকে নিকটবর্তী গ্রামের এক মুজাহিদের সাথে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ জানায়। সে গ্রামে গিয়ে এক মাদ্রাসায় উঠে ছাত্রদের মাধ্যমে তাঁর খবর নিলাম। তিনি আমাকে তাঁর ঘরে এসে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ জানান। এ মুজাহিদ মাত্র দশদিন আগে জম্মু জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন।

ঘরের দরজায় কড়া নাড়তেই তের-চৌদ্দ বছরের এক কিশোরী দরজা খুলে দেয়। আমি মুজাহিদ সাথীর কথা জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটি কাঁদতে শুরু করে। দরজার দুই পাশে দুই হাত রেখে প্রবেশ পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে সে। আমি বার বার তার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করেও কোন উত্তর না পেয়ে ফিরে আসার জন্যে রাস্তায় বের হই। তখন সে পেছন থেকে ভাঙ্গা উর্দূতে আমাকে ডাকতে থাকে। কাছে আসলে সে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কোথা থেকে এসেছেন? তাঁর সাথে কেন দেখা করতে চান?'

বললাম, আমি শ্রীনগর থেকে এসেছি। তাঁর সাথে বিশেষ কথা আছে।

এবার সে আমার উর্দূ ভাষা ও কথার ভঙ্গীতে আন্দাজ করে, নিশ্চয়ই আমি কোন মুজাহিদ হব এবং আমি দূর থেকে এসেছি। ফলে সে দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে একটি কামরার দিকে হাত দ্বারা ইশারা করে।

এ কামরার মধ্যে সেই মহান মুজাহিদ বসে আছেন। আমাকে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে মোসাফাহা করলেন। অতঃপর আমার আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে আমার সংগঠনের পরিচয়সহ কাশ্মীরে আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করি। তাঁর সাথে জিহাদ ও দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়। এরপর তাঁকে আমি আমাদের সংগঠনে যোগ দেয়ার জন্যে আহবান জানাই।

এর জবাবে তিনি বলেন, 'দেখ আমজাদ! আমার অনেক সমস্যা। আপাততঃ তোমাদের সাথে যোগ দিতে পারছি না। গ্রামের যে মাদ্রাসাটি দেখেছ, সেটি

আমার এক বন্ধু চালাতেন। জিহাদেও তিনি শরীক হতেন। আমি ছাড়া পাওয়ার দু' মাস আগে ভারতীয় সৈন্যরা তাঁর দু'পা কেটে দিয়েছে। জেল থেকে বের হওয়ার পর তিনি আমাকে মাদ্রাসা পরিচালনার জিম্মাদারী ন্যস্ত করেন। এ মাদ্রাসা থেকে এ পর্যন্ত অনেক হাফেজ ফারেগ হয়েছে। অনেকে এখনও পড়ছে। অতএব দ্বীনের স্বার্থে আমাকে এ মাদ্রাসা চালাতেই হচ্ছে। আর দ্বিতীয় কারণ যদি শোনার ধৈর্য রাখ, তবে বলব।'

আমি আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি বলা শুরু করেন এবং সাথে সাথে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি কেন কাঁদছেন আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। জেল, নির্যাতন, সাথীর হাত-পা কর্তনের খবর কিংবা ইন্টারোগেশন সেন্টারে চরম নির্যাতনের মুখে দিনের পর দিন অবস্থান এসব তো কাশ্মিরীদের কাছে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এতে একজন অকুতোভয় মুজাহিদের ঘাবড়ে যাওয়ার কথা নয়। উপরন্তু তিনি একজন আলেম এবং কাশ্মিরে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। তা সত্ত্বেও মাদ্রাসা পরিচালনা করার অজুহাতে কিভাবে জিহাদ পরিত্যাগ করতে পারেন এ বিষয়টিও আমাকে ভাবিয়ে তুলল।

তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে শুরু করেন, 'ভাই আমজাদ! গত বছর আমাকে এক সাথীর সাথে একত্রে গ্রেফতার করে বারমুলার এক ইন্টারোগেশন সেন্টারে (নির্যাতন কেন্দ্রে) নিয়ে যাওয়া হয়। একদিন ও একরাত চরম নির্যাতনের পর আমাকে এক কর্নেলের সামনে হাজির করা হয়। কর্নেল আমাকে উদ্দেশ করে বলে, 'তোমাকে তো দেখতে ভালো মানুষ বলে মনে হয়; একটা শর্ত পূর্ণ করলেই তোমাদেরকে ছেড়ে দেব।'

আমি বললাম, স্যার, কি সে শর্তটি?

কর্নেল কুটিল হেসে বলল, 'তোমার একটি মেয়েকে এক রাতের জন্যে আমার খেদমতে পাঠিয়ে দেবে।'

তার জানোয়ারের মত চেহারার দিকে তাকিয়ে আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। শরীরের সমস্ত শক্তি দ্বারা সজোরে তার গালে একটা চড় কষে দিলাম। জানোয়ারটা ঘুরে পড়ে গেল। উঠে বিড়ু বিড়ু করতে লাগল, 'দেখাচ্ছি তোমাকে মজা, বুঝবে এবার কোন্ ভীমরুলের বাসায় ঢিল ছুড়েছ।'

বলতে না বলতে সাত-আটজন সিপাহী আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাইফেলের বাটের আঘাত, কিল-ঘুষি আর বুটের লাথিতে আমার দেহ থেতলে যায়। এ সময় জীপের স্ট্রাট নেয়ার শব্দ শুনতে পাই।

এক ঘন্টার মধ্যে ওরা আমার বড় মেয়েকে ধরে নিয়ে আসে। আমাকে একটি খুঁটির সাথে বেধে রাখে ওরা। এরপর চোখের সামনে যা ঘটেছে একজন

পিতার পক্ষে মেয়ে সম্পর্কে তা বলা যায় না। আমি চীৎকার করে অনুনয়-বিনয় করতে থাকি। কিন্তু কিছুতেই পশুদের মনে দয়ার উদয় হল না।

এখানেই শেষ নয়। এরপর ওরা আমার মেঝ মেয়েকে নিয়ে আসে। তার সাথেও সেই একই আচরণ করে। এ কিয়ামত সমান দৃশ্য দেখে আমার হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। চোখে আগুন ঝলসাতে থাকে। মনে হচ্ছিল, আমি এখনই মরে যাব।

এরপর ওরা আমার দুই নাবালেগা হাফেজা মেয়েকেও হাজির করে। এবার আর স্থির থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। চীৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাই। তখন আমার বড় মেয়েকে ওরা বেয়নেট মেরে শহীদ করে। বাকীদের গাড়ীতে করে গ্রামে ফেরত পাঠায়। জালেম সৈন্যরা আমার ঘর জ্বালিয়ে দেয় আর আমাকে জম্মুর হেরা নগর জেলে পাঠিয়ে দেয়।

আমার মেঝ মেয়েটি ছিল বিবাহিতা; দু' সন্তানের মা। এ ঘটনার পর সন্তান রেখে তার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয়। এ শোকে আমার স্ত্রী পাগল হয়ে গেছে। মেয়েরা এক বছর ধরে এই পোড়া ঘরে জীবন-মরণের সাথে পাঞ্জা লড়ছে। এক বছর পর্যন্ত তারা লজ্জায় ঘর থেকে বের হয়নি। আর হবেই বা কিভাবে? বাপ বন্দী, মা পাগল; ইজ্জত লুণ্ঠিত। বল আমজাদ ভাই, বল! আমরা কোথায় যাব? কি করব? আমাদেরকে এ দেশ থেকে কোথাও বাইরে নিয়ে যাও। এখানে থাকা আমাদের আর শোভা পায় না।

ভাই, যদি তুমি আর এক বছর আগে আসতে, তবে হয়তো আমাদের ইজ্জত বাঁচত। আমজাদ, তুমি অনেক দেরী করে ফেলেছ। আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমাদের চীৎকার কি দুনিয়ার মুসলমানদের কানে পৌঁছে না? কেন তারা আমাদের সাহায্যে জন্য এগিয়ে আসছে না? আমরা কি মুসলমান নই? এক মুসলমান বোনের ইজ্জত রক্ষা করতে মুহাম্মদ বিন কাসিম ছুটে এসেছিলেন সিন্ধুতে। আর এত কাছে থেকেও তোমরা তোমাদের কাশ্মিরী বোনদের আর্তচীৎকারের কানফাটা আওয়াজও শুনতে পাও না? ঝিলাম নদী বয়ে যে হাজার হাজার মা-বোনের লাশ তোমাদের চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেছে, তা দেখেও কি তোমাদের ঈমান স্ফুলিংগের মত জ্বলে উঠে না?

যদি এত কিছুর পরও তোমাদের চেতনা না আসে, তবে মনে রেখ, আমরা মরতে থাকব। দ্বীনের হেফাজতের জন্যে সর্ব প্রকারের কুরবানী দিয়ে যাব। তবুও এক কাশ্মিরী জিন্দা থাকতে কাফিরের আনুগত্য স্বীকার করব না। তাতে দুনিয়ার মুসলিম আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুক আর না আসুক। তুমি দুনিয়ার মুসলমানদের কাছে আমাদের পয়গাম পৌঁছে দিও। শুধু এক ভাই নয়, হাজার

ভাই হাজার বোন তাদের পথ পানে চেয়ে আছে। দয়া করে জলদী এস, ধৈর্য বাঁধ মানছে না আর।'

তাঁর এ হৃদয়-বিদারক জীবন কাহিনী শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। অসুস্থ হয়ে বিছানার উপর ছট্‌ফট্‌ করছিলাম। সতেরো দিন পর সেই মুজাহিদের এক মেয়ে একখানা কাগজে আমার নিকট লিখে পাঠায়, 'আমজাদ! এক ভাইয়ের কাহিনী শুনেই নির্জীবের মত বিছানায় পড়ে গেলে? এখানের হাজারো ভাই-বোনের জিন্দেগী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শুয়ে থাকার সময় নেই। ওঠ, তোমাকে শত শত বোনের ইজ্জতের হেফাজত করতে হবে।' এই চিঠি পড়ে আমার শরীরের জ্বর-তাপ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তখনই মেয়ের পিতাকে সঙ্গে নিয়ে জিহাদের জন্যে শ্রীনগর চলে আসি।

পাঠকদের নিকট আমার নিবেদন, কারো ইজ্জতহানির কাহিনী বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয় বরং আপনাদের ভাবতে বলছি, যদি এরূপ অবস্থার শিকার আপনারা হন, তখন কি করবেন? সে সময় কি করণীয় হবে আপনাদের? একটু ভেবে দেখুন। আজ কাশ্মিরী ভাই-বোনদের বেলায় যা ঘটছে, আপনাদের সাথে তেমন হবে না– এর কি কোন নিশ্চয়তা আছে? এর জন্য আমরা কী প্রস্তুতি নিচ্ছি? আল্লাহ্‌ আমাদের সহায় হোন, নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াবার তৌফিক দান করুন।

প্রাণে বেঁচে গেল আরশাদ আলী

মুজাহিদ আরশাদ আলী প্রশিক্ষণ নেয়ার পর সশস্ত্র অবস্থায় ইসলামাবাদ পৌছে। সেখানে এক বন্ধুর কাছে অস্ত্র রেখে পায়ে হেঁটে নিজ গ্রাম পালাহ বটগ্রামের দিকে যাচ্ছিল। শোরিয়ারের বিরাট রাস্তা পার হওয়ার সময় হঠাৎ দু'টি ফৌজী জীপ এসে তার সামনে দাঁড়ায়।

আরশাদ ভাবল, দৌড়ে পালাতে চাইলে নির্ঘাত গুলী খেতে হবে। জীপের সামনের সিটে বসা এক অফিসার তাকে লক্ষ্য করে গর্জে উঠে, 'এদিকে আয়, কি নাম তোর?'

'আরশাদ আলী।'

'বাড়ি কোথায়?'

'পালাহ বটগ্রাম।'

অফিসার এক সিপাইকে ডেকে তাকে তল্লাশী নিতে বলে। তল্লাশীতে আপত্তিকর কিছু না পাওয়া সত্ত্বেও অফিসার তাকে কান ধরে মাথা নিচু করে দাঁড়াতে বলে। এবার আরশাদ বুকে সাহস নিয়ে বলে, আমি কি অন্যায় করেছি স্যার, আমাকে কেন শাস্তি দিচ্ছেন?

অফিসার বলল, 'তোমার কার্ড দেখাও?'

'আমি ট্রেনিং নিয়ে সবে মাত্র এসেছি, কার্ড এখনও তৈরী হয়নি।'

'হারামজাদা, এক ঘুষিতে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব। গাধা কোথাকার! কার কাছে কি বলছিস! ভাগ এখান থেকে, পিছনে তাকালেই গুলী করব।'

আরশাদ পরে জানায়, 'আমি নিশ্চিত মনে করেছিলাম, আমাকে সামনের দিকে দৌড়াতে বলে সে পেছন থেকে গুলী করবে। মৃত্যুর জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হলাম। তবুও সামান্য আশা বুকে বেঁধে দ্রুত এলোমেলো দৌড়াতে লাগলাম। কিন্তু পেছন থেকে কোন গুলী এসে আমার শরীরে বিঁধল না। অথচ পেছনের জীপে একজন হিন্দু সিআরপি অফিসার বসা ছিল।

মাইছামার বীরাঙ্গনা

সোপুর থেকে এসে শ্রীনগরের লালচকের নিকট 'মাইছামা' নামক এলাকার এক ঘরে অবস্থান নিলাম। এ মহল্লায় 'ইখওয়ানুল মুজাহিদীন'-এর এক সাথী ট্রেনিং নিয়ে সবে মাত্র বাড়ি এসেছে। দশ-বার দিন এদিক-ওদিক কাটিয়ে প্রথমে যে দিন নিজ ঘরে আসে, সে দিনই গুপ্তচররা তার আগমনের খবর ইন্ডিয়ান সৈন্যদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।

আমাদের অবস্থান থেকে পাঁচ-ছ'টি ঘরের পর তার ঘর। গুপ্তচরের সংবাদ অনুযায়ী অতি ভোরে সৈন্যরা এসে তার বাড়ির গলির মুখে অবস্থান নেয়। রাতের আঁধার কেটে পূর্ব আকাশ ফর্সা হওয়ার সাথে সাথে তারা মুজাহিদের ঘর ঘিরে ফেলে। সৈন্যরা ঘরের মধ্যে না ঢুকে বাইরে দাঁড়িয়ে মুজাহিদের নাম ধরে ডাকতে থাকে।

সাধারণতঃ ভারতীয় সৈন্যরা কাশ্মীরীদের কোন রকম অবগতি করানো ছাড়াই তাদের ঘরে প্রবেশ করে। কিন্তু এখানে বিপদের আশংকা থাকায় বাইরে দাঁড়িয়ে তারা তাকে ডাকতে থাকে।

অভাবিত বিপদে পড়ে নবীন মুজাহিদ ঘাবড়ে যায়। পালাবারও কোন পথ পাচ্ছে না। আর নিজ ঘরে বসে ওদের মোকাবেলা করার অর্থ ভাইবোন সবাইকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা। কোন উপায় না দেখে সে ঘরের মধ্যে তড়পাতে থাকে। পাঁচ-ছ'জন সৈন্য এক সুযোগে ঘরে ঢুকে পড়ে। ঘরে প্রবেশ করে সৈন্যরা প্রথমে মুজাহিদ ও তার সাত বছর বয়সী ছোট ভাইকে শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে।

এরপর তার দুই যুবতী বোনের উপর ওরা হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানব সভ্যতার কলংক হিংস্র ভারতীয় সৈন্যদের উপর্যুপরি ধর্ষণের ফলে ঘটনাস্থলেই দু' বোন মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। হিংস্র হায়েনাদের তাতেও তৃপ্তি হল না। ওরা রশি দিয়ে বাঁধা ভাইদের সামনে মৃত বোন দু'টির হাত-পা কেটে রাস্তায় নিক্ষেপ করতে থাকে। তাদের এ বীভৎস নির্মম অত্যাচার দেখে অসহায় দু' ভাই

চীৎকার দিয়ে বলতে থাকে, 'ভাইয়েরা আমার! আমাদের বাঁচাও! সৈন্যরা আমার বোনদের কেটে টুকর টুকর করছে, তোমরা কেন এগিয়ে আসছ না? কোথায় আমার ভাইয়েরা, আমাদের বাঁচাও!'

আমি অনেকক্ষণ ধরে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে তাদের করুণ চীৎকার শুনছিলাম। তাদের প্রতিটি আহবানে আমার শরীর শিউরে উঠছিল। সাধারণতঃ শ্রীনগরের কোন ঘরে সৈন্যরা প্রবেশ করে অত্যাচার করলেও অন্য ঘর থেকে তাদের উপর হামলা করা হয় না। কারণ, সৈন্যরা সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আসে। অপ্রস্তুত মুজাহিদরা তাদের উপর গুলী ছুড়লে পাল্টা আক্রমণের মোকাবেলা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তার উপর যে ঘর থেকে হামলা করা হয়, সে ঘর ধূলিস্মাৎ করে দেয়া হয়।

আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলাম, কি করা যায়? ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলাম। এবার ওরা শক্ত রশি দিয়ে হাত-পা বাঁধা দু' ভাইকে রাস্তার উপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে। এ অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তারা দু' ভাই সে অবস্থায় চীৎকার করে বলছিল, 'কোথায় লুকিয়ে আছ তোমরা! ওরা আমার দু' বোনকে শহীদ করেছে। আমাদেরকেও হত্যা করতে নিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর দোহাই, তোমরা এগিয়ে এস! আমাদেরকে বাঁচাও। আমার মাসুম ভাইকে বাঁচাও।'

দু' বোনের কর্তিত ও ক্ষত-বিক্ষত উলঙ্গ লাশের দৃশ্য ও মুজাহিদ ভাইয়ের আকাশ ফাটানো চীৎকার শুনে আর স্থির থাকতে পারলাম না। পরিণতির কথা মুহূর্তে ভুলে গিয়ে রাইফেল তাক করে এক ব্রাশ ফায়ারে চারজন সৈন্যকে জাহান্নামে পাঠালাম। অবস্থা বেগতিক দেখে বাকী সৈন্যরা প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালাল। অবলা নারীদের উপর অত্যাচারে সিদ্ধ সশস্ত্র কাপুরুষরা অস্ত্র তুলে নেয়ারও হিম্মত করল না।

রশি বাঁধা সে মুজাহিদ ওই দিনের লোমহর্ষক অত্যাচারের পর পাগল হয়ে যায়। এখন সে অলি-গলিতে ঘুরে আর চীৎকার দিয়ে বলতে থাকে, 'ওরা আমার বোনদের হত্যা করেছে। আমার বোনদের অংগসমূহ কেটে টুকরো টুকরো করে রাস্তায় নিক্ষেপ করেছে। এখনও তোমরা বসে আছ? আমাকে বাঁচাও! আমার ভাইকে বাঁচাও!' ইত্যাদি বলে চীৎকার করে বেড়াচ্ছে।

মাইছামার অধিবাসীরা সমগ্র কাশ্মীর অধিবাসীর আযাদীর রাহবার। কাশ্মীর আজাদীর জিহাদ শুরু হয়েছে এখান থেকেই। এ এলাকার নওজোয়ানরা সাহস, কৌশল ও বাহাদুরীতে সবার সেরা। এখানে যারা বাস করে, তারা আফগানীদের বংশধর। যুগ যুগ ধরে নাতিশীতোষ্ণ কাশ্মীরে বসবাস করলেও তাদের তেজ, স্বভাব ও হিম্মত সামান্যও হ্রাস পায়নি।

এখানকার মহিলারা পর্দানশীল। তাঁরা বোরকা পরিধান করে। কিন্তু এতই সাহসী যে, রান্না ঘরের দা-বটি নিয়ে ভারতীয় সৈন্যদের মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। একবার এরা দা-বটি হাতে মাঠে নেমে আসলে এক মজার দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় সৈন্যরা তাঁদের দেখে পালাতে শুরু করে আর তাদের পেছনে পেছনে দা-বটি নিয়ে ইসলামের বীরাঙ্গনারা ধেয়ে যায়। জরুরী অবস্থার সময় এদের দেখাদেখি অন্যান্য মহল্লার মহিলারাও কারফিউ ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে আসে। এসব অবস্থায় দেখামাত্র গুলীর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কারফিউর সময় শ্রীনগর কোলাহলপূর্ণ জনপদে পরিণত হয়; কারফিউ চলছে কিনা তা মালুম করা যায় না।

এ সাহসী মহিলাদের নজীর বর্তমান দুনিয়ায় নিতান্তই বিরল। কাশ্মিরীদের পরম বিশ্বাস, যতদিন মাইছামার বীর প্রসবিনী সাহসী নারীরা স্তব্ধ না হবে, ততদিন আজাদীর এ উত্তাল জোয়ার কেউ রুখতে পারবে না, কেউ টলাতে পারবে তাদের ইস্পাতকঠিন স্বাধীনতার শপথ।

এ ঘটনার পর আর 'মাইছামা' থাকা নিরাপদ নয় ভেবে আমি অন্য এলাকায় চলে আসি।

ঝিলামের পাড়ে ভারতীয় পোস্টের উপর আক্রমণ

শহরের মধ্যস্থলে ঝিলামের পাড়ে ভারতীয় সৈন্যদের পাহারা পোস্ট। এ পোস্টে রাত্রে ত্রিশজন সৈন্য পাহারা দেয়। এরা প্রায়ই বিনা কারণে সাধারণ লোকদের উপর নিপীড়ন চালাত। সেখান থেকে যে সব বৃদ্ধ ও শিশু যাতায়াত করত, বিনা উস্কানিতে তারা তাদের কান মোচড়াত। বাজার থেকে আনা তাদের সওদাপাতী ছিনিয়ে নিত। আর নওজোয়ানদের তীব্র স্রোতস্বিনী নদীর কিনারায় নিয়ে লাথি মেরে নীচে ফেলে দিত।

তাদের এ অমানুষিক আচরণের ফলে বেশ কয়েকজন নিরীহ লোক পানিতে ডুবে মারা গেছে। এ পথে যাতায়াতকারী মহিলাদের তারা তল্লাশীর নামে বে-আবরু করে থাকে। মোটকথা এ বেহায়া অমানুষরা স্থানীয় লোকদের হয়রানী করার কোন সুযোগ হাতছাড়া করত না।

এদের এহেন কার্যকলাপে ধৈর্যহারা হয়ে আমরা ক'জন সিদ্ধান্ত নিলাম, যেভাবে এরা লোকদের নির্দয়ভাবে নদীতে ডুবিয়ে মারছে, আমরাও ওদের পুরো পোস্ট সেভাবেই উল্টিয়ে নদীতে ফেলব। সর্বমোট আঠারোজন মুজাহিদ এ আক্রমণের প্রস্তুতি নিলাম। দু' ভাগ করে প্রথম আটজনকে গলির মুখে পাঠানো হল, যেন ওদের সাহায্যকারী সৈন্যরা এসে আমাদের ঘিরে ফেলতে না পারে।

কথা ছিল অতি ভোরে আমরা দু'টি লাঞ্চার দিয়ে পোস্টের উপর রকেট ছুড়ব। রকেটের হামলা হলে ওরা আমাদের মোকাবেলায় ব্যস্ত থাকবে। এ ফাঁকে

অপর পাশ দিয়ে তিনজন সাহসী মুজাহিদ শক্তিশালী বোমা নিয়ে পোস্টে ঢুকে সাথে সাথে বিস্ফোরণ ঘটাবে।

এ কাজ ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যারা বোমা ফাটানোর দায়িত্ব পালন করবে, তাদের পক্ষে অক্ষত বেঁচে যাওয়া অসম্ভব হবে। কিন্তু এছাড়া পোস্ট ধ্বংসের অন্য কোন সহজ পদ্ধতি আমাদের পরিকল্পনায় ছিল না।

আমরা রকেট ফায়ার করার জন্যে আগের রাতে যে স্থান নির্বাচন করেছিলাম, সকালে গিয়ে দেখি, সৈন্যরা সেদিকে চাদরের মত লম্বা চেপ্টা লোহার পাত টানিয়ে পোস্টকে আড়াল করে রেখেছে। স্থানীয় লোকদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম, সৈন্যরা আমাদের গতিবিধি টের পেয়েছে। অতএব উপস্থিতভাবে আগের পরিকল্পনা পাল্টিয়ে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। এ পাশ থেকে লোহার পাতের ফাঁক গলিয়ে রকেট ছুড়লে তা তেমন কার্যকরী হবে না। এ কারণে অপর পাশ দিয়ে একযোগে রকেট ও ক্লাসিনকোভ দ্বারা হামলা শুরু করলাম।

সৈন্যরা পূর্বেই প্রস্তুত ছিল। গোলা-গুলী শুরু হলে পোস্টের সাহায্যের জন্যে প্রধান ক্যাম্প থেকে চারটি সাঁজোয়া গাড়ী পোস্টের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এক সাথে দু' দিকের মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এদিকে রকেটের গোলাও ছিল সীমিত। সর্বশেষ গোলাটি সাঁজোয়া গাড়ির উপর ছুড়ে এলএমজির ফায়ার করতে করতে আমরা নিরাপদ স্থানে সরে গেলাম।

পরদিন সরকারী প্রেসনোটে সাতজন সৈন্য নিহত ও দশজন আহত হয় বলে উল্লেখ করা হয়। নদীর কিনারার মরিচা থেকে যে সৈন্যরা আমাদের মোকাবেলা করছিল, তারা গুলী খেয়ে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে নদীতে পড়ে ডুবে মারা যায়।

এ ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনে কোন মুজাহিদ হতাহত হওয়া ছাড়া আল্লাহ্ আমাদের মনের ইচ্ছে পূর্ণ করেন। নদীতে ফেলে ডুবিয়ে মারার কৌতুকের শাস্তি কত ভয়াবহ ও করুণ, তা এ পোস্টের সৈন্যরা হাড়ে হাড়ে টের পেল।

মজার এক আলাপ

অক্টোবরের শেষের দিকে আমাদের দু'জন মুজাহিদ ঝিলাম নদীর তীর দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের একজন অন্যজনকে বলল, 'চল গোসল করে আসি'।

তারা কাপড়ের নীচে পিস্তল ঢেকে রেখে নদীতে গোসল করতে নামে। এর মধ্যেই দু'জন ইণ্ডিয়ান সৈন্য পানি তুলে নেয়ার জন্য নদীর কিনারে আসে। তাদের একজনের কাছে একটা বালতি আর দ্বিতীয়জন একটা রাইফেল হাতে তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

মুজাহিদদ্বয় গোসলে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ কিনারায় তাকিয়ে দেখে, একজন সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। একজন মুজাহিদ বুদ্ধি খাটিয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, 'স্যার কেমন আছেন?'

সামান্য এক সিপাইকে 'স্যার' বলায় তারা তো খুশীতে বাগ বাগ। ওরা বলল, 'তোমরা কারা? কোথা থেকে এসেছ?'

তারা বলল, 'স্যার আমরা ঐ গ্রামের লোক, ক্ষেত-খামারে কাজ করি।'

একজন সৈন্য বলল, 'তোমাদের গ্রামে তো কোন দুষ্কৃতিকারী নেই?' মুজাহিদ জবাবে বলল, 'কি যে বলেন স্যার, আপনারা এখানে থাকতে কোন সাহসে ওরা এদিকে আসবে?'

এবার সৈন্যটি ভরসা পেয়ে এক মুজাহিদের সাথে আলাপ জুড়ে দেয়। অপর সিপাহী পানি তোলার জন্যে বালতি নিয়ে নদীতে নেমে পড়ে। অপর মুজাহিদ নদী থেকে উঠে খুব সতর্কতার সাথে কাপড় পরার ভান করে পিস্তল তুলে সৈন্যটিকে লক্ষ্য করে এক গুলী ছুড়ে দেয়। গুলী খেয়ে সৈন্যটি ঘুরতে ঘুরতে নদীতে পড়ে যায়। তার রাইফেলটি নদীর কিনারায় পড়ে থাকে। মুজাহিদদের হাতে বেশী সময় ছিল না বলে রাইফেলটি তুলে এক গুলীতে অপর সৈন্যটিকে মেরে ঝিলামে ভাসিয়ে দ্রুত অন্যত্র চলে যায়।

রক্তের আখরে উদ্‌যাপিত স্বাধীনতা দিবস

ভারতের স্বাধীনতা দিবস ১৫ই আগস্ট। ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে সেদিন উদ্‌যাপিত হয় 'কালো দিবস'। চোখে পড়ে সর্বত্র কালো পতাকা। লোকজন কালো পোশাক পরে রাস্তায় নামে। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সরকারী অনুষ্ঠান ছাড়া কোন আনন্দ-উৎসব কাশ্মীরে পালিত হয় না। ১৫ই আগস্টের পরিবর্তে কাশ্মিরী জনসাধারণ ১৪ই আগস্ট স্বাধীনতা উৎসব পালন করে। ১৪ই আগস্ট সকাল থেকেই আনন্দ-উৎসব শুরু হয়। যুবক-বৃদ্ধ-কিশোররা জাতীয় পতাকা বুকে জড়িয়ে রাস্তায় নামে। প্রতিটি ঘরে আযাদীর প্রতীক চাঁদ– তারা খচিত সবুজ ঝান্ডা শোভা পায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সবুজ ব্যানারে স্বাধীনতার দাবী ও ভারতের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও শাহাদাতের অমর বাণী লিখে টানানো হয়।

এ বছরও প্রতি বছরের ন্যায় অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে ১৪ই আগস্ট পালন করা হয়। প্রতিটি ঘরে সবুজ ঝান্ডা উড়ানো হয়। প্রত্যেক মোড়ে সবুজ ব্যানার শোভা পায়। তাতে ভারত বিরোধী নানা শ্লোগান লেখা থাকে।

আমি একটি দোতলা বাড়ীর জানালা দিয়ে এ দৃশ্য দেখছিলাম। আমাদের ঘর থেকে পনের ষোলটা ঘর পরে একটা ব্যানার টানানো ছিল। তাতে ভারতের বিরুদ্ধে দু'টি শ্লোগান লেখা ছিল। ব্যানারের এক পাশের রশি ছিড়ে ব্যানারটি রাস্তার উপর ঝুলছিল।

ইসহাক নামের একজন মুজাহিদ সেটাকে উপরে তুলে পুনরায় বাঁধতে শুরু করে। এমন সময় একটি সাঁজোয়া গাড়ী চলে আসে। গাড়ী থেকে সৈন্যরা রশি হেলতে দেখে উপরে তাকায়। ইসহাক তখনও খুঁটির উপর। তারা তাকে নীচে

নামিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলী করে। তাকে হত্যা করেই সৈন্যরা থামেনি। তার দেহ থেকে মাথা কেটে আলাদা করে সামনে অগ্রসর হয়।

কিছুদূর অগ্রসর হলে জামার উপর আল-জিহাদের ব্যাজ আঁটা দু'জন মুজাহিদ তাদের সামনে পড়ে। সৈন্যরা তাদেরকেও গুলী করে হত্যা করে। সাথে সাথে সাঁজোয়া গাড়ী আরো অগ্রসর হয়ে আমাদের বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। আমরা প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। এপাশ দিয়ে গুলী চালাতেই ওপাশ দিয়ে অন্য মুজাহিদরা তাদের উপর গুলী ছোড়ে।

চার ঘন্টা ব্যাপী লড়াই চলার পর অপর পাশের মুজাহিদদের গুলী ফুরিয়ে যায়। সে সুযোগে বেঁচে যাওয়া সৈন্যরা পালিয়ে যায়। এ লড়াইয়ে চারজন মুজাহিদ শহীদ হয়। অপর পক্ষে সতেরো জন হানাদার সৈন্যের নাম নিহতের খাতায় লেখা হয়ে যায়।

আবার ক্রেক ডাউনের কবলে

ক্রেক ডাউনের নাম শুনতেই ভয়ে-আশংকায় শরীরের সবগুলো লোম দাঁড়িয়ে যায়। মানসপটে এমন ভয়াবহ এক চিত্র ভেসে উঠে, যা সুস্থ মানুষও কল্পনা করলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ক্রেক ডাউনের নামে ওদের পাশবিকতা ও নির্মম অত্যাচারের কথা জল্পনা করতেও কষ্ট হয়। এ সময় নওজোয়ানদের ঘর থেকে বের করা হয়। বৃদ্ধ, দুর্বল ও কমজোর লোকদের টেনে হিঁচড়ে বাইরে আনা হয়। বাচ্চারা ওদের বুটের তলায় পিষ্ট হয়। হায়েনার মত মহিলাদের ইজ্জত লুটে খায়। পিশাচদের নখরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয় তাদের শরীর ও মন।

তিন দিন পর্যন্ত খোলা আকাশের নীচে ক্ষুধা ও পিপাসা নিয়ে পরিচয় ও তল্লাশী শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের অবস্থান করতে হয়। হাত-পা অবশ হয়ে যায়।

কোন এলাকায় মুজাহিদ আছে বলে সন্দেহ হলেই তারা সেখানে ক্রেক ডাউন বসায়। গভীর রাতে সৈন্যরা সমগ্র এলাকা ঘিরে ফেলে। এরপর প্রতি দশ মিটার অন্তর দু'জন সৈন্য বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে মাইক দিয়ে ঘোষণা করা হয় যে, এ এলাকায় ক্রেক ডাউন বসানো হয়েছে। অতএব জনগণ যেন নিজ নিজ ঘর থেকে বের হয়ে অমুক মাঠে 'সনাক্তি প্যারেডে' একত্রিত হয়।

এলাকার সকল পুরুষ, মহিলা ও শিশুরা সে মাঠে একত্রিত হয়। এরপর সৈন্যরা ঘরে ঘরে ঢুকে তল্লাশী চালায়। যদি কোন ঘরে কাউকে লুকানো পাওয়া যায়, তবে তাকে সাথে সাথে গুলী করে হত্যা করে। এই সময় ঘরের মূল্যবান জিনিস-পত্র সৈন্যরা হাতিয়ে নেয়। সব বাড়ী-ঘরের তল্লাশী শেষ হলে নির্দিষ্ট মাঠে অপেক্ষারত লোকদের 'সনাক্তি প্যারেড' শুরু হয়। বয়স অনুযায়ী তাদেরকে বিভিন্ন লাইনে দাঁড় করিয়ে পরিচয় নেয়া হয়।

সবাইকে সর্বপ্রথম প্রমাণ করতে হয় যে, সে কাশ্মিরী। এরপর একটি গাড়ীতে বসা সরকারী গুপ্তচর বাহিনীর সামনে এক এক করে সবাইকে হাজির করা হয়। যদি গুপ্তচররা কোন ব্যক্তিকে মুজাহিদ বলে সন্দেহ করে, তবে গাড়ীর হর্ণ বেজে উঠে অথবা সৈন্যদেরকে ইশারায় বিষয়টা জানিয়ে দেয়া হয়। যাদের প্রতি তাদের সন্দেহ না হয়, তাদেরকে চলে যেতে বলা হয়। দেহ তল্লাশীসহ সকলকে নানা ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এ সময় ভারতীয় সৈন্যরা বিনা উস্কানিতে অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করে।

১৮ই আগস্ট সন্ধ্যায় আমার অবস্থান থেকে বের হয়ে শ্রীনগরে শহীদদের জন্যে অনুষ্ঠিত দু'আর মাহফিলে অংশ গ্রহণ করি। দু'আর মাহফিলের পর মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করে নদী পার হয়ে অপর পারে যাবার প্রোগ্রাম ছিল। আমার মেজবান এ সময় নদী পাড়ি দিতে বারণ করেন।

রাতের বেলা নদীতে কোন নৌকা চলাচলের শব্দ পেলে সৈন্যরা নির্বিচারে গুলী ছুড়ে। সাতার না জানায় এবং পুল দিয়ে অপর পারে যাওয়াও নিরাপদ নয় ভেবে সে রাতের জন্যে এপারেই থেকে গেলাম।

রাত শেষে ভোর হতেই সৈন্যরা ক্রেক ডাউন দিয়ে সুপ্রভাত জানায়। নিরুপায় হয়ে আমিও সনাক্তি প্যারেডের জন্যে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে জওয়ানদের লাইনে বসে পড়ি।

পার্শ্ববর্তী বৃদ্ধদের লাইন থেকে এক বৃদ্ধ অবিরাম চীৎকার করছিল, 'আমার পেটে ব্যথা করছে, আমাকে ঘরে নিয়ে চল।'

এক সৈন্য এসে তার পেটে সজোরে লাথি মেরে বলল, 'হারামজাদা, কমবখত, চুপ করে বসে থাক।'

বৃদ্ধের পেটে সত্যি সত্যিই প্রচন্ড ব্যথা করছিল। তার পক্ষে লাথি খেয়েও চুপ থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। সে পুনরায় কাতরাতে লাগল।

এবার এক ক্যাপ্টেন এসে জিজ্ঞেস করল, 'বাবাজী কি হয়েছে?'

বৃদ্ধ এবার তার পেটের ব্যথার কথা খুলে বললে ক্যাপ্টেন জওয়ানদের লাইনে দৃষ্টি বুলায়। সাত নম্বরে আমি বসা ছিলাম। আমার উপর তার দৃষ্টি স্থির হওয়ায় আমার হৃদস্পন্দন দ্রুত বেড়ে যায়। সে আমাকে উঠে দাঁড়াতে ইশারা করে বলল, 'তোমাকে শরীফ আদমী বলে মনে হয়, কোথা থেকে এসেছ? কি কাজ কর? আচ্ছা মেডিকেল স্টোর চিন?'

'জি হ্যাঁ, আমাদেরই একটা আছে।'

'যাও, এই বাবাজীকে নিয়ে যাও। ঔষধ খাইয়ে তাড়াতাড়ি নিয়ে আস। তোমার পরিচয় নিতে হবে'। আমার হৃদয়ে আশার আলো জ্বলে ওঠল।

'আচ্ছা দাড়াও, তোমার সনাক্তি পর্ব আগে হয়ে যাক'।

এবার আমার পায়ের নীচের মাটি যেন সরে যাচ্ছিল। এদিকে বৃদ্ধ সমানে কাতরাচ্ছে। ক্যাপ্টেন সে দিকে তাকিয়ে বলল, 'এতে তো অনেক সময় লাগবে। যাও তাড়াতাড়ি ঔষধ নিয়ে ফিরে আস।'

এবার আমি উঠে বৃদ্ধকে নিয়ে আস্তে আস্তে অগ্রসর হলাম। মনের গভীর থেকে বৃদ্ধের জন্যে দু'আ করলাম, বৃদ্ধও আমার জন্যে দু'আ করল।

আমি বললাম, আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করুন।

আমার এ কথায় বৃদ্ধের সন্দেহ হল।

সে বলল, 'তোমাকে আমার সন্দেহ হয়।'

আমি ভাবলাম, এ আবার কোন্ বিপদ। তাড়াতাড়ি কথা পাল্টিয়ে বললাম, বাবাজী তাড়াতাড়ি চলুন। ফিরে এসে সনাক্তি প্যারেডে অংশ নিতে হবে।

পেছন থেকে দু'জন সিপাই দৌড়ে এসে বলল, 'তাড়াতাড়ি কর।'

আমি বললাম, বাবাজী হাঁটতে পারছেন না। বড় কষ্টে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছি।

'আচ্ছা জলদী কর' বলে তারা সিগারেট টানতে থাকে।

মেডিকেল স্টোরে পৌঁছলাম। স্টোরের মালিক আমাকে আগে থেকে-ই চিনত। সে অবাক্ বিস্ময়ে বলল, 'আমজাদ, তুমি এখানে!'

বললাম, 'হ্যাঁ দোস্ত, জলদী পালাবার কোন ব্যবস্থা কর।'

সে মেডিকেলে বসা এক বৃদ্ধকে দেখিয়ে বলল, 'পোষাক বদলী করে এ বাবাজীর জামা-টুপি পরে নাও।'

আমি নিজের জামা কাপড় রেখে বৃদ্ধের মাটিয়া রংয়ের জামা ও পুরোনো ফ্যাশনের উঁচু টুপি মাথায় দিয়ে হাতে আগুন ছেঁকার গরম অঙ্গারের ছোট ঝুড়ি নিয়ে মাথা নীচু করে তৎক্ষণাৎ মেডিকেল স্টোর থেকে বের হয়ে পড়লাম।

সৈন্যরা আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত ছিল, দূর থেকে ওরা আমাকে চিনতে পারেনি। তারা মাঝে মধ্যে দোকানের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করছিল। আমি গলির মুখে অগ্রসর হয়ে অঙ্গারের ঝুড়ি ছুড়ে ফেলে দৌড় দিলাম। এবার শোর-গোল পড়ে যায়। সৈন্যরা আমাকে ধরার জন্যে দৌড়ে গলির মুখে চলে আসে। ততক্ষণে আমি একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে একটি ছিদ্র দিয়ে সনাক্তি প্যারেড দেখছিলাম।

সনাক্তি প্যারেড শেষ হয়ে যাওয়ায় সৈন্যরা দ্বিতীয়বার খানা তল্লাশীতে আসেনি। পরে শুনলাম, সৈন্যরা আমার সম্পর্কে সেই বৃদ্ধ ও মেডিকেল স্টোরের মালিকের কাছে জিজ্ঞেস করেছে। তারা বলেছে, 'এখানে দাঁড়ানো ছিল, কোন দিকে গেছে আমরা লক্ষ্য করিনি।'

অসুস্থ বৃদ্ধও সৈন্যদের সামনে আমাকে কষিয়ে গালি-গালাজ করে। সৈন্যরাও গালি দিতে দিতে সনাক্তি প্যারেডের মাঠে ফিরে যায়। এভাবে বৃদ্ধের পেটের ব্যথা আমার জন্য আবে হায়াত হয়ে দাঁড়ায়। আমি রক্ষা পেয়ে যাই।

ক্রেক ডাউন প্রতিরোধ ব্যবস্থা

ক্রেক ডাউনের এলাকার মুজাহিদরা এক গোপন মিটিংয়ে মিলিত হয়ে এ এলাকা দিয়ে আপাততঃ সৈন্যদের উপর কোন আক্রমণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমি প্রস্তাব দিলাম, যদি এখান থেকে আক্রমণ নাও করা হয়, তবুও পাহারার ব্যবস্থা করা উচিত। যাতে সৈন্যরা যখন তখন ঘরে ঘরে তল্লাশী নিয়ে মুজাহিদদের গ্রেফতার করার সুযোগ না পায়।

আমার প্রস্তাব সকলে মেনে নিয়ে আমার উপরই এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করে। আমি প্রত্যেক গ্রুপ থেকে দশজন করে মুজাহিদ নিয়ে সকল রাস্তার মুখে পাহারার ব্যবস্থা করি। প্রত্যেক গ্রুপের পাহারার স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এক গ্রুপের পর অপর গ্রুপ পালাক্রমে পাহারার দায়িত্ব পালন করে।

এভাবে এ এলাকায় এ-ই প্রথম পাহারার নিয়ম চালু হয়। এর ফলে সৈন্যরা এখানে প্রবেশ করতে ভয় পায়। তারা প্রবেশ করার চেষ্টা করলেই মুজাহিদরা গুলী ছুড়ে। সৈন্যরা গুলীর শব্দ পেলেই এলাকা ত্যাগ করে চলে যায়।

এর কিছুদিন পর আমার ট্রেনিং সেন্টারে যাওয়ার প্রয়োজন হলে অন্য এক সহযোগীকে পাহারার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করে শ্রীনগর থেকে চলে আসি।

সনাক্তি প্যারেড থেকে নিরাপদে ফিরে এলাম

আমাদের নিজস্ব তৈরী আমার রিমোট কন্ট্রোলে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলে তা ঠিক করার জন্যে শহরের এক মেকারের কাছে গেলাম। আমাদের নিজ হাতে তৈরী রিমোট কন্ট্রোল মেকারের বুঝে আসছিল না। তাকে বুঝাতে বুঝাতে রাত এগারোটা বেজে যায়। ঐ দিন এক গ্রুপ মুজাহিদ শহরের এক মিলিটারী পোস্টের উপর আক্রমণ করে। যার প্রতিশোধ নিতে সৈন্যরা ঐ রাতেই ক্রেক ডাউন ঘোষণা করে।

যে স্থান দিয়ে মুজাহিদরা আক্রমণ করে, তার নিকটেই একটি বসতবাড়ি ছিল। সে বাড়ীর এক যুবক ছেলে দিল্লীতে ব্যবসা করত। ঘটনাক্রমে সে ঐ দিনই দিল্লী থেকে বাড়ীতে এসেছে। সৈন্যরা তার ঘরে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ে। কোন প্রতিবেশী দেখা করতে এসেছে ভেবে বড় ভাই উঠে দরজা খুলে দেয়। আর সাথে সাথে ক্রুদ্ধ সৈন্যরা তার উপর ব্রাশ ফায়ার চালায়।

ছোট ভাই গুলীর শব্দ শুনে দৌড়ে আসে। এসে বড় ভাইয়ের রক্তাক্ত দেহের উপর লুটিয়ে পড়ে। নিহত ভাইয়ের জন্যে চোখের অশ্রু ঝরাবার পূর্বেই আরেকটি ব্রাশ ফায়ারের শব্দ শোনা যায়। এক ভাইয়ে বুকে আর এক ভাই পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

হিংস্র হায়েনারা হাসি-আনন্দে ভরপুর একটি সংসারের সবকিছুই লুটে নেয়ার পরেও ওদের তৃপ্তি নেই। প্রতিহিংসা নিবৃত্ত করার জন্য রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক নিরীহ বৃদ্ধকে গুলীর নিশানা বানায়। আরও সামনে অগ্রসর হয়ে দেখে, এক

মহিলা সন্তান কোলে নিয়ে দ্রুত রাস্তা পার হয়ে কিনারা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। রক্ত পিপাসু প্রতিশোধপরায়ণ ড্রাইভার খামোখা জীপটাকে সড়কের পাশ দিয়ে চালিয়ে শিশু সন্তানসহ মহিলাকে পিষে ফেলে যায়।

আফসোস! এ হতভাগ্যদের সাহায্য করার জন্যে আল্লাহর সৈন্যরা কি এগিয়ে আসবে না? এই পৌত্তলিক মূর্তিপূজারী হিংস্র দানবদের সমুচিত জবাব দিতে বীর মুজাহিদ কি এখনো জাগবে না?

পরিস্থিতি অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করায় সে রাতে আর রাস্তায় বের হলাম না। ভোরে সৈন্যদের নির্দেশ মত সকলের সাথে এক মাঠে জমা হয়ে সনাক্তি প্যারেডের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একে একে এবার আমার পালা। কাশ্মিরীদের জন্যে দেয়া একটি পরিচয়পত্র আমার কাছে ছিল। তা দেখিয়ে প্রাথমিক বিপদ দূর করলাম। এবার গুপ্তচরের সামনে দিয়ে যেতে হবে। একটি গাড়ীর মধ্যে গুপ্তচর মুখ ঢেকে বসে আছে। তার চোখ দু'টি টর্চলাইটের মত জ্বলজ্বল করছে। কারো উপর সন্দেহ হলেই হর্ণ টিপে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষমান সৈন্যরা তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হবার ব্যাপারে আমার তিল মাত্র সন্দেহ ছিল না। নিজেকে বাঁচাবার কোন উপায়ই খুঁজে পেলাম না। হাঁটার শক্তিও যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। সর্ব শরীর থর থর করে কাঁপছিল। পা ঠিক রাখতে পারছিলাম না।

কোনক্রমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়ালাম। এবার আমি গুপ্তচরকে এবং গুপ্তচর আমাকে দেখতে থাকে। ভাগ্যের ফয়সালা দ্রুত আপন মঞ্জিলে অগ্রসর হচ্ছে। গুপ্তচর ডানে-বাঁয়ে চোখ বুলিয়ে দেখল, আশেপাশে সৈন্যরা দাঁড়ানো আছে কিনা। এর পর আস্তে করে বলল, 'আমজাদ, তুমি সামনে চলে যাও।'

আমার শরীর থেকে ঘাম ছুটে যায়। শরীরের রংও দ্রুত পরিবর্তন হতে লাগল। পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল। হায়! গুপ্তচর আমাকে চিনে ফেলেছে। এখনই আমি গ্রেফতার হব। এক পা তুলে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে অন্য পা অসাড় হয়ে যায়। কি যে করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এক কদম দু' কদম চলার পর আবার থেমে যায়। মনে হল যেন জমীনে আমার পা গেঁথে গেছে। আমি ভাবছিলাম, সে আমাকে নিশ্চিত চিনে ফেলেছে। কিন্তু না, হর্ণ বাজল না। কোন সৈনিকও আমাকে ধরতে আসল না। আল্লাহ্র রহমতে আমি নিরাপদে বেরিয়ে আসলাম।

পরে এক বিস্ময়কর ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় এক মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'ওই গুপ্তচরটি আমাদের মহল্লারই ছেলে। ভারতীয় সৈন্যরা তাকে গ্রেফতার করে ছ' মাস ইন্টারোগেশন সেন্টারে রেখে চরম নির্যাতন চালিয়েছে। তারপর রেহাই দিয়ে ওদের জবরদস্তি গুপ্তচর বানিয়েছে। আজ পর্যন্ত কোন মুজাহিদকে সে ধরিয়ে দেয়নি।'

কমাণ্ডার শামশীর খান

পদে পদে আল্লাহর নুসরাত

[কমাণ্ডার শামশীর খান ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের এক সিংহ-পুরুষ, দুর্ধর্ষ মুজাহিদ কমান্ডার। আফগান জিহাদের পোড়খাওয়া এ মুজাহিদ কাশ্মীরে প্রত্যাগমন করে বেশ কিছু সফল অপারেশন পরিচালনা করেন। তাঁর এ কৃতিত্বের দরুন তাকে দক্ষিণ কাশ্মীর তথা জম্মুতে জিহাদের তৎপরতা বিস্তৃতি, সেখানকার মুজাহিদদের সংগঠিত করা, ট্রেনিং প্রদান প্রভৃতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এ দায়িত্ব পালনকালে কমাণ্ডার শামশীর খান ভারতীয় বাহিনীর সাথে যেসব সংঘর্ষে লিপ্ত হন, তারই ঈমানদীপ্ত কাহিনী শামশীর খানের নিজের ভাষায় এখানে বর্ণিত হয়েছে]

জম্মুর পথে যাত্রা

সুপ্রীম কমাণ্ডের নির্দেশ অনুযায়ী আমি নিজ অবস্থান থেকে কাশ্মীরের ইসলামাবাদ পৌঁছলাম। এখানে একজনের সাথে আগেই সাক্ষাত করার কথা ছিল। তিনি জম্মু যাবেন। কিন্তু আমাদের মিশন ভিন্ন। তাঁর সাথে দু'ঘন্টা আলোচনা করে কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছি। এরপর তিনি জম্মুর পথে যাত্রা করেন। তিনি যাবেন বাসে আর আমি যাব বরফাবৃত পর্বতচূড়া, জঙ্গল ও নদী নালা পেরিয়ে বন্ধুর পথ ধরে।

ঘনিষ্টজনদের থেকে বিদায় নিয়ে এক লোকালয়ে পৌঁছলাম, যেখানে গাইড আমার অপেক্ষায় ছিল। সে পূর্ণ প্রস্তুত। অ্যামুনিশন ও খাদ্য-পানীয় কাঁধে নিয়ে গন্তব্যের পথে পা বাড়ালাম। গাইডকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কয়দিনে জম্মু প্রদেশে পৌঁছতে পারব?

বলল, 'চারদিন তো লাগবেই।'

এর চেয়ে কম সময়ে পৌঁছা যায় না?

গাইড বলল, যাবে ঠিকই, কিন্তু সে পথ বড় দুর্গম। পথে পথে উঁচু উঁচু পর্বত ও অসংখ্য গভীর খাদ। আপনি বললে সে পথই ধরব। তাতে একদিন আগেই আমরা জম্মুর সীমান্তে পৌঁছে যাব।'

বললাম, কোন অসুবিধে নেই, দুর্গম পথেই আমরা চলব। আর কষ্ট-ক্লেশ, সে তো জীবনসঙ্গী। আল্লাহ আমাদের মদদগার হলে কষ্টের ভয় কি আর।

দুর্গম পথে দু'দিন আমাদের যাত্রা চলল। দিন রাত সমানে শুধু পথ চলা। বরফাবৃত চূড়া, ঘন জংগল ও গভীর নদী পেরিয়ে শুধুই সামনে চলা। শীত, পানি প্রবাহ পেরিয়ে ওপারে যেতে মনে হত যেন রক্ত হীম হয়ে গেছে। আবেগের উত্তাপে তবুও পা থামে না।

অস্তগামী সূর্যের কিরণে ঝিক্‌মিক্ করছে বরফঢাকা পাহাড়ের চূড়া। এমন সময়ে গাইড এক সুখবর দিল, 'ঐ চূড়ার ওপাশেই সীমানা'।

এ কথা শুনতেই আমার ক্লান্ত-শ্রান্ত অবশ পা সতেজ হয়ে ওঠে। দ্রুত অগ্রসর হতে থাকি। তিন-চার ঘন্টার মধ্যে আমরা বরফঢাকা দুর্গম পাহাড় অর্ধেক পেরিয়ে যাই। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। তাই আমরা যত শীঘ্র সম্ভব জম্মু সীমান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করছিলাম।

হঠাৎ আকাশ মেঘে ছেয়ে যায়। প্রথমে বৃষ্টি, এরপর তুষারপাত। গাইড আকাশ পানে তাকিয়ে বলল, 'আবহাওয়া মোটেই সুবিধেজনক নয়। অন্ধকার ক্রমে গাঢ়তর হচ্ছে। এভাবে প্রচণ্ড বরফপাতের সাথে তীব্র হাওয়া বইলে শীতের প্রকোপে পথেই আমাদের ইহলীলা সাঙ্গ হবে।'

আমি বললাম, থামলে চলবে না; সামনে অগ্রসর হতে হবে। সীমান্তের নিকটে পৌঁছে হিম্মতহারা হওয়া মঞ্জিলে পৌঁছে ফেরৎ যাওয়ার নামান্তর নয় কি?

গাইড তো আর আমার মত আবেগদীপ্ত নয়। তাই বলল, 'আজ ফিরে চলুন, বাকী পথ আগামীকাল পাড়ি দেব। এমতাবস্থায় পর্বত চূড়ায় উঠলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। তখন মঞ্জিল হাতছানি দিয়ে ডেকেও আমাদের পাবে না।'

শেষে গাইডের কথাই মানতে হল। এবার আরোহণের বদলে অবতরণের পালা। ক্ষণিক পরেই আমরা এক গ্রামে পৌঁছে একটি বাড়ীতে উঠলাম। রাতটা ওখানেই কাটালাম।

ভূয়া মুজাহিদদের অপকীর্তি

খুব ভোরে পুনরায় সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমন সময় এক ব্যক্তি বলল, 'এ গ্রামে 'আল-ফাতাহ্' নামে একটা সংগঠন একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারকে অপহরণ করে বন্দী করে রেখেছে।'

কথাটা শুনেই চমকে উঠলাম। আমার জানা মতে কাশ্মীরে আল্-ফাতাহ নামের কোন সংগঠন নেই। এ সব ভূয়া সংগঠন মুজাহিদদের জন্যে একটা মাথা ব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেকারগোষ্ঠী ও ভারতীয় এজেন্টরা মুজাহিদদের ছদ্মবেশে এভাবে হীনস্বার্থ উদ্ধার করে চলছে।

সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের জোরে জনগণের পয়সা লুটে আর পথিকদের বিপাকে ফেলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ অপকর্ম ঐ গ্রুপেরই হবে। এরা উক্ত ইঞ্জিনিয়ার থেকে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ নিয়ে তাকে ছেড়ে দেবে।

তবে এসব অপকর্ম সরকারী এজেন্টদের হাতে বেশী ঘটে থাকে। সারা বিশ্বে কাশ্মীর জিহাদ ও মুজাহিদদের দুর্নাম রটাতে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছে। বিশ্ব জনমত মুজাহিদদের বিপক্ষে চলে যাওয়ার আশঙ্কা হচ্ছিল। তাই সমস্ত মুজাহিদ সংগঠন এ ধরনের অপতৎপরতায় জড়িত সমস্ত লোকদের নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নেয়।

গাইডকে বললাম, জম্মু পৌছার আগেই সমস্যার একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। আমি দেখতে চাই, ইঞ্জিনিয়ারকে যারা অপহরণ করেছে তারা কারা।

গাইড বলল, 'ইঞ্জিনিয়ারকে যারা অপহরণ করেছে, তারা খুবই শক্তিশালী এবং সংখ্যায়ও অনেক। আর আপনি একা। তাই এ বিষয়ে জড়িত না হওয়াটাই উত্তম।'

বললাম, প্রয়োজনে এখানে মুজাহিদ সংগঠনের সাহায্য নেয়া হবে।

অপহরণ করে ইঞ্জিনিয়ারকে যে গ্রামে রাখা হয়েছে, সে গ্রামের দূরত্ব এখান থেকে অন্ততঃ দশ মাইল। তাই পায়ে হেঁটে চললাম। সে গ্রামের পথে গাড়ীর ব্যবস্থা নেই।

মাইলখানেক চলার পর পেছন হতে দু'টি ছোট ট্রাক আসতে দেখা গেল। ভয় হল, এরা আবার আর্মি কিনা। তাই সড়ক ছেড়ে পাশ দিয়ে চলতে থাকি। গাড়ী নিকটে এলে দেখলাম, তারা মুজাহিদ। ইঙ্গিত করতে তারা গাড়ী থামায়।

উভয় গাড়ীতে আনুমানিক সত্তরজন মুজাহিদ হবে। কমাণ্ডার আমার অতি পরিচিত। গাড়ী থামতেই তিনি লাফ দিয়ে নেমে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন, বিশেষ কোন মিশন আছে কি?

বলল, 'এটা রুটিন মাফিক টহল।'

আমি তাকে বললাম, বিশেষ প্রোগাম না থাকলে আমার সঙ্গে চলুন।

তাকে ইঞ্জিনিয়ারের অপহরণের ঘটনা বললাম। এ সম্পর্কে তিনি অবগত নন। তারও জানা মতে কাশ্মীরে আল-ফাতাহ্ নামের কোন সংগঠনের অস্তিত্ব নেই। নিশ্চয়ই দুষ্কৃতিকারীরা সরকার থেকে পয়সা মারার জন্যে এটা করেছে।

আমি ইঞ্জিনিয়ারকে উদ্ধারের সকল্প ব্যক্ত করে বললাম, 'আপনি সাহায্য করলে কাজটা সহজ হত।

কমাণ্ডার খুব উৎফুল্ল চিত্তে আমার প্রস্তাবে সায় দিলেন। গাড়ীতে চড়েই আমরা দ্রুত গন্তব্য পথে চললাম।

'আল-ফাতাহ্'র আস্তানায়

যে গ্রামে ইঞ্জিনিয়ারকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, আমরা তার থেকে এক কিলোমিটার আগেই গাড়ী ছেড়ে পায়দল গ্রামে পৌছলাম। গ্রামের বাইরে কিছু লোকের সাথে দেখা। তথ্য নেয়ার জন্য তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ গ্রামে কি কয়েকজন মুজাহিদ এসেছিল?'

তারা অজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাদের কথার ভঙ্গিতে বুঝলাম, কিছু গোপন করছে তারা। আমি তাদের আস্থাভাজন হয়ে বললাম, এখানে অবস্থানরত লোকগুলো মুজাহিদ নয়। তারা তো দুষ্কৃতিকারী। মুজাহিদদের দুর্নাম রটানোর জন্যে তারা ঘৃণ্য তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। তারা এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপহরণ করে এ গ্রামে বন্দী করে রেখেছে। আমরা মুজাহিদ, নিরপরাধ লোকটিকে আমরা মুক্ত করতে চাই। আপনারা আমাদের সাহায্য করুন এবং যে ঘরে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, সে ঘরটি দেখিয়ে দিন।

মুজাহিদদের নাম ও আমাদের কথা শুনে লোকটি নিশ্চিত হয়। অতঃপর বলল, 'এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। অপহরণকারীরা নিজেদের মুজাহিদ বলে দাবী করছে। এ জন্যে তারা এখানে আশ্রয় পাচ্ছে।'

এরপর তারা সে ঘরটি দেখিয়ে দেয়, যে ঘরে ইঞ্জিনিয়ারকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

দশ মিনিটের মধ্যে আমরা ঘরটি ঘিরে ফেললাম। এখানে নিরাপত্তামূলক কোন ব্যবস্থা চোখে পড়ল না। এটা এ গ্যাংয়ের অপরিপক্কতারই পরিচায়ক। মুজাহিদরা যে কোন পদক্ষেপ নিলে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করে থাকে।

ঘেরাও করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কয়েকটা ফাঁকা গুলী করি। এরপর ওই ঘরবাসীদের বলি যে, তোমরা এখন অবরুদ্ধ। বাঁচতে চাইলে হাত উঁচিয়ে বেরিয়ে এস।

ক্ষনিক পর সবাই হাত উঁচিয়ে বেরিয়ে এল। তারা সংখ্যায় সাতজন। ইঞ্জিনিয়ারও তাদের সঙ্গেই আছেন। মুজাহিদরা এ দুস্কৃতিকারীদের পিটুনি শুরু করে। আমি তাঁদের বাঁধা দিয়ে বললাম, এদের না পিটিয়ে বরং বন্দী কর। এমন শিক্ষা এদের দিতে হবে, যাতে আর কারও ক্ষতি করতে না পারে।

এরপর দু'জন মুজাহিদ ঘরে ঢুকে সবক'টা অস্ত্র কব্জা করে নেয়। আমাদের দেখে ইঞ্জিনিয়ার ভয়ে থর থর করে কাঁপছেন। তার এ অবস্থা দেখে মনে ব্যথা পেলাম আর দুষ্কৃতিকারীদের প্রতি মনটা বিষিয়ে উঠল। একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে তারা কেন এমন পেরেশান করল। ইঞ্জিনিয়ারকে বড় বিমর্ষ দেখাচ্ছে। হয়ত সে ভেবেছে, এবার কোন বড় ধরনের দুষ্কৃতিকারীর হাতে পড়েছে। জীবনের আশা আর নেই।

আমি অগ্রসর হয়ে তার সাথে কোলাকুলি করলাম। তার চোখের অশ্রু মুছে দিলাম। এতে সে আরো ঘাবড়ে যায়। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আপনি এখন নিরাপদ; আর কোন ভয় নেই।

কিন্তু তিনি কাশ্মিরী বা ইংরেজী ভাষা মোটেই বুঝেন না। আমি ইঙ্গিতে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করলাম যে, আপনি এখন মুক্ত। আপনার কোন অনিষ্ট করা

হবে না। কিন্তু তার ফ্যাকাশে চেহারায় আশংকার ছাপ এখনও স্পষ্ট দেখা যায়। হাড় কাঁপানো শীতে তার দাঁত ঠক্ ঠক্ করছে। এক মুজাহিদ নিজের ওভারকোট খুলে তাকে পরিয়ে দেয়। এবার ইঞ্জিনিয়ার কিছুটা বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত নয়নে আমাদের দিকে তাকান। আমরাও তার দিকে তাকিয়ে বন্ধুত্বের হাসি হাসলাম। এতে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আকারে-ইঙ্গিতে এতক্ষণ চেষ্টা করেও যা বুঝাতে ব্যর্থ ছিলাম, এক মুজাহিদের ছোট্ট এক আন্তরিক ব্যবহার তা বুঝিয়ে দেয়। সে বুঝে নেয়, আমরা তার দুশমন নই– বরং বন্ধু।

এরপর ইঞ্জিনিয়ার অপহরণকারী চক্রকে সঙ্গে করে গতরাতে যে গ্রামে ছিলাম, সে গ্রামের পথে চললাম। গ্রামে পৌঁছে দেখি, আমার সঙ্গী মুজাহিদরা আগেই সেখানে পৌঁছে আমাদের অপেক্ষা করছে।

এ অপহরণকারী চক্রের দু'জন ভারতীয় সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের সদস্য। উভয়ে শিখ। তাদের দাড়ী মুণ্ডানো। এর অর্থ এরা মৌন শিখ।

শিখ দু'জন বলল, তারা সোর্স সদস্য। ইদানিং দল ত্যাগ করেছে।

আমি বললাম, এ দু'জনকে পৃথক করা হোক। প্রথমে অন্যান্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা যাক। তারপর তাদের পালা।

আমি নামধারী ভূঁয়া মুজাহিদদের বললাম, সাফ সাফ বল, কে এ নিরপরাধ প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ারকে অপহরণ করেছে? লজ্জা হয় না তোমাদের যে, হীনস্বার্থে সরকার থেকে কয়েকটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার জন্যে আমাদের পবিত্র জিহাদকে বিশ্ববাসীর সামনে হেয় প্রতিপন্ন করছ?

কিন্তু তাদের দাবী, তারা ভূয়া নয়। তারা আল-ফাতাহ সংগঠনের সদস্য। সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেএ সব করেছে তারা ।

আমরা ভাল করেই জানি যে, ভূঁইফোড় সংগঠনগুলোর জন্ম হয় এ সব অপকর্মের জন্যেই। হীনস্বার্থ হাসিলের জন্যে এরা নিজেদেরকে মুজাহিদ বলে জাহির করে। সাথীরা বলল, 'এত সহজে এরা সত্য কথা প্রকাশ করবে না। অন্য পন্থা অবলম্বন করা হোক, তাতে গর্তের সাপ অল্প সময়ে বেরিয়ে আসবে।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, না, সোজা আঙ্গুলেই ঘি তুলব আজ।

অন্য সাথীদের বললাম, শিখ দু' বন্দীকে বলে দাও যে মিথ্যা বললে অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হবে।

এরপর শিখদের দিকে ফিরে পাঞ্জাবী ভাষায় বললাম, সরদারজী! ছাচ্চি গল কর তো জান ছড়া। (অর্থাৎ সত্য বল, তাহলে মুক্তি দেব)

তারা বলল, 'আমরা ভারতভুক্ত পাঞ্জাবের অধিবাসী এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের সদস্য। কাশ্মীরে ভারতীয় নিপীড়ন আমাদের বিবেককে দংশন করে। ভাবলাম, পাঞ্জাবে ভারত সরকার শিখদের দমন করছে। এ দিকে আমরা এ

জালিম শাসকের ক্রীড়নক হয়ে কাশ্মিরী ভাইদের উপর অত্যাচার করছি। তাই আমরা দু'জন দলত্যাগ করে মুজাহিদদের সাথে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস! শেষে এ ভূঁয়া মুজাহিদদের ফাঁদে পড়ে গেলাম।'

আজব কথা বললে সরদারজী! স্বজাতির উপর নিপীড়ন দেখে বিবেকের দংশন অনুভব হয়নি, পাঞ্জাবে থাকতে বিদ্রোহ করলে না। কিন্তু কাশ্মীর পৌঁছেই তোমাদের বিবেক জেগে উঠল? এটা কেমন কথা সরদারজী! সত্য কথা বল।

আমার প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলল না সে। ক্ষণিক পরে বলতে লাগল, 'বিশ্বাস করুন আর না করুন, যা বলেছি সত্যই বলেছি।'

শেষতক তারা কিছু স্বীকার করছে না দেখে ওয়াকিটকিতে চীফ কমাণ্ডার সাহেবের সাথে যোগাযোগ করার পর এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ হল।

ইঞ্জিনিয়ারের তিনটি শব্দ আমার বোধগম্য হয়। কাশ্তওয়াড়া, ফেমেলী ও ফ্রান্স। অর্থাৎ সে ফ্রান্সের অধিবাসী। তবে তার পরিবার রয়েছে কাশতওয়াড়ায়।

চীফ কমাণ্ডারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, 'বন্দীদেরকে আমার ক্যাম্পে পাঠিয়ে দাও। শরীয়া বোর্ড তাদের বিচার করবে। খেয়াল রেখ, তাদের যেন কোন কষ্ট না হয়। তাদের জন্যে পরিমাণ মত খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা করবে। আর ইঞ্জিনিয়ারকে নিরাপত্তা প্রহরায় কাশতওয়াড়া রওনা করিয়ে দাও।'

ইঞ্জিনিয়ারকে কাশতওড়া রওনা করিয়ে দেয়ার সময় আনন্দে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে বারবার আমাদের জড়িয়ে ধরে। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে থাকে। এপর ৭ জন দুস্কৃতিকারীকে চীফ কমাণ্ডারের ক্যাম্পে রওনা করিয়ে পুনরায় আমি জম্মুর পথ ধরলাম।

কুফ্রের সমুদ্রে কিছুক্ষণ

কয়েকঘন্টা চলার পর আমরা ঐ চূড়া পার হই, বরফপাতের কারণে যেখান থেকে আমাদের ফিরে যেতে হয়েছিল। চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখলাম এক অপরূপ দৃশ্য। একদিকে কাশ্মীর উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলীয় সারি সারি নয়নাভিরাম সুউচ্চ পর্বতমালা। অপরদিকে জম্মু উপত্যকা আর গাঢ় সবুজ গাছপালা। এ অপরূপ দৃশ্য দেখে দেখে হাজারো ছবি ভেসে উঠে আমার নয়নতারায়।

কাশ্মীরে চলছে নিপীড়ন-নির্যাতন ও প্রত্যয়-সাহসিকতার সংঘাত। অপরদিকে জম্মু প্রদেশ, যাকে সব সময় কাশ্মীরের তরবারী উঁচু করা বাহু বলা হয়, আজ সে বাহু নিথর। কল্পনার চোখে দেখলাম, বাহু সচল হয়ে উঠছে, তুলে নিচ্ছে পতিত দু'ধারী শামশীরখানা। দেখলাম, সে তরবারীখানা একের পর এক কেটে যাচ্ছে খুনীর ধমনী। আরো দেখলাম, জম্মুর তাওহীদি কাফেলা তরবারী

হাতে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আর সাম্রাজ্যবাদী ভারত তার দানবীয় দেহটা নিয়ে উন্মত্ত জিঘাংসায় জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিচ্ছে ভূস্বর্গ কাশ্মীর উপত্যকা। দাউ দাউ করে জ্বলছে পুরো কাশ্মীর।

জম্মুর পথে এটা আমার তৃতীয় সফর। আগে গ্রুপ বেধে গিয়েছিলাম। কিন্তু এবার একাকী। অজানা পথে একাকী যেতে হবে। আমার সাথে অস্ত্র এবং গোলা বারুদও রয়েছে। এত কিছু নিয়ে সবার চোখকে ফাঁকি দেয়া বড়ই দুষ্কর। দ্বিতীয়ত, এ পথে হিন্দু অধিবাসীদের সংখ্যা বেশী। পদে পদে রয়েছে ফৌজ ও ইন্টেলিজেন্সের ফাঁদ। কিন্তু যে দায়িত্ব আমি নিয়েছি, যে মিশন সামনে রেখে ঘর ছেড়েছি, যার পথের পথিক আমি, তিনি নিঃসম্বল বান্দাদের একা ছেড়ে দেন না, তাঁরই অসীম রহমতের ছায়ায় এগিয়ে চলছি আমি।

পদে পদে আল্লাহর নুসরাতের বিশ্বাস যখন আপনার মনে আনন্দের জোয়ার সৃষ্টি করবে, তখন আপনি হবেন এ ভূভাগের সবচেয়ে শক্তিধর ব্যক্তি। অজানা ভয়, শত্রু ও হিংস্র প্রাণী আপনার নিকট মনে হবে নিষ্প্রাণ। শত্রুর সুবিশাল বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে আপনি ভয় পাবেন না।

পর্বতচূড়া হতে নেমে আমরা সামনে চলতে থাকি। হালকা বরফপাত হচ্ছিল। আমাদের কাপড় ভিজে যাচ্ছে। শীতে দাঁত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। এ সময় আমরা জঙ্গল দিয়ে হাঁটছি। মনে মনে মহান আল্লাহর নাম স্মরণ করছিলাম। ঠাণ্ডায় হাত সঞ্চালন করাও দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। গাইড বলল, 'প্রথম গ্রামটিই আমাদের মনযিল। গ্রামটি সম্পূর্ণ হিন্দু বসতী। গ্রামের মাঝখানে মুসলিম ঘর শুধু একটি।'

সবার অলক্ষ্যে ওই গ্রামের নিকটে পৌছলাম। পাহাড়ী উপত্যকার চেয়ে জম্মুর বসতী এলাকায় মুজাহিদদের বেশী ভোগান্তীর কারণ ও পরিমাণটা আন্দাজ করতে পারলাম। ঘন্টাখানেক চলার পর রাখাল ও গোয়ালদের পাহাড়ী বাড়ী-ঘরের নিকট পৌছলাম।

গাইড বলল, 'আমাদের মনযিল আর বেশী দূরে নয়। তবে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করতে হবে।'

প্রচণ্ড ঠান্ডা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে গাইড কিছু কাঠ যোগাড় করে আগুন ধরায়। তাতে কাপড় শুকিয়ে নিলাম। আগুনের তাপে শরীরও সতেজ হয়ে উঠল। সাথে আনা রুটি ও মরিচ দিয়ে নাস্তা সারলাম।

রাত আটটায় অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে গ্রামের পথ ধরি। গ্রামে তখন পিনপতন নীরবতা। বেঘোরে ঘুমিয়ে থাকা লোকগুলোর বুক কাঁপার শব্দও শোনা যাচ্ছিল। খুব সতর্ক পদে মুসলিম ঘরের দ্বারে পৌছি। কুফরের সমুদ্রে ইসলামের দ্বীপ দেখে আনন্দে মন ভরে ওঠল। ভাবলাম, আল্লাহ্ পাক সবখানেই মুজাহিদের জন্যে সাহায্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

গাইড মেজবানের দরজায় মৃদু করাঘাত করে। ক্ষণিক পরে এক লোক দরজা খুললে আমরা ফিস্ ফিস্ করে নিজেদের পরিচয় দিলাম। সে তৎক্ষণাৎ আমাদেরকে ঘরের ভেতর প্রবেশ করতে বলে। আমাদের দেখে তার আনন্দ যেন উপচে পড়তে চায়। তিনি বারবার বলতে লাগলেন, 'আমি কতই না সৌভাগ্যবান, এক মুজাহিদ আমার ঘরে পদধূলি দিয়েছেন।'

তিনি আমাদের আগুনের ব্যবস্থা করে খানাও পাকালেন। খেয়ে দেয়ে অবশেষে আমরা গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম।

রাখাল বেশে

দুপুরের বেশ আগে আমরা জেগে উঠি। পাছে কেউ আমাদেরকে মুজাহিদ বলে সন্দেহ করে এই ভয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করলাম। পোষাক খুলে একটা ছেড়া চাদর গায়ে জড়িয়ে পুরাতন একটা পুটি মাথায় পরলাম, যা এ অঞ্চলের গরীব রাখালদের পোষাক। তবে পুরনো জুতা পেলাম না বলে আমারটাই পরলাম। তবুও এখন কেউ আমাকে মুজাহিদ বলে সন্দেহ করবে না। চেহারা-সুরতে আমি এখন পুরোপুরি একজন গরীব রাখাল। পোষাক বলে এ লোক মেষপাল ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। নামাজ আদায় শেষে মেজবানকে তার আন্তরিক মেহনমানদারীর জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম।

এতক্ষণে সূর্য বেশ তেতে উঠেছে। আমরা সেতুর নিকট পৌঁছলাম। সিআর পি সৈন্যরা ওখানে পাহারা দিচ্ছে। গাইড পরামর্শ দিল, 'সেতু না পেরিয়ে অন্য পথে চলতে হবে। সৈন্যদের মুখোমুখি হওয়া কখনও নিরাপদ নয়।'

সে আরও বলল যে, 'সামনে একটি মুসলিম ঘর আছে। সে ঘর থেকে এখানকার নিরাপদ রাস্তা জেনে নিতে হবে।'

গাইডের কথামত লোক চলাচলের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে চললাম। আধঘন্টা পর ওই মুসলিম ঘরে পৌঁছি। সেখানে তিনজন যুবকের সাথে সাক্ষাত হয়। সবাই শিক্ষিত। কথাবার্তার ফাঁকে তাদের বললাম, জম্মু মুসলিমদেরও এখন জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া চাই।

আমার মুখে উপত্যকায় ভারতীয় ফৌজের জুলুম-নিপীড়নের বিবরণ শুনে তারা সচেতন হয়ে ওঠে। ক্ষণিকের সাক্ষাতের ফলেই তারা বেকারার হয়ে বলল, 'এক্ষুণি আমরা মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিতে চাই। আপনি ট্রেনিং ও অস্ত্র দিয়ে আমাদের নেতৃত্ব দিন। এরপর দেখবেন, জম্মুর জনপদ কিভাবে ভারতীয় ফৌজের জন্যে মৃত্যুপুরী হয়ে দাঁড়ায়।'

আমি বললাম, ইনশাআল্লাহ সব ব্যবস্থাই হবে। আপাততঃ আমাদের নিরাপদ রাস্তা দেখান, যাতে সিআরপি ও অন্যান্য বাহিনীর চোখ এড়িয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারি।

ইসলামের বাঁধন কত গভীর, এ অচেনা ভাইদের সাথে ক্ষণিকের সাক্ষাতেই তা বুঝতে পারলাম। কয়েক মুহূর্তে পরস্পরে এত আন্তরিক হয়ে গেলাম, যেন সবাই বহুদিনের চেনা। তারা বলল, 'এ দেশে আপনাকে কেউ সন্দেহ করবে না। কিন্তু আপনার সাথের অস্ত্রটা একটা সমস্যা। সব পথেই আপনি সামরিক বা আধা সামরিক বাহিনী দেখতে পাবেন। তারা শরীর তল্লাশীর পরই আপনাকে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেবে।'

ফলে অস্ত্র রেখে যাওয়া ছাড়া উপায় না দেখে যুবক ভাইদের হাতে অস্ত্র ও গোলা-বারুদ তুলে দিয়ে বললাম, 'কয়েকদিন পর আমাদের লোক এখানে আসবে। তারা কোড নাম বললে তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে দেবে।' কোড নাম জানিয়ে দিয়ে আমরা আবার সামনে চললাম।

অল্প দূর যেতেই এক বকরী রাখাল আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি হিন্দু না মুসলমান?

বলল, 'আমি মুসলমান'।

আমার জুতা জোড়া তাকে দিয়ে বললাম, এ নতুন জুতা জোড়া তুমি নিয়ে তোমার ছেড়া জুতা জোড়া আমাকে দাও।

সে আশ্চর্য হল, এ কেমন লোক! দামী জুতার বদলে প্লাষ্টিকের ছেড়া জুতা নিচ্ছে! সে অবাক্ হলেও তার জুতা আমাকে দিয়ে আমার জুতা জোড়া সে পরে নিল। রাখালের জুতা জোড়া ছিল ছোট, তবুও চাপাচাপি করে পরে নিয়ে অগ্রসর হলাম।

এখন আমার মাথার চুল এলোমেলো। দাড়ি ধূলো-মলিন। শেলোয়ারের এক পা হাটু পর্যন্ত উঠানো। আর অন্যটা মাটি ছুয়ে আছে। গায়ের কাপড় মেটে রঙের, ভীষণ ময়লাযুক্ত। হাতে লম্বা এক লাঠি, তাতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছি। এখন আমার পরিচিত কেউও আমাকে চিনতে পারবে না।

ছোট নদীটা সেতুর উপর দিয়ে পার হলাম। এ পথে লোকজনের চলাচল কম থাকায় কোন সেনাগার্ড দেখা গেল না। সেতু পেরিয়ে আবার সড়ক পথে চলছি। পনের মিনিট চলার পর পিছন হতে একটা গাড়ী আসতে দেখলাম। ওয়াগন জাতীয় গাড়ী। একে মিটাডোর বলে। গাড়ীটা থামিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। ঘন্টাখানিক চলার পর এক সেতুর পাশে এসে গাড়ী থেমে যায়। বাইরে তাকিয়ে দেখি সিআরপি সশস্ত্র জওয়ানরা দাঁড়িয়ে আছে।

বেঁচে গেলাম মৃত্যুর ছোবল থেকে

সেনাগার্ড সবাইকে নীচে নামার নির্দেশ দেয়। একে একে সবাই নীচে নেমে যায়। কিন্তু আমি গাড়ীতেই বসে থাকি। আমার পরিকল্পনা ছিল, সবার পরে নামব। সবাইকে জেরা করতে করতে সেনারা যখন বিরক্ত হয়ে পড়বে, তখন আমি আর বেশী প্রশ্নের সম্মুখীন হব না।

যাত্রীদের সবাইকে পালাক্রমে জেরা করা হচ্ছে। তোমার নাম কি? কোথা থেকে এসেছ? কোথায় যাবে? কেন যাবে? এ ধরনের লাগাতার প্রশ্ন।

তল্লাশীর নিয়মটা এ ধরনের। গাড়ী সেতু ঘেঁষে দাঁড়ায়। এরপর তল্লাশী চলে। নির্দোষ প্রমাণিত ব্যক্তিকে পায়ে হেঁটে সেতুর ওপারে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। পালাক্রমে সকলের তল্লাশীর পর সেতু পার হলে ফাঁকা গাড়ী নিয়ে সেতু পার হওয়ার ছাড় দেয়া হয়। সেতুর ওপারে গিয়ে সবাইকে গাড়ীতে উঠতে হবে। কয়েকজন লোক তল্লাশীর পর নিয়মমত সেতু না পেরিয়ে এ পারেই দাঁড়িয়ে থাকে। একজন সিআরপি অফিসার তাদের দেখে অশ্রাব্য গালি দিয়ে বলল, 'ভাগ শালা এখান থেকে।'

একে মহাসুযোগ মনে করে তৎক্ষণাৎ গাড়ী থেকে নেমে পড়ি এবং তল্লাশী ছাড়াই ধমকপ্রাপ্ত দলটির সাথে খুঁড়িয়ে সেতুর ওপারে চলে যাই। আমার এ চালাকী কারো চোখে ধরা পড়েনি। পড়লে তার উত্তরটাও ভেবে রাখি যে, তোমরাই তো বললে, সবাই ওপারে চলে যাও।

যদিও বেআইনী কোন কিছু আমার নিকট নেই; তবুও শত্রুসেনাদের বোকা বানিয়ে দারুণ একটা আনন্দবোধ হল। ওপারে গিয়ে দেখি, সিআরপি গ্রুপ আমাদের গাড়ীর কয়েকজন সন্দেহভাজন যুবককে আটকে রেখেছে। যুবকগুলো শিক্ষিত। তাদের ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের গাড়ী চলবে না। মিনিট কয়েক বসে আশংকার মধ্যে কাটাই। ভাবলাম, এরপর গাড়ী কখন ছাড়ে তার কোন ঠিক নেই, পায়খানা-প্রশ্রাবের প্রয়োজন এখানেই সেরে নেই।

সেতুর অল্প দূরে রাস্তার ধারেই একটা বড় পাথর পেলাম। পাথরের আড়ালটা খুব যুৎসই। তাই বসে পড়লাম। বসতেই এক সৈন্য আমাকে দেখে ফেলে। একটা অশ্রাব্য গালি দিয়ে আমাকে তার কাছে ডেকে নেয়। ততক্ষণে গাইডের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমিও চিন্তায় পড়ে গেলাম, কোন চর গোমর ফাঁস করে দেয়নি তো? তারা কি জেনে ফেলল, আমি বিনা তল্লাশীতে এপারে চলে এসেছি? হরেক রকম প্রশ্ন মাথায় কিলবিল করছে।

আমি রোগীর ন্যায় ধীর পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সৈন্যটির নিকট গেলাম। সৈন্যটি বলল, 'তুমি এখানে প্রশ্রাব করলে কেন?'

উত্তরে বললাম, স্যার, আড়াল দেখে বসেছিলাম, রোগী মানুষ, বেশী দূর যেতে পারি না।

সৈন্যটি গালি দিয়ে বলল, 'আরে আড়ালের বাচ্চা, এটা ভগবানের মূর্তি। এখানে আমরা প্রার্থনা করি।'

ভালোভাবে লক্ষ্য করার পর বুঝলাম, সত্যিই এটা একটা মূর্তি। আপন ভগবানের সাথে এমন আচরণ দেখে সে আমাকে গুলী করেও মারতে পারত। কিন্তু হিন্দু সৈনিকটি হয়ত কোমল হৃদয়ের মানুষ; আমার অসুস্থ চাল-চলন দেখে তার ভেতরের সুবোধ মানুষটি জেগে উঠেছিল হয়ত। তাই কয়েকটা গালি দিয়ে

আমাকে ছেড়ে দেয়। এ গালি খেয়ে আমি তেমন ক্ষুব্ধ হইনি। কারণ, মরণফাঁদ থেকে বেঁচে যাওয়া আমার জন্য কোন ছোট নেয়ামত নয়।

ইন্ডিয়ান সেনার কবল থেকে ঠিকমত ফিরে আসলে গাইডের ভয় দূর হয়। এই প্রথমবার কোন ইন্ডিয়ান সেনার সাথে আমার নিরস্ত্র অবস্থায় কথা বলার অভিজ্ঞতা হল। গাইড আমার সৌভাগ্যকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, 'সে আপনাকে গুলী করলেও কেউ তাকে প্রশ্ন করত না। এমনই বেপরোয়া এদের তৎপরতা।'

আমিও মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম, এমন কঠিন পরিস্থিতি থেকে নিরাপদে পার করার জন্যে।

সন্ধ্যা নাগাদ গন্তব্যে পৌঁছলাম। মাগরিবের পর দায়িত্বশীল মুজাহিদদের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক শুরু হল। আমার ছদ্মবেশী চেহারা দেখে তাঁরা বিস্মিত হয়। তাই নিজের পরিচয় এবং মিশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে প্রথমে তাদের বিস্ময় দূর করলাম। এরপর তারা আমাকে গোটা এলাকার মুজাহিদদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করায়। ইন্ডিয়ান সেনাদের তৎপরতা সম্পর্কেও ব্যাপক আলোচনা হল।

এ এলাকায় মুজাহিদদের সংখ্যা যথেষ্ট দেখে আমি নিশ্চিত হলাম যে, মুজাহিদরা এ অঞ্চলে ভারতীয় সেনাদের বিরুদ্ধে সফল অপারেশন চালাতে পারবে। দায়িত্বশীল মুজাহিদদের বললাম, সম্ভব হলে সমস্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত সাথীদের আমার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন।

তাঁরা বলল, 'সম্মিলিতভাবে সবার সাথে সাক্ষাৎ করাটা ঝুঁকিপূর্ণ। তবে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করা যেতে পারে।'

সে মতে পরদিনই সাক্ষাৎ শুরু হল। মুজাহিদদের সাথে সাক্ষাতের সময় আমার শিরার রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠে। সবাই যেন এক একটা বিজলীর ঝলক। তাদের আবেগ দেখে আমি অবাক্ হলাম। প্রত্যেক মুজাহিদই পাহাড়সম হিম্মত আর ট্রেনিংয়ে খুবই দক্ষ। সবার একটাই প্রশ্ন, 'কতদিন আর আমাদের এভাবে বসিয়ে রাখবেন, জিহাদ শুরু করার অনুমতি কবে পাব?'

আগেই বলেছি, বিশেষ কারণে এখনো জম্মুতে সশস্ত্র জিহাদ শুরু করা হয়নি। তাদের বললাম, আমি তো এসেছি আপনাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে। এখন আপনাদের সামনে অগ্রসর হওয়ার পালা। আপনাদের আর বসিয়ে রাখা হবে না। তথাপি এ জন্যে আমাদেরকে সুশৃংখল পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে, যাতে আমরা অল্প ঝুঁকি নিয়েই দুশমনের অধিক ক্ষতি সাধন করতে পারি।'

চারদিন ধরে সকলের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। পরিকল্পনাও তৈরী হল। মুজাহিদদের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জেনে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে তাৎক্ষণিকভাবে তা' জানানোর ব্যবস্থা করলাম। আমার কাজ শেষ করে এ ব্যাপারে এখানের অন্যান্যদেরও অনুমতি নিলাম।

মিশন হল শুরু

পরবর্তী মঞ্জিল 'ডোডা' শহর। আমার গাইড হিসেবে এক শিক্ষিত যুবককে দেয়া হয়। আমরা একটা টাটা গাড়ীতে চড়ে ডোডা রওনা হলাম। ডোডা শহরের অল্প দূরে এসে গাইড কানে কানে আমাকে বলল, ডোডা সেতুতে আমরা সমস্যায় পড়তে পারি। এখানে সিআরপি সদস্যরা কঠোর চেক করে। কাউকে সন্দেহ করলে পরিচয় পত্র দেখাতে হয়।'

আমি বললাম, তখন দেখা যাবে, যে সত্ত্বা এ পর্যন্ত আমাকে রক্ষা করেছেন, তখনও তিনিই একটা উপায় বের করে দেবেন।

ডোডা ব্রীজ পৌঁছে দেখি, গাড়ীর দীর্ঘ লাইন। কঠোর চেকিং চলছে। আমি চিন্তা করতে লাগলাম, তাৎক্ষণিকভাবে কি করা যায়। দেখলাম, তারা শুধু আন্তঃনগর বাসগুলো চেক করছে। কিন্তু লোকাল গাড়ীর যাত্রী নামানো হয় না। ঠিক করলাম, এ গাড়ী ছেড়ে লোকাল গাড়ীতে উঠব।

আমাদের বাসের পাশেই একটা ওয়াগান এসে থামল। এক ভারতীয় সৈন্য আমাকে উঁকি মেরে দেখে অন্যটায় উঠে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে অন্য গাড়ীর দিকে ফিরল।

ওয়াগানের দু'তিনটে সিট খালি। চোখের পলকে আমরা টাটা গাড়ী ছেড়ে ওয়াগনে উঠে বসলাম। সাথে সাথে গাড়ী ছেড়ে দিল। এভাবে আমরা কঠোর চেকিংয়ের ফাঁক গলিয়ে কেটে পড়লাম।

ডোডা পৌঁছে এক দায়িত্বশীল মুজাহিদের ঘরে উঠলাম। তাকে বললাম, এক্ষুণি আমি এখানে অন্যান্য দায়িত্বশীল মুজাহিদদের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই।

তিনি আমাকে নিয়ে একটি ঘরে পৌঁছলেন। স্থানীয় অধিকাংশ মুজাহিদ কি একটা প্রোগ্রামে সেখানে সমবেত হয়েছিল। এত অল্প সময়ে সবাইকে এক জায়গায় পেয়ে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। এদের অধিকাংশই আমার আফগানিস্তানের সাথী এবং এরা আমার নিকটেই ট্রেনিংপ্রাপ্ত।

আমাকে দেখে তারা আনন্দে আত্মহারা। সবাই একে একে আমাকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করে। এ ভালবাসাই মুজাহিদের ঐক্যের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। জিহাদরত মুজাহিদরা ঐকান্তিকভাবে পরস্পরের সাক্ষাতের জন্য এমনই ব্যাকুল থাকেন। এমন ভালবাসা সহোদর ভাই আর প্রেমিক-প্রেমিকাদের মাঝেও খুঁজে পাওয়া ভার।

ডোডা শহরে মুজাহিদদের উপদেষ্টা আহসান ডার ও দু'জন পাকিস্তানী মুজাহিদ এজাজ ভাই ও খালিদ ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হল। তাদের সাথে দুপুরে রওনা হলাম একটা পিকআপে করে। গাড়িতে উঠে অন্যান্য কাশ্মিরী মুজাহিদ টহলরত সৈন্যদের মত চারিদিকে ক্লাশিনকোভ তাক করে চলতে থাকে। ক্ষণিক

পর আমাদের গাড়ী এক পুলিশ ফাঁড়ি অতিক্রম করে। কিন্তু আমাদের দিকে তারা তাকালোও না। আহসান ডারকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি?

বলল, 'ভাই এরা আমাদেরই সাথী, কাশ্মিরী পুলিশ সর্বোতভাবে মুজাহিদদের সহযোগী।'

সোপুর পৌঁছে উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে শরীক হলাম। বৈঠক শেষে আবার রওনা দিলাম। এবার গন্তব্য পিটন। আমাদের সাথে অন্যতম মুজাহিদ নেতা শামসুল হকও রয়েছেন। পথে কয়েকস্থানে সেনাছাউনীর পাশ থেকে যেতে হয়েছে।

যেতে যেতে রাত হয়ে যায়। তাই সোপুরের ছরী গ্রামে আহসান ডারের ঘরে উঠলাম। পথে আমার এক বন্ধু আশরাফ ডারের বাড়ী। আশরাফ ডার একজন অকুতোভয় মুজাহিদ। আজ দু'বছর ধরে তিনি ঘর ছেড়েছেন জিহাদের উদ্দেশ্যে। তার সাথে আমার পরিচয় আজাদ কাশ্মীরে।

অবশেষে আশরাফ ভাইয়ের ঘরেই উঠলাম, তার আম্মা-আব্বার সাথে সাক্ষাৎ করব এ ইচ্ছে নিয়ে। আহসান ডার আশরাফ ভাইয়ের আব্বার সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন এ বলে যে, 'এ আশরাফের বন্ধু'। শুনে তিনি আমাকে সস্নেহে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলেন, যেন আমিই আশরাফ ডার।

আশরাফ ভাইয়ের আব্বা আমার নিকট থেকে ছেলের খবরাখবর নিলেন। তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। আপনারা ঘাবড়াবেন না। ইদানিং একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাকে আজাদ কাশ্মীর থাকতে হচ্ছে।

এরপর গেলাম কমান্ডার শামসুল হক সাহেবের বাড়ীতে। তার বড় ছেলেও মুজাহিদ। বাকি দু'জন ছোট, পড়া-লেখা করছে। তারা বলল, আমরাও মুজাহিদ।

আমি বললাম, মুজাহিদ হলে তোমাদের রাইফেল কোথায়?

বলল, 'রাইফেল আব্বুর কাছে রেখে দিয়েছি।'

বললাম, রাইফেল ছাড়া জিহাদ করবে কিভাবে? আব্বুর কাছ থেকে রাইফেলটা নিয়ে নাও।

তারা মুখ ভার করে বলল, 'আব্বুর কাছে রাইফেল চাই; কিন্তু দেননা, কি করব আর।'

আমরা সবাই হেসে উঠি। মুজাহিদ বাপের ছেলেও প্রত্যয়ী মুজাহিদ।

এরপর ওরা আরও দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'আমরা তো এখনও ছোট। একটু বড় হলে ঠিকই আব্বুর থেকে রাইফেল নিয়ে নেব। আমার বড় ভাইয়ার নিকট যেমন রাইফেল আছে, আমার নিকটও থাকবে। তখন আমরাও জিহাদ করব, দুশমন মারব।'

অল্পক্ষণেই তাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, কিন্তু বেশীক্ষণ এ ঘরে অবস্থান নিরাপদ নয় বলে আবার পথ ধরলাম। এবারের গন্তব্য আরীপন্থন গ্রাম।

আক্রমণের সূচনা

আরীপন্থন পৌঁছে এখনো কর্তব্য স্থির করতে পারিনি। এর মধ্যে গ্রামের কয়েকজন মহিলা দৌড়ে এসে বিষণ্নমুখে আমাদের নিকট দাঁড়ায়। আমার সাথী এক কাশ্মিরী মুজাহিদ তাদেরকে কারণ জিজ্ঞেস করল। তারা জানাল 'বেরো রোডের উপর সৈন্যরা বাস থামিয়ে যাত্রীদের হয়রানী করছে, মহিলাদের উত্যক্ত করছে।'

একথা শুনেই আমাদের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সংখ্যায় আমরা অল্প হওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নিলাম, এ মহিলাদের মনে মুজাহিদদের ব্যাপারে এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে, আমাদের শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত এ মাটিতে ভারতীয় সেনাদের স্বেচ্ছাচারিতা চলবে না।

আহসান ভাই এক কাজে গেছেন। বাকী আমরা ছয়জন মুজাহিদ। তিনজন পাকিস্তানী তিনজন কাশ্মিরী। তাদের মধ্যে আমার প্রিয় বন্ধু শওকত ভাইও একজন।

ক্লাশিনকোভ এবং অতিরিক্ত ম্যাগজিন নিয়ে রোডের উপর আর্মীদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হলাম। দূর থেকেই তাদের দেখা যাচ্ছে। দেখতে পেলাম, এখনও যাত্রীদের হয়রানী বন্ধ হয়নি।

মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ সৃষ্টি হল। দু'আ পড়তে পড়তে ক্ষেতের উপর দিয়ে ক্রোলিং করে এগুচ্ছি। আমাদের ইচ্ছে, সৈন্যদের পিঠের উপর ওঠে ওদের নাকানি-চুবানি দেব। একদম তাদের নাকের ডগায় গিয়ে পৌঁছলাম। আগেই তিন সদস্যের এক ক্রোলিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছিল।

গেরিলা যুদ্ধের নীতি হল, যোদ্ধাদের দুই গ্রুপে বিভক্ত করে এক গ্রুপকে হামলায় ও অপর গ্রুপকে পর্যবেক্ষণে নিয়োগ করা হয়। আক্রমণকারী গ্রুপ তার কাজ শেষে ফিরে আসার সময় ক্রোলিং গ্রুপ শত্রুর উপর ফায়ার করে তাদের ভীত করে তোলে। আমি ছিলাম আক্রমণকারী গ্রুপে।

আমরা পৌঁছতেই যাত্রীবাস ছেড়ে যায়। রাস্তা সম্পূর্ণ খালি। চারটি ট্রাক ও সৈন্যরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা নিশ্চিন্তে গল্প করছে। আমরা আকাশ ফাটিয়ে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে ক্লাশিনকোভের ফায়ার শুরু করলাম।

প্রথম ফায়ারেই টহলরত কয়েকজন সৈন্য মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে থাকে। আমরা যেন তাদের অদৃশ্য মৃত্যুদূত। তারা চীৎকার করে আকাশ মাথায় তুলল। আর বাকিরা এদিক-ওদিক ভাগতে ভাগতে 'হায় রাম' 'হায় রাম' বলে হাহাকার জুড়ে দেয়।

যারা পালাবার চেষ্টা করছে, তারা গুলীর আঘাতে পাকা ফলের মত টুপ টুপ করে ঝরে পড়তে থাকে। একজন দৌড়ে গাড়ীতে উঠে গাড়ী স্টার্ট দেয়।

কয়েকজন সৈন্য তাতে উঠে পড়ে। গাড়ীর উপর ফায়ার করলেও তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

রোডের চারিদিকে শুধু সৈন্যদের বিক্ষিপ্ত লাশ পড়ে ছিল। কিছু সৈন্য পালিয়ে যায় আর কিছু সড়কের অপর পাশে পজিশন নিয়ে আমাদের উপর ফায়ার শুরু করে দেয়। কিন্তু ততক্ষণে আমরা অবস্থান পরিবর্তন করে ফেলি।

নিকটেই আর্মীদের একটি বড় ক্যাম্প। তারা সংবাদ পায় যে, সড়কে টহলরত সৈন্য ও মুজাহিদদের মাঝে সংঘর্ষ চলছে। তাই ক্যাম্পের দিক থেকেও প্রচণ্ড ফায়ারের শব্দ ভেসে আসে। তারা আমাদের ভয় দেখাচ্ছিল, কিন্তু আমরা তো বাজিমাৎ করে দিয়েছি। ৬ মিনিট ফায়ার করার পর প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমরা পিছু হটতে থাকি। ওদিকে পজিশন নেয়া কিছু সৈন্য আমাদের দেখতে পেয়ে আবার ফায়ার শুরু করে।

এবার তিন সদস্যের ক্রোলিং গ্রুপ সৈন্যদের উপর ফায়ার শুরু করে। আমরা এ সুযোগে নিরাপদ অবস্থানে পৌঁছে তাদেরকে সংকেত দিলে তারা এসে আমাদের সাথে মিলিত হয়।

আমরা নিরাপদে আরীপন্থন পৌঁছে গেলাম। ক্ষণিক আগের মহিলাদের বিষাদক্লিষ্ট মুখমন্ডলে তখন আনন্দের ঢেউ খেলছিল। শিশুরা আমাদের বিজয় দেখে খুশীতে লাফাচ্ছিল।

সৈন্যরা আমাদের পিছু নেয়ার সাহস করেনি। তথাপি এ গ্রামে অবস্থান করা আমাদের জন্য বিপদমুক্ত নয়। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, পুশকর গ্রামে রাত কাটাব। এ গ্রামটি মুজাহিদদের গোপন ঘাঁটি। কয়েকঘন্টা পায়ে হেঁটে আমরা পুশকর পৌঁছলাম। আমাদের সঙ্গী এক মুজাহিদের বাড়ী এ গ্রামেই। আমরা তাঁর ঘরেই উঠলাম। মুজাহিদের মা আমাদের আপন ছেলের মতই আপ্যায়ন করলেন।

আত্মার সম্পর্ক সত্যিই বিস্ময়কর। এ অচেনা মহিলা আমাদের পায়ের ক্ষত দেখে কেঁদে ফেলেন। এরপর গরম পানি ও বাটা মেহ্‌দীপাতা আমাদের নিকট পাঠিয়ে দেন। মেহ্‌দীবাটা লাগানোতে ক্ষতের ব্যথা কমে আসে। পরদিন আবার আরীপন্থন পৌঁছে জানতে পেলাম যে, আহসান ভাই এজাজ ভাইকে নিয়ে ইসলামাবাদ রওনা হয়ে গেছেন। আমাকেও সত্ত্বর ইসলামাবাদ পৌঁছার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই আবার ইসলামাবাদের পথ ধরলাম।

এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা

পথেই রাত হয়ে যায়। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। ঘুমের ঘোরে চলতে গিয়ে একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। এক মুজাহিদ আমার হাত ধরে ফেলে। পরে আমি তাঁর হাত ধরেই চলতে থাকি। এ সময় আমার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। ঐ মুজাহিদের হাত ধরে চলতে চলতে পুরোদস্তুর ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু পথ চলতে কোন ব্যাঘাত হল না। এ ভাবে ঘন্টাখানিকের মত ঘুমিয়ে

নিলাম। এরপর থেকে এটা আমার অভ্যাস হয়ে যায় যে, হাঁটতে হাঁটতে ঘুম ধরলে এক সঙ্গীর হাত ধরে নিতাম। একই সঙ্গে ঘুমাতাম এবং পথ চলতাম।

ভোর তিনটায় আমরা ইসলামাবাদের (অনন্তনাগ) প্রথম গ্রাম পরওয়ানীতে পৌঁছি। গ্রামবাসীরা আমাদের আগমন সংবাদ পেয়ে দলে দলে বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানায়। আহসান ডার ও স্থানীয় মুজাহিদদের সাথে পরামর্শ শেষ করে আমরা আবার সামনে অগ্রসর হলাম।

মুজাহিদদের গোয়েন্দা

বিভিন্ন এলাকা ঘুরে আমরা 'কুগর গ্যান্ট্রাস' নামক এক গ্রামে পৌঁছি। রাতটা এখানেই কাটে। এ রাতে আমি পাহারা দেয়ার জন্যে জিদ্ ধরলাম। ইতিপূর্বে কাশ্মিরী মুজাহিদরা আমাদেরকে পাহারায় নিয়োগ করত না। বলত, তোমরা মেহমান, আর মেহমানের হেফাজত করা এবং তাদের আরামে রাখা আমাদের কর্তব্য।

এবারও তাদের সে একই কথা। আমি বললাম, এখানে এসেছি দু'মাস হল। এখন আমি আর মেহমান নই। দ্বিতীয় কথা, আমি তো জিহাদ করতে এসেছি। তাই আপনাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সব কষ্টের সমভাগী হতে চাই। কারও জন্য কোনরূপ বিশেষ আচরণ আমার পছন্দ নয়।

অবশেষে সে রাতে আমি কাশ্মিরী মুজাহিদ শওকত ভাইয়ার সাথে পাহারা দেয়ার সুযোগ পেলাম। তার সাথে আমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

জিহাদের পথে পাহারা দেয়ার সুসংবাদ সম্পর্কিত এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "এক সকাল কিংবা এক সন্ধ্যা সীমান্ত পাহারা দেয়া জগত ও জাগতিক সব কিছুর চেয়ে উত্তম।" এতে এক অপার্থিব আনন্দও রয়েছে। সায়্যেদুল কাওনাইন মুহাম্মদ (সাঃ) আমরা অধমদের জন্যে কতসব সৌভাগ্যের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন।

নিকষ আঁধার রাতের নীরবতায় ঘুম তাড়িয়ে, শত্রুর অপেক্ষা করে পাহারা দিয়েও রাতে এক নিদারুণ আনন্দ পেলাম। রাত্র দুইটার সময় আমরা উভয়ে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ি। চারটার দিকে অন্য সাথীদেরকে জাগিয়ে দেই।

জামাতের সাথে ফজর নামাজ আদায় করে আমরা নাস্তা করছিলাম। এ সময়ে বাইরে শোরগোল শুনা গেল। বাইরে গিয়ে দেখতে পেলাম, গ্রামের বহু মহিলা পুরুষ আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে। জিজ্ঞেস করতে তারা বলল, 'এখান থেকে জলদি বেরিয়ে যান, এক্ষুণি সংবাদ পৌঁছেছে যে, সৈন্যরা এ গ্রাম ঘেরাও করতে অগ্রসর হচ্ছে।'

এ ভাবে একাধিকবার আমি সাধারণ জনতার জিহাদী জযবা অবলোকন করেছি। ভাবতে আনন্দ লাগে, কাশ্মীরের প্রতি ইঞ্চি মাটি মুজাহিদদের নখদর্পণে। প্রতিটি কাশ্মিরী জনগণ আপন মুজাহিদ ভাইদের হেফাজত এবং

তাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরীর দায়িত্ব পালনে কত যত্নশীল। সৈন্যরা কয়েক মাইল দূরে থাকতেই জনসাধারণ মুজাহিদদের সে সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়।

এক ব্যক্তি তার গ্রামের পাশ দিয়ে সৈন্যদের কুগর গ্যান্ট্রাস গ্রামের দিকে আসতে দেখে সে দৌড়ে আমাদের নিকট আসে। তাই সৈন্যরা আসার আগেই আমরা তাদের সংবাদ পেয়ে যাই।

আমরা সবাই তখনই হাতে অস্ত্র তুলে নিলাম। গ্রামবাসীদের বললাম, সবাই নিজ নিজ ঘরে চলে যান। বাধা না দিয়ে সৈন্যদেরকে এদিকে আসতে দিন।

আমরা বুঝতে পারছিলাম, আর্মীরা এখনো গ্রামে এসে পৌঁছেনি, না হয় পাহারারত মুজাহিদরা আমাদের খবর দিত।

মুজাহিদদের ধরতে আসা সৈন্যরা পালিয়ে গেল

ক্ষণিক পরেই পাহারারত এক মুজাহিদ ভারতীয় সৈন্যদের আগমন সংবাদ সত্যায়ন করে। তাকে গ্রামের সব মুজাহিদকে একত্রিত করার দায়িত্ব দিয়ে আমরা গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেলাম। ভারতীয় সৈন্যরা পজিশন নিয়ে আমাদের বের হওয়ার পথ আটকে রেখেছে। মুখোমুখি হতেই উভয় পক্ষ থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলী শুরু হয়ে যায়। শত্রু পক্ষ প্রচুর সৈন্যসহ পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল।

গেরিলা যুদ্ধের নীতি হল, শত্রুপক্ষ আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে আসলে তার সাথে সরাসরি মোকাবেলায় অবতীর্ণ না হওয়া। নিয়ম হল, তখন নীরবে লুকিয়ে থাকা এবং সুযোগমত শত্রুপক্ষের অসতর্ক মুহূর্তে তাদের কুপোকাত করা। তাই আমরা সৈন্যদের বেষ্টনী থেকে বের হয়ে বাইরে নিরাপদ স্থানে কেটে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এ পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনজন মুজাহিদ সৈন্যদের উপর বিরামহীনভাবে ফায়ার করতে থাকে। ভারতীয় সৈন্যরা তাদের মোকাবেলায় ব্যস্ত হলে এ সুযোগে আমরা বেষ্টনী থেকে বের হতে থাকি। কিন্তু তারা আমাদেরকে দেখেও পজিশন ছেড়ে আমাদের পথ রুদ্ধ করার সাহস করল না। গুলী-বৃষ্টির মাঝে মুজাহিদরা বেষ্টনী ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে। বেশ দূরত্বে এসে আমরা পেছন থেকে সৈন্যদের উপর ফায়ার শুরু করলাম। এ সুযোগে ক্রোলিং গ্রুপের তিন মুজাহিদও বেষ্টনী ভেঙ্গে আমাদের সাথে যোগ দেয়।

এবার শুরু হয় সৈন্যদের সাথে লুকোচুরি খেলা। সৈন্যরা আমাদের পিছু ধাওয়া করে আর আমরা লুকিয়ে তাদের উপর ফায়ার করতে থাকি। মুজাহিদরা এ ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে সৈন্যদের উপর গুলী চালায় আর চলে যায় এ টিলা হতে অন্য টিলায়।

এ এলাকা ছিল আমাদের সাথীদের নখদর্পণে। সৈন্যরা খুব সতর্ক হয়ে আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমরাও খুব সাবধানে তাদের উপর ফায়ার করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিলাম।

আমাদের ধাওয়া করার ব্যাপারে সম্ভবতঃ সৈন্যদের প্রতি কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই খুব দৃঢ়পদে চারঘন্টা যাবৎ আমাদের পিছু নেয়। এ সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন সৈন্য আমাদের গুলীতে নিহত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর শোকর, আমাদের কোন সাথীর গায়ে একটু আঁচড়ও লাগেনি। তিনি আমাদের তাঁর আপন মদদের ছায়ায় আশ্রয় দেন। আমরা স্বল্পসংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়।

জম্মুর পথে

ইসলামাবাদের মিশন শেষে আহসান ভাইসহ আমাদের এ কাফেলা জম্মুর 'আধমপুর' শহরের দিকে অগ্রসর হয়। জম্মুর মুজাহিদদের সুসংগঠিত করার কাজ এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। তাদেরকে আরও বেগবান, আরও শক্তিশালী কার জন্যে ওখানকার মুজাহিদদের সাথে সাক্ষাৎ করা খুবই জরুরী।

পথ অত্যন্ত দুর্গম। ঘন জঙ্গল, বরফঢাকা দীর্ঘ পথ আর নদী পেরোতে হবে। উপরন্তু ইন্ডিয়ান চর ও হিন্দুদের খপ্পরে পড়ার সমূহ আশঙ্কাও রয়েছে। চলতে চলতে আমরা এক পাহাড়ী রাখালের বস্তীতে পৌঁছলাম। তারা আমাদের লিপ্টন চায়ের আমন্ত্রণ করে। আমরা তাদের দাওয়াত সানন্দে গ্রহণ করলাম।

কাশ্মীরে লিপ্টন চা বলতে সাধারণতঃ মিষ্টি চা বুঝায়। আরেকটা হল নুন চা। চা পান করায় শরীর সতেজ হল। আবার দ্রুত পথ চলতে লাগলাম।

একটু পরে পথে এক প্রবল স্রোতস্বিনী নদী বাঁধ সাধল। নদীর পানি বরফের ন্যায় ঠান্ডা আর এত খরস্রোতা যে, পার হওয়া ভারী মুশকিল। কিন্তু আল্লাহর পথের অকুতোভয় মুজাহিদদের সামনে এ বাধা অতি তুচ্ছ বই কি। স্রোতের ধাক্কায় ভেসে যাওয়ার ভয়ে সবাই একে অন্যের হাত ধরে নদীতে নেমে পড়লাম। পানি এত ঠান্ডা যে, তাতে নামতেই মনে হল, কে যেন হাটু পর্যন্ত পা কেটে দিয়েছে। আরো সামনে গিয়ে বুঝলাম, নদী খুব গভীর। পানি গলা পর্যন্ত ঠেকেছে।

প্রচন্ড স্রোত আমাদের পা উপড়ে দিচ্ছিল বারবার। তবুও অসীম সাহস নিয়ে কাফেলা সামনে এগিয়ে চলছে। আল্লাহ আল্লাহ করে কোনভাবে পার হলাম। ঠান্ডায় সকলের শরীর অবশ হয়ে গেছে। অপর পাড়ে গিয়ে অর্ধ অচেতন অবস্থায় সবাই শুয়ে পড়ি। অনেকক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর আমরা আবার অগ্রসর হতে থাকি।

এদিকে আহসান ভাই বিশেষ কারণে জম্মুর প্রোগ্রাম পিছিয়ে দিলেন। আমরা কাশ্মীরের সর্বোচ্চ পর্বতচূড়া 'কুল হিন্দের' পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এর উচ্চতা প্রায় পনের হাজার ফিট।

এবার আমাদের গন্তব্য বুডগ্রাম শহর। দুর্গম, কঠিন পথ পেরিয়ে আমরা যখন গন্তব্যে পৌঁছি, তখন রাত হয়ে গেছে। খানা খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি।

এরপর ভোরেই এক গোপন স্থানে পৌছলাম। সেখানে মুজাহিদদের এক গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলছিল।

সামরিক উপদেষ্টার ভূমিকায়

এতদিন আমরা শুধু অপারেশনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। নিজেদের অবস্থান আর দুশমনের ঘাঁটির খবর নেয়া, রাস্তাঘাট আর মৌসুমের হাল-হাকীকত জানা হচ্ছিল এতদিন। আলহামদুলিল্লাহ-এ ক'মাসে কাশ্মীরের প্রত্যন্ত অঞ্চল, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, মুজাহিদ এবং কমাণ্ডারদের সাথে পরিচয়পর্ব পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়।

এ মিটিংয়ে বিশিষ্ট কমাণ্ডারগণ উপস্থিত হন। সামরিক উপদেষ্টা পরিষদ গঠনসহ আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমাকে উক্ত পরিষদের নায়েব-উপদেষ্টার দায়িত্ব দেয়া হয়। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদনের যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু আমীরের প্রতি ভালবাসা ও তার আনুগত্যের সামনে নিজের মতামত ব্যক্ত করা থেকে বিরত রইলাম। এ পরিষদের দায়িত্ব হল গোটা কাশ্মীরের মুজাহিদদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন, তাদের আরো তৎপর করে তোলা, আক্রমণ রচনায় সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের সমস্যা সমূহের সমাধান করা।

আমি এ দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে হাজারো চেষ্টা করলাম। কারণ, কাশ্মীরে আমার চেয়ে উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সমরবিদ অসংখ্য মুজাহিদ রয়েছেন। এরা বর্হিদেশ থেকে আগত প্রতিটি মুজাহিদের চেয়ে কম অভিজ্ঞ নন। অথচ, আফগান জিহাদে দেড় বছর কাটানো ছাড়া আর কোন অভিজ্ঞতা আমার নেই। বড় কোন আক্রমণে অংশ নেয়ার সুযোগও আমার হয়নি। বাস্তবেই আমি অযোগ্য। পাথেয় শুধু আল্লাহর মদদ, আর শক্তি হল, জিহাদের আবেগ আর শাহাদাতের তামান্না।

আধুনিক বিশ্বের অভিজ্ঞ সমরকুশলীরা শুনে বিস্মিত হবেন যে, কাশ্মীর জিহাদে বিগ্রেডিয়ার আর মেজর জেনারেলদের মধ্যে মাত্র বিশ বছর বয়সের তরুণরাও রয়েছেন।

পরদিনই আমি কাজ শুরু করে দিলাম। এখন অন্য কোথাও যাবার বদলে বডগাম এলাকায় ট্রেনিংয়ের কাজ শুরু করতে হবে। এখানে ঐ সব তরুণদের ট্রেনিং দেয়া হবে, যাদের সীমান্ত পেরিয়ে ট্রেনিংয়ের জন্যে আফগানিস্তানে যাওয়া দুষ্কর। অত্যন্ত সতর্ক হয়ে পা রাখতে হবে। কারণ, স্থানে স্থানে সৈন্যদের ক্যাম্প রয়েছে। তাদের চোখ এড়িয়ে ট্রেনিং চালাতে হবে।

তিনদিনের মধ্যেই পঞ্চাশজন তরুণ একত্রিক হল। ট্রেনিং সেন্টারের জন্যে ঘন জঙ্গলের ভিতর এক প্রশস্ত মাঠ তৈরী করা হল। সব সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করার পর সবাই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে যায়। সব সাথী

একত্রিত হওয়ার পর তাদের উদ্দেশে প্রাথমিক কিছু আলোচনা করতে গিয়ে ট্রেনিংয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত করালাম। কারো আবেগের কমতি নেই। সবাই বীরত্ব ও হিম্মতে প্রদীপ্ত। শহীদী তামান্নায় সবাই উদ্দীপ্ত। থাকার জন্যে একটা অস্থায়ী ঘর নির্মাণ করা হল। এ ঘরের খোঁজ পাওয়া সৈন্যদের জন্যে অত্যন্ত দুষ্কর।

ট্রেনিং শুরু হল। খুব ভোরে উঠে ঠান্ডা পানিতে ওযু করা। এরপর জামাতের সাথে ফজর নামাজ আদায়ের পর 'দরসে কুরআন'। তার পরে ব্যায়ামের কসরত। এরপর শুরু হয় সামরিক প্রশিক্ষণ। চলে যোহর পর্যন্ত। দিনের বেলা সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন ইসলামী কিতাবাদীও পাঠ করে শুনান হত।

ট্রেনিংপ্রাপ্তদের পরীক্ষা

পনের দিনেই ট্রেনিং সমাপ্ত করা হয়। বাহ্যতঃ এতটুকু সময় খুবই অল্প। কিন্তু ট্রেনিংয়ের ফলাফল সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম। তথাপি সম্মুখসমরে ট্রেনিংপ্রাপ্ত তরুণদের পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এর জন্যে আমাদের বেশী দূরে যেতে হল না। সৌভাগ্যবশতঃ এ জঙ্গলের অদূরেই একটা সড়ক রয়েছে, যা সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছে। সীমান্তের সেনাঘাঁটির রসদ এ রাস্তা দিয়ে আনা নেয়া হয়। আমরা সেই রসদ গাড়ীতে হামলার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আক্রমণের আগে আমি একদল মুজাহিদ নিয়ে সড়ক পর্যবেক্ষণ করতে গেলাম। সড়কটা কাটা এবং সংকীর্ণ। ছোট ছোট পাহাড় ও টিলার মাঝ দিয়ে একে বেঁকে এগিয়ে জঙ্গলে পড়েছে। জঙ্গলের পর বহু দূর পর্যন্ত সমতলভূমি। সমতলভূমি পেরুলেই সীমান্ত রেখা। আক্রমণের জন্যে আমরা আমাদের সুবিধামত একটা স্থান পর্যবেক্ষণ শেষে ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

রাতে পুনরায় পর্ববেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে চলে যাই। সড়কের এক স্থানে গর্ত খুঁড়ে তাতে নিজেদের তৈরী মাইন স্থাপন করলাম। এরপর মাইনের সাথে তার জয়েন্ট করে তারের দ্বিতীয় মাথা নিয়ে রাখলাম জঙ্গলের দু'শ মিটার ভেতরে। এটা এ্যাকশনের প্রথম পর্ব। কোন গাড়ী মাইন অতিক্রম করার সময় তারে ব্যাটারী সংযোগ করে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে মাত্র। মাইন পুঁতে রাস্তাটা আগের ন্যায় সমান করে দেয়া হল। এখানে কোন বিপদ আছে, তা সন্দেহ করার কোন নিশানা রাখা হল না। এরূপ ভাববারও কোন অবকাশ ছিল না।

আমাদের হিসাব মতে পরদিনই রসদ যাওয়ার কথা। তাই রাতেই সব প্রস্তুতি সমাপ্ত করি। মুজাহিদদেরকে কয়েক গ্রুপে ভাগ করা হল ঃ (১) এ্যাকশন পার্টি– যারা শত্রুর উপর সরাসরি আক্রমণ করবে। (২) কোরেং পার্টি– এদের দায়িত্ব হল এ্যাকশন পার্টিকে সহজে পিছু হটার পথ করে দেয়া। (৩) সিগন্যাল

পার্টি– এদের কাজ শত্রুর গতিবিধি ও আগমনের সংবাদ দেয়া। বাকী দুই গ্রুপের নাম হল রোডব্লক গ্রুপ। এদের কাজ এ্যাকশন পয়েন্ট (হামলা কেন্দ্র)-এর দু'দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। মুজাহিদদের হাতে আক্রান্ত শত্রুকে কোনরূপ সাহায্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত রাখা। রোডব্লক গ্রুপ এ্যাকশন পয়েন্টের দু'দিকে এক কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থান নেয়।

ভোরে ফজর নামাযের পর সবাই অনুনয়-বিনয় করে আল্লাহ্ পাকের নিকট মদদ ও নুসরত কামনা করি। এরপর আমি এ্যাকশন গ্রুপের ২৬ জন মুজাহিদ নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলাম। অন্যান্য গ্রুপও নিজ নিজ স্থানে পৌঁছে গেল। সিগন্যাল পার্টি এমন সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল যে, তারা এবং এ্যাকশন পার্টি উভয়ে পরস্পরকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল।

আমরা অধীর হয়ে সিগন্যাল পার্টির দিকে তাকিয়ে রইলাম। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। সিগন্যাল পার্টির রসদগাড়ী আসার সংকেতে সতর্ক হলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ীর বহর দৃষ্টিগোচর হল।

গাড়ির বহর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। রসদ বহরের প্রথম গাড়ীটা আস্তে করে মাইনের উপর উঠে এসেছে। এক-দুই-তিন, তার-বেটারীর সংযোগ, অমনি প্রচন্ড বিস্ফোরণ। গাড়ীটা সৈন্যসহ শূন্যে উঠে গেল। মহাবিপদ দেখে পিছনের গাড়ীগুলো থেমে যায়। তাদের সম্বিৎ পাওয়ার আগেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৬ জন মুজাহিদের ২৬টা ক্লাশিনকোভ এক সাথে গর্জে উঠে।

তবে কয়েক সেকেন্ড পর আমরা ফায়ার বন্ধ করে দিলাম। যাতে সৈন্যরা মনে করে, মুজাহিদরা পালিয়ে গেছে। ফায়ারিং বন্ধ হতেই সৈন্যরা গাড়ী থেকে বেরিয়ে আড়াল নেয়ার জন্যে দৌঁড় দেয়। আমরা তাদের এ ভুল পদক্ষেপেরই অপেক্ষায় ছিলাম। মুজাহিদদের ক্লাশিনকোভগুলো আবার গর্জে উঠে। সাথে সাথে কিছু সৈন্য মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আনুমানিক আড়াই মিনিট পর আমরা ফায়ার বন্ধ করলাম, এরপর তারা কি পদক্ষেপ নেয় তা দেখার জন্য। তারা কোন প্রতিরোধই করল না। বেঁচে যাওয়া সৈন্যরা একে অন্যকে অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়া শুরু করে। আহতরা 'হায় রাম' 'হায় মাতা' বলে চীৎকার জুড়ে দেয়।

তাদের মত এরূপ আর্তচীৎকার বর্তমান কাশ্মীরের নিত্যদিনের দৃশ্য। পৃথিবীতে সবচেয়ে ভীরু সেনাদল হল হিন্দুরা। এ কথা সত্য যে, ভীরু জাতি কুটিলমনা হয়ে থাকে। নিরস্ত্র জনতাকে হামলার সময় এরা নেকড়ের চেয়েও হিংস্র হতে পারে।

তিন মিনিটের ভেতর এ্যাকশন শেষ করে পিছনে সরে আসার প্রোগাম ছিল। তিন মিনিট শেষ হতেই কোরেং পার্টি ফায়ার শুরু করে। আমরা পিছু হটে

আসি। আমরা পিছু হটে আক্রমণ অব্যাহত রাখলে সব কয়টি সৈন্য নিহত হত, হাতে প্রচুর গনীমতও আসত। কিন্তু এ সব করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা অপারেশন শেষ করে নির্দিষ্ট এক স্থানে পৌছে গেলাম।

আমাদের পৌছার পরই বাকী সব গ্রুপও পৌছে গেল। আল্লাহর রহমতে আমাদের একজন সাথীও আহত হয়নি। আমি নিশ্চিত হলাম, এ তরুণ মুজাহিদরা যে কোন যুদ্ধে জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে, সে সাহস এদের আছে।

আমার ধারণা ছিল, এ এ্যাকশনের পর এ এলাকায় সৈন্যদের ধরপাকড় বৃদ্ধি পাবে। তাই আগেই এ স্থান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। ঐ দিনই আমাদের অস্থায়ী ট্রেনিং সেন্টার এর অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়া হয়।

বডগামের ট্রেনিং সমাপ্ত হওয়ার পর আমার পরবর্তী মনযিল ছিল ইসলামাবাদ। ভবিষ্যতে মুজাহিদদেরকে এ্যাকশন প্ল্যান দেয়ার জন্যে ঝটিকা সফর শুরু হল। কিন্তু সবখাবেই আমি এই বেদনাভরা কণ্ঠ শুনতে পেলাম, 'আমাদের অভাবটা জনসংখ্যার নয়, অভাব অস্ত্রের।'

পরিস্থিতি এমন যে, অনেক মুজাহিদের নিকট ক্লাশিনকোভও নেই। কারো ক্লাশিনকোভ আছে কিন্তু গুলী নেই। কারো মুখে এ কথা শুনা যায়নি, আমরা ক্ষুধার্ত, আমরা বস্ত্রহীন। অথচ থাকা-খাওয়ার সমস্যাও তাদের প্রকট। কিন্তু সেদিকে তাদের ভ্রুক্ষেপ কম। তাদের সমস্যা একটিই, ক্লাশিনকোভ আর গুলী।

আমি তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, বন্ধুরা, আল্লাহর উপর ভরসা দৃঢ় কর। তাঁরই আশ্রয়ে এই জিহাদের সূচনা, অগ্রযাত্রা এবং সফলতা। আমাদের সমস্যার সমাধান করবেন তিনিই। সৈন্যদের থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ওই অস্ত্র দিয়েই তাদেরকে ঘায়েল করতে হবে। আল্লাহ্‌র রহমতে এ পদক্ষেপ ও পরামর্শ খুবই সফল হয়।

জনাব আহসান ডারের সঙ্গে আমার বিভিন্ন এলাকার মুজাহিদ ও সাধারণ জনগণের সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণের এক পর্যায়ে পালওয়ামা নামক গ্রামে পৌছি। এখানে এক হিন্দু পন্ডিতের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ হয়। গ্রামবাসী ও স্থানীয় মুজাহিদরা আগেই আমাদের আসার সংবাদ দিয়েছিল। ফলে পথেই বহু লোক আমাদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। গ্রামের নিকটে পৌছতেই আর এক হিন্দু পণ্ডিত দৌড়ে আমাদের দিকে আসে। নিকটে আসলে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি, দৌড়াচ্ছেন কেন?'

উত্তরে বলল, 'আজকে আমার ছেলের বিবাহ। তাই আপনাদেরকে বিবাহ অনুষ্ঠানে নিতে এসেছি।'

একজন হিন্দুর এরূপ ব্যবহারে আমি বিস্মিত হলাম। আমরা ব্যস্ততা দেখিয়ে বললাম, আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেই হল। স্থানীয় মুজাহিদরা তার সম্পর্কে বলল যে, তিনি কোন সন্দেহজনক ব্যক্তি নন।

হিন্দু পণ্ডিত আমাদের সামনে রকমারী খাদ্য পরিবেশন করেন। যে খাবারের ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস হল যে, এটা হালাল, আমরা শুধু সেগুলোই গ্রহণ করলাম। এক ফাঁকে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি মুজাহিদের ভয়ে এ নিমন্ত্রণ করছেন? বেশীর ভাগ হিন্দুই তো কাশ্মীর ছেড়ে জম্মু চলে গেছে। আর আপনি এখানে রয়ে গেলেন কেন?

তিনি বললেন, 'প্রথমে ভয় ছিল। সরকার আমাদের জানায় যে, মুসলিম উগ্রবাদীরা তোমাদের হত্যা করবে। ওরা খুব অত্যাচারী। তাই কাশ্মীর ছেড়ে চলে যাও। আমার আত্মীয়-স্বজন সবাই এ ভয়ে কাশ্মীর থেকে পালিয়ে যায়। আমি কিছু সমস্যার কারণে যেতে পারিনি। কয়েকদিন পর মুজাহিদরা এ গ্রাম দখল করে নেয়। তারা আমার নিরাপত্তা দানের সাথে সাথে পালিয়ে যাওয়া হিন্দুদের সকল সম্পত্তি হেফাযতের দায়িত্বও গ্রহণ করে। এখন আমি নির্ভয়ে বসবাস করছি। এখন আগের চেয়ে বেশী নিরাপত্তা বোধ করছি। পক্ষান্তরে, মুজাহিদদের ভয়ে পালিয়ে যাওয়া হিন্দুদের সহায় সম্পত্তি জম্মুতে ভারতীয় সেনাক্যাম্পে ভাগ বাটোয়ারা হচ্ছে।'

আমি তাকে বললাম, কিন্তু পণ্ডিতজী! আপনার ভারত সরকার কি করছে, তা কি দেখছেন?

এক পর্যায় পণ্ডিত মশাই খুব আবেগাপ্লুত হয়ে বলে উঠলেন, 'ভারত আর তার সৈন্যদের সাথে এখন আমাদের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। আমাদের সহমর্মিতা আর সহযোগিতা সব মুজাহিদদের সাথে। অস্ত্রধারী বীর যুবকদের জন্যে আমাদের দরজা উন্মুক্ত। মুজাহিদদের চরিত্র-মাধুর্যে আমরা মুগ্ধ।'

আমি তাকে কিছুটা অপ্রকৃতস্ত করে বললাম, এ সব বলছেন জীবনের ভয়ে।

'ভগবানের দোহাই, যা কিছু বলেছি সবটাই আমার মনের কথা, এটাই বাস্তব এবং সত্য। আপনি স্থানীয় মুসলমানদের জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

বাস্তবতা হল, ভারতীয় উৎপীড়ন সত্ত্বেও মুজাহিদরা কঠোরভাবে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলছেন। তারা কেবল হিন্দুদের মাথা গোজার ঠাঁই নয়, পূর্ণ হেফাজতের দায়িত্বও কাঁধে নিয়েছেন। কাশ্মীরের সর্বত্রই আমি এ চিত্র দেখেছি।

আবার জম্মুর পথে

পুনরায় ইসলামাবাদ পৌঁছলাম। ভাই আহসান ডার আমাকে এবং ওহীদ শেখকে বলল, আমার সাথে বানেহাল চল।

বানেহাল শহরে কয়েকদিন আগে মুজাহিদরা ভারতীয় সেনাদের যোগাযোগ কেন্দ্রে প্রচণ্ড হামলা চালিয়েছিল, যার ফলে কাশ্মীর বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে জম্মুর গত প্রোগ্রাম সফল হয়নি। তাই এবার জম্মু যাওয়ার সুসংবাদ শুনে সব ক্লান্তি নিমেষে মিলিয়ে যায়।

আহসান ডারকে বললাম, জম্মু গমনকারী এ কাফেলায় আমরা বিশজন সাথী। অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সড়ক পথে যাওয়াটা নিরাপদ নয়।

অবশেষে পাহাড়-জঙ্গল, নদী-নালা পেরিয়েই আমরা চলতে লাগলাম।

পরদিন রাতের অন্ধকারে আমরা বানেহাল পৌঁছে ক্লান্ত শরীর নিয়ে শুয়ে পড়লাম। সুমধুর আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আযান ধ্বনিতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। ক্লান্ত মুজাহিদরা উঠে বসে। ঘুম আর হীম শীতল পানি কোনটাই মুজাহিদকে নামাজ হতে বিরত রাখতে পারে না। ঐক্য ও সংহতির সুন্দরতম বিকাশ একমাত্র আল্লাহর সামনে নত মস্তকে দাঁড়ানোর মধ্যেই ঘটে। নামায আল্লাহর সাথে বান্দার সেতুবন্ধন। এ বন্ধন সুদৃঢ় হলেই মুজাহিদদের প্রতি আল্লাহর নুসরত নেমে আসে। এ বন্ধনই প্রচণ্ড ক্ষুৎপিপাসা সত্ত্বেও আমাদেরকে সদা কর্মতৎপর করে রাখে। এ বন্ধনই মর্টার সেলের অমানবিক নিপীড়নও অম্লান বদনে সয়ে যাওয়ার শক্তি যোগায় আল্লাহর সৈনিকদের।

নামায শেষ হতেই দলে দলে মুজাহিদ আসতে থাকে। মিটিংয়ে সকলের একটাই দাবী, আমাদের এ্যাকশন শুরু করার অনুমতি দিন। আহসান ভাই খুব কষ্টে তাদের বুঝালেন। জম্মুর তৎপরতা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। তাই মজবুত নেটওয়ার্ক তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এ্যাকশন হতে বিরত থাকতে হবে। তাদের দায়িত্ব দেয়া হল, গ্রামে গ্রামে জনমনে জিহাদ ও আজাদীর অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করার। আপাততঃ এটাই আপনাদের কাজ।

মহা-প্রলয়ের মাঝেও সুখ-নিদ্রা

ফিরতি পথে পারওয়ামা জিলার এক গ্রামে পৌছলাম। রাত হয়ে যাওয়ায় এ গ্রামে ঘুমিয়ে পড়লাম। কাফেলায় আমার বন্ধু শওকত ভাইও ছিল। একটানা দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি; তাই বিছানায় যেতেই ঘুমিয়ে পড়ি। সম্ভবতঃ রাত তিনটা হবে। কেউ আমাকে ঝাকি দিয়ে জাগানোর চেষ্টা করল। কিন্তু আমি পার্শ্ব বদল করে আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

আমি এখানে গভীর ঘুমে অচেতন আর বাইরে ঘটে যাচ্ছে মহাপ্রলয়। সৈন্যরা আমাদের রাতের গোপন মিটিংয়ের সংবাদ পেয়েছিল। বহু বিশিষ্ট মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ছিল দ্বিতীয় সারির অর্ধশতাধিক মুজাহিদ। এরূপ মোক্ষম সুযোগটি সৈন্যরা লুফে নিতে চাইল। মাঝরাতে

ইসরাইলী ইন্টেলিজেন্স মোসাদের হাতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ভারতীয় ব্লাক ক্যাট (কালো বিড়াল) সারা গ্রাম ঘেরাও করে ফেলে। বাইরে ক্লাশিনকোভ আর রকেট-লাঞ্চারের প্রচণ্ড গোলাগুলী হচ্ছে। আর আমি তখনও ঘুমে অচেতন।

ব্ল্যাক ক্যাট সৈন্যদের সাথে পাহারারত মুজাহিদদের প্রথম সংঘর্ষ হয়। একজন মুজাহিদ ফাঁক পেয়ে দৌড়ে এসে বিশ্রামরত মুজাহিদদের সংবাদ দেন যে, ভারতীয় সেনারা চারিদিক হতে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। তাই যে কোন ভাবে হোক বেষ্টনী ভেঙ্গে আমরা যেন বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। সংবাদ পেয়ে সকলের হুড়মুড় করে ঘুম থেকে উঠে পড়ে। আমি ভিন্ন কামরায় থাকাতে তারা আমাকে জাগাতে পারল না। বাড়ীর মালিকও আমাকে জাগানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এত গভীর ঘুমে ডুবে গিয়েছিলাম যে, গোলাগুলীর প্রচণ্ড শব্দও কানে যাচ্ছিল না।

আমার সাথী মুজাহিদরা সংঘর্ষের ফাঁকে ফাঁকে ব্ল্যাক ক্যাটের ঘেরাও ভেঙ্গে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন। ঘেরাওয়ের বাইরে গিয়ে সাথীদের গণনা করার পর খবর হয় যে, শামশীর খান তো বেরুতে পারেনি। বাড়ীর মালিক তাদের বলল, 'আমি তো তাকে জাগিয়ে হামলার সংবাদ দিয়েছিলাম। সে এখনও কেন আসছে না।'

ব্ল্যাক ক্যাটরা পা পা করে ওই ঘরের দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে আমি অচেতনভাবে ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি পেছনে পড়ে যাওয়ায় সবাই শঙ্কিত হন। শওকত ভাই শঙ্কিত হন সবচেয়ে বেশী। তিনি আহসান ডারকে বললেন, 'আমি ঐ ঘরে গিয়ে শামশীর ভাইকে নিয়ে তবে ফিরব।'

আহসান ডার বলল, 'পাগল হলে নাকি? শামশীর তো এতক্ষণে শহীদ হয়ে গেছেন। আর না হয় কমাণ্ডোর হাতে বন্দী অবস্থায় রয়েছে। এখন গিয়ে কোন লাভ নেই, সারা গ্রাম কমাণ্ডোদের দখলে। এর ভিতরে তাদের বেস্টনী ভেঙ্গে মুজাহিদরা বের হয়ে এসেছেন। পুনরায় তাদের ফাঁকি দিয়ে যাওয়া আবার ফিরে আসা অসম্ভব।

আহসান ডার শওকত ভাইকে ভিতরে যেতে নিষেধ করে। কমাণ্ডার ইন চীফের এ কথা শুনেও শওকত ভাই বলল, 'নিশ্চয়ই আপনি আমাদের চীফ কমাণ্ডার, আপনার আদেশ পালন করা আমাদের কর্তব্য। তবে আপনিই তো আমাকে শামশীর ভাইয়ের গার্ডের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাই তাঁর হেফাজত এবং শত্রুর ঘেরাও থেকে তাকে নিয়ে আসার দায়িত্বও আমার। জীবনের বিনিময়ে হলেও আমি এ কর্তব্য পালন করতে চাই। আপনি আমাকে বাঁধা দিবেন না। আমি যাবই এবং শামশীর ভাইকে নিয়েই তবে ফিরব।'

অন্যরাও শওকত ভাইকে বুঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। সকলের বাধা উপেক্ষা করে ক্লাশিনকোভ হাতে গ্রামের দিকে চললেন।

তিনি ব্ল্যাক ক্যাট কমান্ডোর দুর্ভেদ্য বেষ্টনী ভেঙ্গে তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমার কক্ষে পৌছলেন। ফায়ারের প্রচন্ড শব্দ তখনও আমার ঘুম ভাঙ্গাতে পারেনি। আর শওকত ভাই 'শামশীর ভাই!' বলে মৃদু স্বরে ডাকতেই আমি জেগে উঠি। এটা সম্ভবতঃ শওকত ভাইয়ের ভালবাসা ও হৃদ্যতারই আকর্ষণ।

আমি জেগে উঠে বেরিয়ে আসলাম। তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'শামশীর ভাই! কি মহাবিপদ ডেকে আনলেন আপনি, কমাণ্ডোরা ঘেরাও করে আছে। আর আপনি ঘুমোচ্ছেন। সবাই তো চলে গেছে। জলদী করুন, কমাণ্ডোরা এক্ষুণি ঘরে ঢুকবে।'

আমি মনে করলাম, হয়ত কোন সাধারণ ক্রেক ডাউন হবে। সহজেই বেরিয়ে পড়তে পারব। বললাম, আপনাকে এত পেরেশান দেখাচ্ছে কেন?

শওকত ভাই বলল, 'ভাই! ঘটনা মারাত্মক। এরা সাধারণ আর্মী নয়– ব্ল্যাক ক্যাট। তাও হাজার হাজার। জলদী বের হয়ে যান।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরই অবস্থার ভয়াবহতা বুঝতে পারলাম। কমাণ্ডোরা বেধড়ক ফায়ার করে চলছে। মুজাহিদদের বেরিয়ে যাওয়ার কোন খবর এখনও তারা পায়নি। তারা কয়েকশ মিটার দূর থেকে সোজা আমাদের দিকেই গুলী ছুড়ছিল। ঘরের অদূরেই জঙ্গল ও বাগান। শওকত ভাই সেদিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আপনি ওদিকে চলে যান, আমি অন্য দিক হতে কমাণ্ডোদের উপর ফায়ার করি।'

আমি বললাম, তুমি একা ওদিকে যাবে কেন, বরং আমরা একত্রেই যাই।

আমার কথা শুনে শওকত রেগে বলল, 'বুঝছেন না কেন, চুপচাপ আমার কথা শুনুন। নাকের ডগায় দুশমন দাঁড়িয়ে আছে। আর আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন। প্রতি মুহূর্তে বেষ্টনী সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে।'

আর কোন কথা না বলে তখনই দৌড়ে বাগানে ঢুকলাম। শওকত ভাই এক দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনটি ফায়ার করল। এটা ছিল আমার প্রতি সাঙ্কেতিক নির্দেশ। আমি দৌড়ে গাছের আড়ালে পৌছে গেলাম। তখনও আমার দিকে গুলী আসছিল। পাঁচ মিনিট কমাণ্ডোদের দিকে ফায়ার করলাম, যাতে এ ফাঁকে শওকত ভাই বেরিয়ে আসতে পারে। পনের মিনিট অপেক্ষার পর শওকত ভাই আসল না দেখে আমি ক্ষেতের মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকি।

এক মসজিদের ইমামের সাথে সাক্ষাৎ

অনেক পথ চলার পরও সাথীদের কারো সাক্ষাৎ পেলাম না। আমাদের দু'জনের অপেক্ষা করে নিরাপদ স্থানে চলে গেছে তারা। কোন দিকে যাচ্ছি তার ঠিক নেই। ক্ষণিক পর ভোরের আলো ফুটে ওঠে। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি। পা

চলছিল না। তার উপর উভয় পা ক্ষত-বিক্ষত। কারণ, কে যেন ভুলে আমার জুতা নিয়ে গেছে।

সূর্য ওঠার আগেই এক গ্রামে পৌঁছি। একটি মসজিদ দেখে আমি দাঁড়ালাম। শশ্রুমণ্ডিত ইমাম সাহেব বাচ্চাদের কুরআন পড়াচ্ছেন। মসজিদে ঢুকে তাঁকে মুজাহিদদের সংবাদ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি প্রথমে আমার দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

বললাম, আমি বহিরাগত মুজাহিদ। মিলিটারী আমার পিছু নিয়েছে। আমার সাথী মুজাহিদদেরও সন্ধান পাচ্ছি না।

আমার রক্তাক্ত পায়ের উপর দৃষ্টি পড়তেই তার মনের ভাব পাল্টে গেল। সোহাগমাখা কণ্ঠে বললেন, 'বেটা! তোমার জুতা কোথায়?'

'এক মুজাহিদ সাথী ভুলে আমার জুতা পরে নিয়েছেন।'

এ কথা শুনে তিনি নিজের জুতা দু'টি খুলে আমাকে পরিয়ে দিলেন। এরপর বললেন, 'মুজাহিদরা এ পথেই গিয়েছে। সামনে একটা নালা দেখবে, তা পার হয়ে হাঁটলে তুমি মুজাহিদদের খোঁজ পাবে।'

'তার কথামত অগ্রসর হলাম। নালা পার হয়ে দেখি, আমার মুজাহিদ সাথীরা বসে আছে। আমাকে সামনে দেখেও তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, আমি এখনও জীবিত। তারা পরস্পর বলতে লাগল, 'আহসান ভাই তো তখন শওকত ভাইকে যেতে দিতে চাচ্ছিলেন না। এখন দেখ! আমাদের বীর শওকত ভাই কিভাবে শামশীর ভাইকে দুশমনের পাঞ্জা থেকে মুক্ত করে এনেছেন।'

আমি মনে মনে ভাবছিলাম, বীর শওকত নিজেই আবার শত্রুর খপ্পরে পড়ে যাননি তো। আহসান ডার আমার পূর্ণ বিবরণ শুনে শওকত ভাইয়ের জন্য পেরেশান হয়ে পড়েন।

ব্ল্যাক ক্যাট কমান্ডোদের সাথে সম্মুখ সমরে

সামান্য অগ্রসর হতেই দেখি, 'কালো বিড়াল'রা আবার আমাদের নাকের ডগায় এসে উপস্থিত। আমি আহসান ভাইকে বললাম, 'এরা সাধারণ আর্মী নয়। অত সহজে এরা আমাদের পিছু ছাড়বে না। তাই আমাদেরকে সাধারণ গেরিলা পদ্ধতি ছেড়ে সম্মুখসমরে লড়তে হবে।'

সবাই এতে একমত হলাম। সমস্ত মুজাহিদকে দু' দু'জন করে ভাগ করে দেয়া হলে সবাই স্ব স্ব পজিশনে পৌঁছে যায়। ব্ল্যাক ক্যাট কমান্ডোরা সতর্ক পদে অগ্রসর হচ্ছিল। তারা ফায়ার শুরু করে দেয়। আমরা নীরব থাকি।

সৈন্যরা আরও খানিকটা সামনে অগ্রসর হলে তাদের অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্যে আমরা কয়েক রাউণ্ড গুলী করলাম। এরপর উভয় দিক হতে ফায়ারিং শুরু

হয়ে যায়। ব্ল্যাক ক্যাটরা মনে করেছিল, তাদের ভয়ে আমরা পজিশন ছেড়ে পালাব, তখন আমাদেরকে খতম করবে।

তারা খুব জোশের সাথে আরও অগ্রসর হলে আমাদের মাপা মাপা ব্রাশ ফায়ার তাদের অভ্যর্থনা জানায়। এতে বেশ ক'টি ব্ল্যাক ক্যাট চিতপটাং হয় এবং বাকীরা সতর্ক পদক্ষেপে পিছিয়ে যায়। তাদের ভুল ভাঙ্গে যে, প্রতিপক্ষ দুর্বল নয়।

এভাবে দু'ঘন্টা অতিবাহিত হয়। এ সময় আশপাশের সব এলাকায় দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, আহসান ডার ও শহীদ শেখকে ব্ল্যাক ক্যাটরা ঘেরাও করে রেখেছে। তাই যে মুজাহিদই এ সংবাদ পায়, সে দৌড়ে এসে আমাদের সাথে মিলিত হতে থাকে।

ব্ল্যাক ক্যাট কমাণ্ডোদের নিয়ে ভারত বেশী গর্বিত। এক ঘন্টা পর্যন্ত ভারতের এ গর্বের ধন সোনা মানিকেরা আমাদের বেষ্টনীতে আটকা পড়লে ফাঁক-ফোকর দিকে ইঁদুরের মত পালানোর চেষ্টা শুরু করে। কমাণ্ডোরা ওয়ারলেসের মাধ্যমে ক্যাম্পে যোগাযোগ করে জরুরী সাহায্য তলব করে। অপরদিকে আমাদের উপর নেমে আসে অদৃশ্য সাহায্য।

সেনাবহর ধ্বংস

খালিদ ভাই ও এজায ভাইসহ এক গ্রুপ মুজাহিদ রণাঙ্গনের মাইলকয়েক দূর দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তারা দেখতে পেলেন, চল্লিশটি কনভয় এক সেনাবহর রাস্তা দিয়ে আসছে। এ সেনাবহর যাচ্ছিল ব্ল্যাক ক্যাট কমাণ্ডোর সাহায্যে। ওই মুজাহিদরা দূর থেকেই তাদের আসতে দেখে ওঁত পেতে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন।

ক্লাশিনকোভ ও রকেটলাঞ্চারসহ আত্যাধুনিক অস্ত্র মুজাহিদদের হাতে ছিল। তারা পজিশন নিয়ে নেন। গাড়ী খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে, প্রতিপদে তারা মৃত্যুর পানে এগিয়ে চলছে।

সেনাবহর গুলীর রেঞ্জের আওতায় আসতেই মুজাহিদদের অস্ত্র গর্জে ওঠে। রকেটের আঘাতে বেশ কয়েকটি গাড়ীর ছাদ উড়ে যায়। তার সাথে কয়েক ডজন সৈন্যও খতম হয়। ক্ষণিক সংঘর্ষের পর বহরের সব গাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। বেঁচে যাওয়া সৈন্যরা এবার দৌড়ে পেছন দিকে ভাগতে থাকে।

ব্ল্যাক ক্যাট কমাণ্ডোরা ওয়ারলেসের মাধ্যমে এ সংবাদ পাওয়ার পর আমাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে অস্থির হয়ে পড়ে। এতক্ষণে সারা এলাকায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। স্থানে স্থানে মুজাহিদ ও কমাণ্ডোদের মাঝে প্রচণ্ড ফায়ারিং চলতে থাকে।

সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত লড়াই চলে। এ সময় আমাদের চিন্তা হল, ব্ল্যাক ক্যাটের সাহায্যার্থে আরও সৈন্য এসে পড়বে। ফলে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বন্দী বা শহীদ হবার আশঙ্কা আছে।

সিদ্ধান্ত হল, সংঘর্ষ বন্ধ করে আমরা এলাকা ছেড়ে চলে যাব। আমরা ফায়ার বন্ধ করে পেছনে সরে আসতে শুরু করলে ব্ল্যাক ক্যাট কমাণ্ডোরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তারা মৃত সৈন্যদের লাশ ফেলে ইঁদুরের চেয়েও ভীরুতার প্রমাণ দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যায়। পরে জানতে পারি যে, ব্ল্যাক ক্যাটের সাহায্যে প্রেরিত সৈন্যরা রণাঙ্গনের অদূরে অন্য এক মুজাহিদ গ্রুপের হাতে পরাজিত হয়।

হৃদয়-বিদারক সংবাদ

সন্ধ্যার সময় এক ব্যক্তি এসে এ মর্মান্তিক সংবাদ দিল যে, শওকত ভাই শহীদ হয়ে গেছেন। আমাকে বিদায় দেয়ার পর কমাণ্ডোদের সাথে সংঘর্ষের সময় ব্রাশ ফায়ারে তাঁর দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যায়। তাঁর গুলীতে নিহত তিন কমাণ্ডো সেনার লাশ তাঁর পাশেই পড়ে ছিল।

শওকত ভাইয়ের শাহাদাতের সংবাদে আমার বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু নির্ভীক মুজাহিদ আমাকে মুক্ত করে নিজে আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দিলেন! মুজাহিদরা সবাই শওকত ভাইর জন্যে ছিল পাগলপারা। আমার জন্যে তার ত্যাগ ও কুরবানী চির জীবন হৃদয়ফলকে অঙ্কিত থাকবে।

শওকত ভাইয়ের পরিবার শেখ আবু আব্দুল্লাহ্‌র 'ন্যাশনাল কনফারেন্সে'র সমর্থক। তবে জিহাদের আহবান শুনে শওকত ভাই অস্ত্র হাতে তুলে নেন। তখন তাঁর আব্বা কাশ্মীর আযাদী আন্দোলনের বিরোধী ছিল। শওকত ভাই কয়েক বার আমাকে বলেছিল, 'আমার আব্বা জিহাদের বিরোধী, তাই তাকে আমি গুলী করে মারব।'

শওকত ভাইকে দাফন করা হল। এ যুদ্ধে ওদের ১৫০ জন সৈন্য নিহত ও ৪০টি গাড়ী সমপূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। অল ইণ্ডিয়া রেডিও সরকারের প্রেস নোটের বরাতে প্রচার করে যে, এ যুদ্ধে সৈন্যদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আর আমাদের এক সাথী শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করে।

দ্বিতীয় মর্মান্তিক সংবাদ হল, যে ইমাম সাহেব আমাকে তাঁর জুতা পরিয়ে পথ দেখিয়ে সাহায্য করেছিলেন, তাকেও গুলী করে শহীদ করা হয়েছে। আমি চলে আসার পর কমাণ্ডোরা গ্রামে এসে ইমাম সাহেবকে জিজেস করে 'সন্ত্রাসীরা' এদিক দিয়ে যায়নি তো? ইমাম সাহেব 'আমি জানি না' বললে, তার উপর চরম নির্যাতন করা হয়।

এরপর ঐ নরপশুরু কুরআন পাঠকারী নিষ্পাপ শিশুদের মারতে মারতে জিজ্ঞেস করে, বল সন্ত্রাসীরা কোনদিকে গেছে? শিশুরাও বলতে অস্বীকার করে। শেষে তারা ছোট্ট একটি শিশুর চুল ধরে শূন্যে তুলে বলে, মুজাহিদরা কোনদিকে গেছে না বললে তোকে আছড়িয়ে মারব।

অসহ্য বেদনায় নীল হয়ে যায় শিশুটির ফুল-পাপড়ীর মত কোমল চেহারাখানি। প্রাণভয়ে সে বলে দেয়, এক অস্ত্রধারী এখান দিয়ে গেলে উস্তাদজী তাকে জুতা পরিয়ে দেন। এ কথা শুনে কমাণ্ডোরা ইমাম সাহেবের উপর ব্রাশ ফায়ার করে। আল্লাহর এ প্রিয় বান্দা মসজিদের চত্বরেই রক্তাক্ত বদনে লুটিয়ে পড়েন।

এ এলাকা আর নিরাপদ নয় দেখে আমরা তখনই শোপিয়া শহর রওনা দেই। পরে সৈন্যরা এসে শুধু তাদের বিধ্বস্ত গাড়ী ও মৃত সৈন্যদের লাশ ছাড়া কিছুই পায়নি।

শামসুল হক ভাই আমাকে জানালেন, 'কয়েকদিন হল, একজন পাকিস্তানী মুজাহিদ এসেছেন এবং তিনি শ্রীনগরে অবস্থান করছেন। লোকটি অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আমি তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলে বলল 'বাশারত আব্বাসী'। বাশারত আব্বাসী সম্পর্কে ইতিপূর্বে অনেক কথাই শুনেছি। তাই তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য আমার মন উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

এ সময় কাশ্মিরী মুজাহিদ ফ্রন্ট পাকিস্তানী মুজাহিদদের আগমন প্রত্যাশী ছিল। আমি সুপ্রীম কমান্ডের কাছে ব্যক্তিগতভাবে অনেকবার চিঠি লিখেছি, পাকিস্তান থেকে কাশ্মীর ফ্রন্টে লোক পাঠানোর জন্যে।

আমার চিঠি লেখার উদ্দেশ্য এ নয় যে, কাশ্মীরে মুজাহিদের সংখ্যা কম। বরং আমার উদ্দেশ্য ছিল, পাকিস্তানীদের আগমনে কাশ্মিরী মুজাহিদদের মধ্যে সাহস বৃদ্ধি পাবে তারা বুঝতে পারবে, দখলদার ভারতীয় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে শুধু আমরাই লড়াই করছি না, বহির্বিশ্বের মুসলিম ভাইয়েরাও আমাদের সাথে আছে।

বাস্তবেও দেখা গেছে, কাশ্মিরীদের সাথে কোন পাকিস্তানী মুজাহিদ থাকলে তারা দ্বিগুণ উৎসাহ ও শক্তিতে বলিয়ান হয়ে দুর্দমনীয় হামলা চালিয়েছে।

বাশারাত ভাইকে দেখার জন্যে আমি শ্রীনগর এলাম। শামসুল হক ভাইয়ের সাথে আগেই আমি শ্রীনগর আসার প্রোগাম করেছিলাম। সারাদিন গায়ের মেঠো পথে পায়ে হেঁটে সন্ধ্যায় শ্রীনগর উপকণ্ঠে পৌছলাম।

একটি গোপন আস্তানায় শামসুল হক ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাত করার কথা ছিল। সেখানে গিয়ে আমি তাকে পেলাম না। তখন তিনি অন্য এক কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি হাজির হল। তিনি আমাকে বললেন, বাশারত ভাই এর সাথে সাক্ষাত করতে হলে আপনাকে পোশাক বদল করে অস্ত্র রেখে যেতে হবে।

ভোর বেলায় আমরা গোপন স্থানে পৌঁছার জন্যে রওনা হলাম। পথে কুয়াশায় আমাদের শরীর ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। আমি আগে থেকেই প্যান্ট-শার্ট পরে ছিলাম। শামসুল হক ভাইয়ের পরনে সাফারী স্যুট। আমাদের পোশাক দেখে কেউ মুজাহিদ মনে করার সুযোগ ছিল না।

গন্তব্যে পৌঁছে দেখি, আমাদের হাতিয়ার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। তবে বাশারত ভাই এখনো সেখানে পৌঁছেননি। আগ্রহের আতিশয্যে আমি বার বার শামসুল হক ভাইকে জিজ্ঞেস করছিলাম, কি ভাই! বাশারত ভাই কখন আসবেন?

তিনি আমার কথার কোন জবাব দিচ্ছিলেন না। সময় গড়িয়ে জোহরের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। শামসুল হক ভাই আমাকে নামায পড়াতে বললেন। আমি বললাম, ফ্রন্টের আমীরের উপস্থিতিতে ইমামতি করার ধৃষ্টতা আমার নেই।

তিনি বললেন, 'শামশীর ভাই! এটা আমার নির্দেশ।'

অগত্যা আমি নামায পড়ালাম। নামাযান্তে দু'আয় আমি মুজাহিদদের অতি প্রিয় ও সর্ব পরিচিত একটি বাক্য আবৃত্তি করলাম, 'হে আল্লাহ! আমাদের ভাগ্যে মর্যাদাপূর্ণ জীবন ও শাহাদাতের মৃত্যু নসীব করুন।'

মুনাজাতের পর শামসুল হক ভাই আমার উদ্দেশে বললেন, 'আপনার কোন সাথীকে যদি আল্লাহ শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করেন, তাহলে আপনার খুশী হওয়া উচিৎ, তাই না?'

বললাম, হ্যা, কেন খুশী হব না? আমরা সবাই তো এ পথেরই যাত্রী।

আমি তাঁর কথা না বুঝেই জবাব দিয়ে বসলাম। গভীরভাবে তলিয়ে দেখিনি, শামসুল হক ভাই এ কথায় আমাকে কি বুঝাতে চাচ্ছিলেন। জিজ্ঞাসু নেত্রে তার দিকে তাকালাম। বললেন, 'শামশীর ভাই! আমরা যার সাথে সাক্ষাত করতে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এলাম, তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। বাশারত আব্বাসী শহীদ হয়েছেন।'

এ কথা শুনে আমি দুঃখে-শোকে বিহব্বল হয়ে পড়লাম। আমার ধমনিতে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল। মনের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'বাশারত ভাই! আপনি আমাদের আগে চলে গেলেন! অথচ আমার তো বহু দিন থেকে কাশ্মীর উপত্যকার পাহাড়-জঙ্গল, নদী-নালা, মাঠ-ঘাট চষে বেড়াচ্ছি। কিন্তু এ সুবর্ণ সুযোগ আমাদের হাতের মুঠোয় আসল না। আপনি এত সৌভাগ্যের অধিকারী যে, কাশ্মীর ফ্রন্টে পা রাখার সাথে সাথেই পরিতৃপ্ত হয়ে স্বর্ণশিখরে পৌঁছে গেলেন। সফর শুরু করলেন, আর সৌভাগ্যের স্বর্ণসিড়ি আপনার পা চুম্বন করল।'

শামসুল হক ভাই ভেবেছিল, বাশারত আব্বাসীর শাহাদাতে আমি ভেঙ্গে পড়ব। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই আমি নিজেকে সামলে নিয়ে নিলাম। বললাম,

এ মহান মর্যাদা যাদের পাওয়ার, তারা পেয়ে গেছে, ভাগ্যান্বেষণ-কারীদের বসে থাকার অবসর কোথায়?'

শামসুল হক ভাইকে উৎসাহিত করার জন্যে আমার মনোভাবের বিপরীতে বললাম 'আমীরে মুহতারাম! আপনাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমাদের এক বন্ধু আল্লাহর প্রিয় মনযিলে আমাদের আগে পৌঁছেছেন, আর আমরা তাঁর পেছনে যাব। কোন অগ্রগামী অশ্বারোহী যদি দ্রুত লক্ষ্য স্থলে পৌঁছে যায়, তবে তাতে দুঃখ করার কি আছে, এ তো খুশীর ব্যাপার।'

আমার এ অভিব্যক্তিতে শামসুল হক ভাই বললেন, 'বাশারত আব্বাসী শ্রীনগরে শহীদ কবরস্থানে শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন। আমাদের তাঁর কবরের গিয়ে তাকে সালাম জানানো উচিত।'

এজন্যে আমি শহীদ কবরস্থানে যাবার ব্যবস্থা করে ফেললাম। শামসুল হক ভাই আমাদের নিষেধ করে বললেন, সেখানে যাওয়া খুব ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। ভারতীয় সেনাবাহিনী সব সময় শহীদ কবরস্থান ঘিরে রাখে। তোমার সেখানে গ্রেফতার হবার আশংকা আছে। এমন ঝুঁকি না নেয়া ভাল।

আমি বার বার তাকে অনুরোধ করলে শেষ পর্যন্ত তিনি যেতে অনুমতি দিলেন।

শহীদদের কবরস্থানে

জম্মু কাশ্মীরের শহর, গঞ্জ, পল্লীতে শহীদদের হাজারো কবর ছড়িয়ে রয়েছে। এমন কোন পল্লী নেই, যার মাটি কোন মুজাহিদের দাফনে ধন্য হয়নি। শ্রীনগরের বিশাল মাঠ শহীদ মুজাহিদদের কোলে নিয়ে শুয়ে আছে নীরবে। শহীদী কাফেলায় নিত্যদিন যোগ হচ্ছে নতুন নতুন বাসিন্দা।

শহীদদের কবরস্থানে যাবার আগে একটি নিরাপদ স্থানে আমি পরিধেয় পোশাক বদলিয়ে নিলাম। গায়ে গেঁয়ো জামা আর পায়ে চপ্পল পরে আমি অতি সাধাসিধে কাশ্মিরী যুবকের বেশ ধরলাম। জামার ভিতরে ক্লাশিনকোভ লুকিয়ে নিলাম।

চারজন বৃদ্ধ ও দু'জন বালক নিয়ে নিরাপদে পৌঁছে গেলাম শহীদ কবরস্থানে। পথে ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদের কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেনি।

কবরস্থানে পৌঁছে ভাগ্যবান মুজাহিদদের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম পেশ করলাম। বিস্তৃত মাঠে সারি সারি শহীদের কবর। এরই মধ্যে আরো নতুন নতুন কবরের চিহ্ন দেখা যায়। এখানে দাফনকৃত প্রাথমিক শহীদদের অনেকের সাথেই আমার পরিচয় ছিল, ছিল গভীর সম্পর্ক। অনেকেরই নাম-পরিচয় আমি জানি না। কিন্তু এরা সবাই ছিল কাশ্মীরের মুক্তিপাগল বীর সন্তান। আযাদীর অগ্নিমশাল প্রজ্বলিত করে ওরা ঠাঁই নিয়েছে আল্লাহর প্রিয় সান্নিধ্যে।

নিযুত শহীদের কবরের পাশে আরো পাঁচ হাজার শহীদের দাফনের জন্যে জমিন উপযোগী করে রাখা হয়েছে। কবরস্থানের অদূরে একটি নাম ফলকে দৃষ্টিগোচর হল একটি বাক্য 'শহীদ মকবুল বাটের জন্যে অপেক্ষমান'।

শহীদ মকবুল বাটকে বিহার জেলখানায় গুলীবিদ্ধ করে শহীদ করার পর তাকে সেখানেই ওরা দাফন করে দিয়েছে।

আমি বাশারত আব্বাসী ভাই এর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এ পাকিস্তানী জীবনপণ সংগ্রামী নেতা স্বীয় জীবন দিয়ে নিপীড়িত কাশ্মিরী ভাই-বোনদের হৃদয়ে গড়ে নিয়েছেন নিবিড় সম্পর্ক, যা কোন স্বার্থের টানাপড়েনে ভেঙ্গে যাবার নয়। নানা রংঙের ফুলে বাশারত আব্বাসীর কবরটি ঢেকে দিয়ে কাশ্মীরের ভাই-বোনেরা তাঁর প্রতি ঢেলে দিয়েছে কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসার অর্ঘ্য। তার বুকের উপর সবুজ জমিনে চাঁদ খচিত পাকিস্তানী পতাকা।

আমি তাঁর শিয়রের পাশে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পড়ে এ মর্দে মুজাহিদ ও সাথীদের জন্যে দু'আ করলাম। আর যারা এ পথের যাত্রী, তাদের আকাঙ্খা পূরণে আল্লাহর সাহায্য চাইলাম। এরাই তো সেই কাফেলা, যারা আখেরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অভিসিক্ত হবে এবং এরাই আমাদের সোনালী পথের দিশারী। যাদের খুনরাঙা তরবারীর বদৌলতে এখনো প্রবাহমান রয়েছে ঈমান ও ইজ্জতের আবে হায়াত।

অনেকক্ষণ আমি ঠায় নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। সহযাত্রীরা আমাকে বলল, 'চলুন, এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো নিরাপদ নয়।'

তাদের সাথে স্থানীয় মুজাহিদ আস্তানায় পৌঁছালে সেখানে শ্রীনগরের জেলা কমান্ডার মূসার সাথে দেখা হল। তিনি শ্রীনগরে আযাদী আন্দোলন আরো তীব্রতর করার জন্যে একটি মিটিং করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমাকেও এ মিটিংয়ে থাকার জন্যে বললেন। আমি রাজি হলাম।

এ গোপন মিটিংয়ে শ্রীনগরের সকল প্লাটুন কমাণ্ডার, ব্যাটলিয়ন কমান্ডার, কোম্পানী কমাণ্ডার ও জেলার সহকারী কমাণ্ডাররা উপস্থিত হল। শ্রীনগরে তখন ইণ্ডিয়ান গোয়েন্দাদের জোর তৎপরতা। মুজাহিদদের গতিবিধির খবর তাদের কাছে প্রতিনিয়ত পৌঁছে যাচ্ছিল। সরকারী গোয়েন্দাদের চর আমাদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করে। কতিপয় গাদ্দারের অশুভ তৎপরতা আমাদের সব সময় শংকিত করে রাখে।

নির্ধারিত স্থানে পৌঁছানোর আগে আমরা শ্রীনগরের এক বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। আমাদের ধারণা ছিল, ইণ্ডিয়ান আর্মিদের কাছে আমাদের উপস্থিতির খবর পৌঁছালে ওরা ক্রেক ডাউন করবে।

খাওয়া সেরেই চার-পাঁচ কিলোমিটার পথ হেঁটে আমরা সামনের একটি গ্রামে হাজির হলাম। এখানেই আগামী রাতে সবার মিলিত হবার কথা।

দোতালা বাড়ীর উপরে ছিলাম আমরা আর নীচে বাড়ীওয়ালা ও তার পরিবারবর্গ। গভীর রাত পর্যন্ত আমাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হল, এক পর্যায়ে সকলেই ঘুমের ঘোরে সমুদ্রে গেলাম।

কিন্তু এরই মধ্যে ঘটে যায় বিপত্তি। ভারতীয় আর্মি আমাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে।

অবরুদ্ধ অবস্থায়

আমরা সকলে তখনও সেই ঘরে ঘুমে বিভোর। ততক্ষণে ভারতীয় সেনারা পুরো গ্রাম ঘিরে ফেলেছে। ভারতীয় সেনাদের একটি সাধারণ নিয়ম হল, মুজাহিদদের ভয়ে এরা একজনকে আটক করার উদ্দেশ্যে পুরো গ্রাম রাতের আঁধারে ঘিরে নেয় এবং সকাল পর্যন্ত চতুর্দিকে ব্যারিকেড দিয়ে রাখে। সকল মানুষের আগমন নির্গমন বন্ধ করে দেয় তারা।

ভোর বেলায় মসজিদের মাইক থেকে প্রচার করে, যদি কোন ব্যক্তি তাদের নির্দেশ অমান্য করে বেরিয়ে যেতে চায়, তাকে গুলী করে হত্যা করা হবে। এরপর ভোরের আবছা আঁধার পরিষ্কার হলে খানা তল্লাশীর মাধ্যমে মুজাহিদ ও সন্দেহভাজনদের খোঁজ করে। গ্রামের সকল নারী-পুরুষকে ভিন্নভিন্নভাবে একত্রিত করে গুপ্তচররা মুজাহিদদের সনাক্ত করার চেষ্টা করে।

আমাদের উপস্থিতি ও অবস্থান সম্পর্কে গুপ্তচরের তথ্য ছিল নির্ভুল। সঠিক তথ্যানুযায়ী এক ভারতীয় সিপাই সরাসরি আমাদের দোতলায় এসে ঢু মারে।

তখন রাত তিনটা। পায়ের শব্দ পেয়ে আমাদের এক সাথী জেগে যায়। সে চোখ মেলেই সামনে ভারতীয় সিপাহীকে দেখে রাইফেলের দিকে হাত বাড়ায়। রাইফেলে হাত লাগাতেই সিপাই দৌড়ে নীচে নেমে চীৎকার দিলে বলল, 'এখানে ১০/১২ জন সন্ত্রাসী শুয়ে আছে।'

আবু খালেদ মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে আমাদের জাগিয়ে দেয় এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলকেই অবহিত করে। সবাই অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হল। কিন্তু আমার অস্ত্র ছিল আরেকজনের কাছে জমা দেয়া। রাতে সে বাইরে চলে গিয়েছিল।

একটা হতাশায় বুকটা ভরে গেল, এভাবে অসহায় অবস্থায় বিনা মোকাবেলায় ধরা পড়ব! প্রতিশোধের স্পৃহা নিবৃত করার সুযোগ পাব না! হঠাৎ করে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

কোন মতে এখান থেকে বের হয়ে সেনাদের কাছে নিজেকে সাধারণ মানুষ হিসেবে প্রমাণ করানোর চিন্তা করলাম। আমার পরনে ছিল একটি দামী জ্যাকেট। এক পকেটে লিবারেশন ফ্রন্টের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র। এজন্যে জ্যাকেটটি খুলে অন্য একজনের হাতে দিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে নীচে নেমে এলাম। তখন আমার অন্য অস্ত্রধারী সাথীরা মোকাবেলার পরিকল্পনা করছে।

নীচের আঙিনায় কোন সৈন্য দেখতে পেলাম না। আমাদের দেখে ঐ সৈনিকের চীৎকারে সৈনিকরা বাইরে পজিশন নিয়ে প্রস্তুত, যাতে ওরা আমাদের গুলী থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। আঙিনা ছেড়ে পা রাখতেই পাঁচ-ছ'জন সিপাই আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ওরা কমাণ্ড দিল হ্যান্ডকাপ পড়তে এবং পালানোর চেষ্টা না করতে।

আমি যে নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে প্রকাশ করার চিন্তায় বেরিয়েছিলাম, সেনাদের হুঁশিয়ারী উচ্চারণে সে কথা ভুলে গিয়ে ধমকে বললাম, 'আমি বেরিয়ে যাবই।'

ধমকি দিয়ে পিছনের দিকে দৌড়ানোর চেষ্টায় যেই পা বাড়ালাম, অমনি পা পিছলে একটা খাদের মধ্যে পড়ে যাই।

টা-টা-স-স করে মাথার উপর দিয়ে কয়েকটি বন্দুকের গুলী চলে যায়। উপর থেকে মাটির দেয়াল ভেঙ্গে আমার গায়ে মাটি চাপা পড়ার উপক্রম। এটি ছিল কৃষকদের মৌসুমী পানি সেচের কূপ। এই কূপে পড়ে যাওয়ার ফলে আমার গায়ে কোন গুলী বিদ্ধ হল না। আর তখনও অন্ধকার থাকায় আমি জীবিত না মৃত এটা পরখ করার সুযোগ সৈন্যরা পায়নি। অবশ্য খাদে না পড়লে সেনাদের বুলেটে আমার শরীর চালনীর মত ঝাঁঝরা হয়ে যেত।

অনেকক্ষণ মৃতের মত নীরব থেকে ক্রোলিং করে আবার ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম। আঙিনার দিকে আসতে দেখে আমার দেহরক্ষী আব্দুল আহাদ ভাই ভারতীয় সৈন্য মনে করে আমার প্রতি দু'টি ফায়ার করে বসে। আমি চীৎকার দিয়ে বললাম, 'আব্দুল আহাদ ভাই! আমি শামশীর।'

উভয় ফায়ারই আমার মাথার উপর দিয়ে চলে যায়, আমার কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু আমার চীৎকার শুনে আব্দুল আহাদ ভাই বলল, 'আহ! শামশীর ভাই, আমি একি করলাম?'

আমি দ্রুত তার কাছে পৌঁছে বললাম, কোন অসুবিধা হয়নি, আমি বিলকুল অক্ষত।

তখন সে যেন নতুন জীবন ফিরে পেল।

সেনাবাহিনী এমন এক অবস্থার সম্মুখীন হল যে, যদি তারা মুজাহিদদের গ্রেফতার করতে ঘরের দিকে অগ্রসর হয়, তা হলে মুজাহিদদের বুলেটে তাদের জান খোয়াতে হবে। জীবনের ভয়ে ওরা ঘরের দিকে আর পা বাড়ায়নি।

এদিকে মুজাহিদ কমাণ্ডার ইন চীফ অব শ্রীনগর মূসা ভাই এর কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। আমি সাথী মুজাহিদদের বললাম, এভাবে কতক্ষণ বসে থাকবেন? চলুন বেরিয়ে যাওয়ার চিন্তা করি, এখনও অন্ধকার আছে, সকাল হয়ে গেলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে।

শ্রীনগরের প্লাটুন কমাণ্ডার বললেন, 'এই অবস্থায় বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তো বিপজ্জনক।'

আমি বললাম, ঘেরাও এর মধ্যে নিষ্ক্রিয় বসে থাকার মধ্যে তো ঝূঁকি আরো বেশী। আসুন, আমরা বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি।

কিন্তু প্লাটুন কমাণ্ডার তাতে রাজি হচ্ছিলেন না। এক পর্যায়ে আমি গম্ভীর রাগত স্বরে বললাম, আপনি নিজের সাথে অন্যদের জীবনও কেন অর্থহীন মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন?

আমি সবাইকে বললাম, 'তাড়াতাড়ি বের হয়ে পড়, না হয় সময় হাতছাড়া হয়ে যাবে। আমি তাঁর বাজু ধরে নিজের সাথে নিয়ে চললাম। অন্য সাথীরাও অনুগামী হল। ফায়ারিং এর আওয়াজে ততক্ষণে গ্রামের মানুষ ঘরে বাতি জ্বালাচ্ছে। আমরা কয়েকটি বাড়ী পেরিয়ে গ্রামের সীমানায় পৌছে দেখি, সৈন্যরা বেরিকেড দিয়ে রেখেছে। সব ঘরে আলো জ্বলে ওঠার কারণে আমরা সেনাদের চোখে পড়ে যাওয়ার আশংকা হল। আমি চীৎকার দিয়ে বললাম, 'ঘরের লাইট গুলো সব নিভিয়ে দাও, না হয় গুলী করব।'

আমি একথা বললাম অনেকটা কর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায়। কিন্তু এতে দু'টো সুবিধা হল, আমরা অন্ধকারে নিরাপত্তা পেলাম আর সৈন্যরা মনে করল যে, উর্দূতে সৈন্যরা ছাড়া আর কেউ কথা বলে না, হয় তো কোন সেনা ইউনিট সন্দেহভাজন লোককে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

এ ভাবে আমরা সকল সাথী সেনা ব্যারিকেড পেরিয়ে গ্রামের বাইরে চলে আসি। আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, সেনাবাহিনী একেবারে আমাদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি।

সেনাঘেরাও ছিল অত্যন্ত পরিকল্পিত ও মজবুত। তদুপরি সাথীদের মনোবল বাড়ানোর জন্যে আমি বললাম, আজ কোন ক্রেক ডাউন হচ্ছে বলে মনে হয় না। এটা সাধারণ সেনাঘেরাও! সতর্কতার সাথে দু' দু'জন করে বেরিয়ে যান। অবশ্যই আমরা ব্যারিকেড ডিঙ্গিয়ে যেতে সক্ষম হব।

আমার কথায় সবাই আশ্বস্ত হয়ে দু'জন করে বেরিয়ে পড়ল। আমি আর একজন পাকিস্তানী ভাইকে নিয়ে সবার পেছনে পড়ে গেলাম। এমন সময় আমার মনে হল কোন কাশ্মিরী ভাইকে আমার সাথে রাখা প্রয়োজন ছিল, কারণ এখানের পথ-ঘাট আমাদের চেনা নেই। কাশ্মিরী ভাষাও আমরা জানি না।

আমার যখন এ কথা খেয়াল হল, তখন সময় অনেক গড়িয়ে গেছে, এক সঙ্গীন অবস্থার মুখোমুখী আমরা। গ্রামের চতুর্দিকেই গোলাগুলী শুরু হয়ে গেছে।

আমাদের অনেক সাথী আর্মিদের পর্যুদস্ত করে তখন মূল ব্যারিকেড পেরিয়ে গেছে। আমি বেরুনোর কোন পথ পাচ্ছিলাম না।

এমন সময় কমাণ্ডার আবু খালেদ ভাইকে আমাদের দিকে এগুতে দেখলাম। ভাবলাম, যে দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা তিনি করেছিলেন, হয়ত আর্মিরা তাঁর পথ আগলে রেখেছে। আবু খালেদ ভাইয়ের ব্যর্থতা আমাদের জন্যে বিরাট সহায়তা হিসাবে প্রতিভাত হল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার ফিরে এলেন কেন?

তিনি বললেন, 'আমি গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে সামনে এগুতেই দেখি, সেনাদের হাতের নাগালে এসে গেছি। ওরা আমাকে হাতিয়ার ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেয়। আমি কাল বিলম্ব না করে ফায়ারিং করতে করতে এদিকে চলে এলাম।'

ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা

তিনজন এক সাথে আর্মি ব্যারিকেড ডিঙ্গিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করলাম। ঘটনাক্রমে আমাদের তিনজনের মধ্যে রাইফেল ছিল মাত্র একটি। আমি তিনজনের অগ্রভাগে হাঁটছি। আবু খালেদ ভাই মধ্যে। আর করীম ভাই রাইফেল উঁচিয়ে সবার পেছনে। আমরা অতি সন্তর্পণে পথ চলে গ্রামের শেষ প্রান্তের একটি ঘন সফেদা বাগানে এসে পৌঁছলাম।

রাতের আঁধার ফুটে সকাল হয়ে গেছে। যেই না ব্যারিকেড পেরিয়ে ওপারে যাবার জন্যে এগুলাম, আর্মিদের সাথে আমাদের চোখাচুখি হয়ে গেল। ওরা হাঁক দিল, 'তোমরা কারা?'

আমরা দৌড়ে একটি ধান খেতে লুকিয়ে শুয়ে পড়ি। আর্মিরা আমাদের লক্ষ্য করে সমানে গুলী বর্ষণ করছে। কিন্তু একটিও আমাদের গায়ে লাগেনি।

আর্মিরা অব্যাহত গুলী বর্ষণ করছে, এর মধ্যেই আমরা দিক বদল করে ক্রোলিং করে ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে সামনে এগুতে লাগলাম। বহুদূর পর্যন্ত ক্ষেত বিস্তৃত ছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যে সব রাইফেল দিয়ে আর্মিরা ফায়ার করছে, সেগুলোর রেঞ্চ দেড় কিলোমিটারের বেশী নয়। এজন্য নিরাপদ দূরত্বে চলে যাওয়ার জন্যে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি। ধান ক্ষেতের গভীর কাদায় আমরা বেশী দ্রুত অগ্রসর হতে পারছিলাম না। বার বার শক্তি হারিয়ে গতি শ্লথ হয়ে যাচ্ছিল।

ভোর সাড়ে চারটা থেকে বেলা ন'টা পর্যন্ত এক নাগাড়ে ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে ক্রোলিং করছি। দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা কাদা পানিতে গড়াগড়ি করে আমাদের শরীর এত বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল যে, যে কেউ দেখলে বলত, আমরা কাদা মাটিতে বসবাসকারী কোন জীব। সাথীদের কাউকে আর তার পূর্বের অবয়বে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। কাদায় ক্রোলিং করতে করতে শরীরের সমস্ত শক্তি হারিয়ে আমরা ক্রমশঃ প্রাণস্পন্দনহীন হয়ে যাচ্ছিলাম। অনেকক্ষণ পর মাথা উঁচু করে

একটি টিলা দেখে প্রায় নিরাপদ দূরত্বের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি অনুমান করে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম।

সামনে অগ্রসর হতেই আবার বিপদ। সামনেই একটি সাঁকো। আমি পেরুতে অপারগ আর ওদিক থেকে গোলা বর্ষিত হচ্ছে তীব্রভাবে। এমতাবস্থায় আবু খালেদ ভাই গোঁ ধরলেন- সাঁকো পেরিয়েই যেতে হবে। বললাম, সাকোঁ পেরুতে গিয়ে ধরা না পড়ি, বরং দিক বদলিয়ে অন্য পথে চলুন।

খালিদ ভাই বলল, 'তাহলে আমাদের গুলীর আওতায় পড়ে যাওয়ার আশংকা আছে।'

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল, আমরা ঘুরে যাব। একটি বড় আইল অতিক্রম করার জন্য আমরা তিনজন ৫০ গজ করে দূরত্বে থেকে রওনা হলাম। যেই আমি আইলের উপর উঠলাম, অমনি এক ঝাঁক গুলী আমার পাশে এসে পড়ে।

সাঁকো ছাড়া খাল পেরুনোর আর কোন বিকল্প পথ রইল না। অগত্যা আমি নিজের অতীত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কোন মতে সাঁকো পেরিয়ে একটি গাছের কাছে পৌঁছে গেলাম। করীম ভাই সাঁকোয় ওঠা মাত্র তাঁর শরীর ঘেষে শো শো করে কয়েক রাউণ্ড গুলী চলে গেল। তিনি শরীরটাকে বাঁকিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। জীবনপণ চেষ্টা করে খুব তাড়াতাড়ি সাঁকো পেরিয়ে আমার কাছে গাছটির দিকে অগ্রসর হলেন।

গুলি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আমি গাছের আড়ালে চলে গেলাম। তখন আমরা আর্মিদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। আবু খালেদ ভাই সাঁকো পার হচ্ছিলেন, আনাড়ী পায়ে অগ্রসর হতে গিয়ে তার বিলম্ব হচ্ছিল। হঠাৎ করে তার গায়ে একটি গুলী আঘাত হানে। এ আশংকাই আমরা দূর থেকে করছিলাম। আহত খালেদ ভাই না অগ্রসর হতে পারছিলেন, না পেছনে ফিরে আসতে পারছিলেন।

আমরা তার ৬০ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি চীৎকার করে বলতে লাগলেন, 'তোমরা চলে যাও! নিজের জীবন বিপন্ন কর না। আমি সম্ভব হলে ফিরে আসব। হয়ত আল্লাহ কোন পথ খুলে দিবেন।'

কিন্তু আমরা তাকে এমন সঙ্গীন অবস্থায় ছেড়ে যেতে পারি না। যে প্রভু আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছেন, তাঁর ইচ্ছা হলে এখান থেকেও আমরা বেঁচে যেতে পারব। অতএব তাকে বিপদে রেখে আমরা চলে যেতে রাজী হলাম না। সাঁকোর এই দুর্গমতা জয় আমরা করবই।

আমি আর করীম ভাই যে স্থানটিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তার অদূরে একটি ছোট পল্লী ছিল। আমি করীম ভাইকে বললাম, আপনি এই পল্লীতে গিয়ে বলুন, আমরা মুজাহিদ। আমাদের এক সাথী সাঁকোয় আটকা পড়ে গেছে।

গুলীর আওয়াজ শুনে পল্লীর লোকেরা বেরিয়ে আমাদের দেখছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই যুবক করীম ভাইয়ের সাথে এগিয়ে এল। করীম ভাইকে সাথে নিয়ে যুবকদ্বয় নির্ভয়ে এগিয়ে গেল সাঁকোর দিকে। দশ মিনিট চেষ্টা করে

তারা খালেদ ভাইকে আটকাবস্থা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। খালেদ ভাই ততক্ষণে ক্লান্ত হয়ে গেছেন। তার সমস্ত শরীর ও কাপড় কাদা পানিতে একাকার হয়ে গেছে।

সাহায্যকারী এ দু' যুবক 'আল জিহাদ' গ্রুপের সদস্য। এরা আমাদেরকে গ্রামে নিয়ে গেল। ওখানে গিয়ে দেখি, আমাদের অন্যান্য সাথীরা চলে এসেছে; কিন্তু কমান্ডার মূসা ভাইয়ের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

আমার মনে পড়ল যে, পুরো অপারেশনে তিনি একবারও আমাদের সামনে আসেননি। রাতে আমাদের সাথে শুয়ে ছিলেন, কিন্তু এক সৈন্য যখন আমাদের ঘরে উঁকি দেয়, তখন আমরা জেগে উঠে মূসা ভাইকে ঘরে দেখতে পাইনি।

পরে জানতে পেরেছি, রাতে উঠে তিনি তাহাজ্জুদ পড়তে মসজিদে যাওয়ার পথে সেনাদের হাতে আটকা পড়েছেন। এরা সেই সোনালী যুগের সিপাহসালারদের মত, যারা দিনের বেলায় যুদ্ধের ময়দানে নাঙ্গা তরবারী নিয়ে জিহাদ করেন আর রাতের আঁধারে আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে থাকেন।

কর্দমাক্ত বেশ-ভূষণে একাকার রণক্লান্ত চেহারা দেখে গ্রামের লোকেরা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তারা পরিষ্কার পরিধেয় কাপড় এনে বলল, 'আপনারা ময়লা কাপড়গুলো বদলে নিন। আমি তাদের শুকরিয়া জানিয়ে বললাম, না, এর প্রয়োজন নেই।

ঝিলাম হ্রদে পৌঁছে আমরা ইচ্ছে মত গোসল করে নিলাম। জামা-কাপড়ও পরিষ্কার করলাম। সারাদিনের ক্লান্তি, অবসাদ ও দুশ্চিন্তা দূর হল। মৃত্যুদূতের পদ-ধ্বনি কানের কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্য অন্তর্নিহিত হয়ে গেল। সে দিন যথার্থভাবেই উপলব্ধি করলাম যে, যদি আল্লাহ রক্ষা কর তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তিই কাউকে মারতে পারে না। তিনি আমাদের প্রতিটি কদম তাঁর সাহায্যের বারিধারায় সিক্ত করেছেন।

হ্রদের স্বচ্ছশীতল পানিতে শরীর-কাপড় পরিষ্কার করে আমরা আবার গ্রামে ফিরে এলাম। ঠিক করলাম, নৌকা ছাড়া অন্য কোন পথে আমাদের যাত্রা নিরাপদ নয়। গ্রামে বেশী সময় থাকা ঝুঁকিপূর্ণ।

গ্রামের এক যুবক আমাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়ার জন্যে হ্রদে ছোট্ট নৌকাটি ভাসিয়ে দিল। এদিকে আমাদের পেছনে ধেয়ে আসা সৈন্যরা মনে করছিল, তখনও আমরা ধান ক্ষেতের কোথাও লুকিয়ে আছি।

স্রোতের টানে নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে। নৌকায় যাত্রা আমাদের জন্যে তেমন সুবিধাজনক ছিল না। হ্রদের কোন কোন স্থানে ছিল অস্বাভাবিক স্রোত, সেই সাথে ছোট্ট নৌকার ডুবুডুবু অবস্থা। কয়েকবার পানির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ডুবে গিয়েও যেন আবার ভেসে উঠেছে নৌকাটি।

যাত্রা পথে নয়নাভিরাম হ্রদের দু' তীরের দৃশ্য ছিল মায়াকাড়া। কোথাও ছোট্ট নৌকায় লোকদের মাছ ধরার দৃশ্য ছিল অপূর্ব। কিন্তু এত সব নৈসর্গিক

দৃশ্য দেখার মত মানসিক প্রশান্তি আমাদের ছিল না। উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়াই ছিল আমাদের মুখ্য চিন্তা।

দিবাকর দিনের আলো গুটিয়ে অস্তাচলে হারিয়ে গেছে। চারদিক থেকে আঁধার ঘনিয়ে আসছে। এমন সময় আমরা একটি ছোট্ট গ্রামে পৌঁছলাম। নৌকা এখানে আমাদের নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। মাত্র দশ-বারটি ঘরের এ পল্লীবাসী আমাদের পরম যত্ন সহকারে জায়গা দেয়।

অত্যাধিক ঠাণ্ডায় ও ভেজা কাপড়ে আমরা থরথর করে কাঁপছিলাম। পল্লীবাসীরা আমাদের জন্যে একটি ঘরের ওঠোনে আগুন জ্বালায়। কিছুক্ষণ আগুকে সেঁকে নেয়ার পর পরিধেয় কাপড়ও শুকিয়ে গেল, আমরাও সতেজ হয়ে উঠলাম। পল্লীর লোকেরা আমাদের পরম আদরে খাওয়ারও ব্যবস্থা করল।

বিগত রাতের নির্ঘুম দীর্ঘ ক্লান্তিময় যাত্রার শ্রান্তি ভর করল সবার চোখে-মুখে। ঠিক করলাম, আবু খালেদ ভাইকে শ্রীনগর পাঠিয়ে দিয়ে আমি নিজ গ্রাম বেরুয়ারা যাব। নদীর তীরে উজান দিক থেকে আসা নৌকার জন্যে অপেক্ষা করতে হল। অনেক্ষণ পর দেখা গেল, একটি ছোট্ট ডিঙ্গি ভাটির দিকে আসছে যা শ্রীনগর যাবে বলেই মনে হল।

কাছে আসলে দেখা গেল, এক ইংরেজ দম্পতি নৌকার আরোহী। এরা পর্যটক। ভূস্বর্গ কাশ্মীর দেখতে এখানে এসেছিল। কিন্তু এখন পুরো কাশ্মীর জ্বলন্ত মরুভূমি। আমরা মাঝিকে নৌকা তীরে ভিড়ানোর ইশারা করলাম। আমাদের হাতে ক্লাশিনকোভ দেখে ওরা ভয়ে কুকড়ে গেল। আমাদের ডাকাত অথবা হত্যাকারী ভেবে ভয়ে নীল হয়ে গেল ইংরেজ দম্পতির চেহারা। আবু খালেদ ভাই এগিয়ে এসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বললেন, 'তোমরা যদি আমাদের শ্রীনগর পর্যন্ত নিয়ে যাও, তাহেল আমাদের খুব উপকার হবে।'

এরূপ অপ্রত্যাশিত আবেদন শুনে ইংরেজ দম্পতি প্রাণ ফিরে পেল, তাদের চেহারা থেকে ভয় কেটে গিয়ে দেখা দিল স্বস্তির আভা। একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে পুরুষ লোকটি বলল, 'তোমরা তো অনেক লোক, আর নৌকাতো ছোট্ট।'

আবু খালেদ বললেন, 'না, কেবল আমার সাথে আরেকজন লোক নৌকায় যাবে।'

ইংরেজ দম্পতি সহাস্যে তাদের নৌকায় উঠতে আহ্বান করল। এরা দু'জন চড়ে বসতেই নৌকা ভাটির টানে এগিয়ে চলল শ্রীনগরের দিকে।

বাকী পাঁচ সাথীকে বিদায় জানিয়ে আমি বেরুয়ার পথে রওনা হলাম। আমার নিজ গ্রামে আগেই খবর পৌঁছে গিয়েছিল যে, শামশীর খান সেনাবাহিনীর ক্রেক ডাউনে পড়েছিল, কিন্তু কোন মতে পালিয়ে বেঁচে গেছে। পরিবারের সবাই আমার জন্য পেরেশান ছিল, মা ছিল প্রতি মুহূর্তে আমার পরিণাম চিন্তায় উদ্বিগ্ন।

হঠাৎ করে আমি বাড়ি ফিরে আসায় সবাই খুশি হল। সারা গ্রামের নারী-পুরুষ আমাকে দেখার জন্যে ভীড় করল। শরীরের ক্লান্তি দূর করার জন্যে ক'দিন বাড়িতে বিশ্রাম করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আবার সেনাবাহিনীর মুখোমুখী

দেখতে দেখতে কয়েকটা দিন গ্রামে কেটে গেল। এরই মধ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে নির্দেশ পাঠান হল। সঙ্গে সঙ্গে আমি রওনা হলাম। পথে শেখ ওয়াহীদের সাথে দেখা। এক বাড়ীতে আমরা বসলাম। তখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ভাবলাম, একটু জিরিয়ে নেই, বৃষ্টিটাও বন্ধ হোক।

কিন্তু বিশ্রাম নামক কোন বস্তু আমাদের ভাগ্যে ছিল না। তসবির দানার মত একটির পর একটি জিহাদে আমার বিরামহীন মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আমরা বসে বৃষ্টি কমার অপেক্ষা করছি। এমন সময় গৃহস্বামী খবর নিয়ে এলেন, গ্রামের মাথায় পুলিশ এসে গেছে, আপনারা আত্মরক্ষার চিন্তা করুন।

আমরা ছিলাম ঘরের দোতলায়। সময় এত কম ছিল যে, সিঁড়ি বেয়ে নামতে সময় লাগবে বলে দোতলা থেকে মই বেয়ে সোজা নীচে নেমে গেলাম। তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে নীচে বাঁধা ঘোড়ার রশিতে প্যাঁচ লেগে আমি ও সাথী ওয়াহিদ উভয়েই হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে যাই। অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে কেউই তেমন কোন আঘাত পাইনি।

গ্রামের সামনে বিশাল ফসলী মাঠ। ফসল কেটে ফেলায় এখন ফাঁকা ময়দান। পানি জমে থাকায় পুরো ময়দানই কাদায় নরম হয়ে আছে। পা ফেলতেই প্রায় হাটু পর্যন্ত কাদায় তলিয়ে যায়। এক পা উঠালে আরেক পা উঠানো যায় না। যেন জিঞ্জির দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে পা দু'টো।

এদিকে পুলিশ পৌছে গেছে অনেক কাছাকাছি। শেষতক বুট খুলে ফেলে খালি পায়েই অগ্রসর হবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে লাগলাম। গ্রামের অন্যান্য মুজাহিদরাও দৌড়াতে শুরু করল নিরাপদ স্থানে পৌছার লক্ষ্যে।

পুলিশ বাহিনী আমাদের পেছনে তাড়া করছে। কিন্তু তখনও এরা কোন গুলী ছুড়তে সাহস করেনি নিজেদের নিরাপত্তার ভয়ে। অনেকক্ষণ দৌড়ানোর পর আমরা পেছনে ফিরে দেখি, কোন পুলিশ আমাদের দিকে আর এগুচ্ছে না।

শস্য ক্ষেত্রে শ্রমিকরা কাজ করছিল। তারা নিজেদের খাবার আমাদের জোর করে খাইয়ে দিল। এমন সময় অল্প দূর থেকে একজন মহিলা ইশারা করে বলল, 'ঐ দেখ, পূর্ব দিক থেকে সৈন্য আসছে।'

জায়গাটা ছিল একদম ফাঁকা। যন্ত্রচালিতের ন্যায় আমরা দৌড়াচ্ছিলাম, সৈন্যরা আমাদের ধাওয়া করল। প্রায় ঘন্টাখানিক পরেও দেখি, সৈন্য ও আমাদের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশঃ কমে আসছে। সামনে একটি জলাশয়ের সম্মুখীন

হলাম। এর কোল ঘেষে চলে গেছে একটি খাল। উপায়ন্তর না দেখে খালে নেমে পড়লাম। খালটি ছিল শুকনো, আর বড় বড় পাথরে ভরা।

আমাদের সফল মোকাবেলায় শত্রুরা ব্যর্থ হল

আমরা খালের পাড়ে দাঁড়ালে সহজেই শত্রুসেনা আমাদেরকে গুলীর টার্গেট বানাতে পারত। খালের খাদে নেমে তেড়ে আসা সৈন্যদের এক হাত দেখিয়ে দেয়ার প্ল্যান করলাম। আমরা খালে নেমে পড়ায় ওদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হয়ে গেলাম। খালের বড় বড় পাথরের আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম শত্রুসেনাদের।

যখনই ওরা খালের তীরে এসে পৌঁছল, তখন ওরা একেবারে আমাদের রাইফেলের সামনে। দ্রিম দ্রিম করে একযোগে আমাদের সব কয়টি রাইফেল গর্জে উঠল।

আকস্মিক মোকাবেলায় পলায়নপর শত্রুরা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে ডজনখানের লাশ গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

আমাদের অবস্থান আন্দাজ করার আগেই আমরা বড় বড় পাথরের আড়ালে গিয়ে পিছু হটতে লাগলাম। কারণ, দীর্ঘক্ষণ মুখোমুখি লড়াই করার মত পর্যাপ্ত গোলাবারুদ আমাদের ছিল না।

অকল্পনীয় আক্রমণে শত্রুসেনারা নিজেদের লাশগুলো হেফাজত ও আহতদের সামাল দেয়ার দিকে নজর দিল। আমরা কালক্ষেপণ না করে মুখোমুখি অবস্থান থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু ততক্ষণে আমাদের স্থানীয় সাথীরা অনেক দূরে চলে গেছে। ওয়াহিদ ভাই আমি আর দু'জন পাকিস্তানী সাথী পেছনে পড়ে গেছি।

এলাকার অবস্থা ও অবস্থান আমাদের জানা নেই। তদুপরি ইন্ডিয়ান আর্মি ক্যাম্প বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো, কোত্থেকে কোথায় গিয়ে ফেঁসে যাই এ নিয়ে পড়লাম মহা মুশকিলে। কিন্তু কি আর করা যাবে! আল্লাহর উপর ভরসা করে চার বন্ধু রওনা করলাম।

এক শিখ যুবকের সহযোগিতা

এক গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের পথের অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন শিখ নজরে পড়ল। এক সময় আমরা তাদের মুখোমুখি হলাম। শিখ দেখলেই পাঞ্জাবী ভাষায় ওদের সাথে কথা বলা আমার একটা হবি। অভ্যাস অনুযায়ী ওদের সাথেও পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বললাম।

ওরা আমার মুখে পাঞ্জাবী ভাষা শুনে খুব খুশি হল। আমি কুশলাদি জিজ্ঞেস করলে ওরা আমাদের কুশলাদি জানতে চাইল। বললাম, আমরা ভালই আছি। তবে পথটায় একটু প্যাচ লেগে গেছে। দেখিয়ে দিলে ভালো হত।

ওদের একজন বলল, 'আরে ভাই! যাওয়া তো পরে হবে, আগে চা-কফি পান করে নাও।'

এদের অকল্পনীয় হৃদ্যতায় আমি বললাম, আমাদের খুবই তাড়া আছে, দেরী করতে পারব না। তোমাদের ধন্যবাদ। চা অন্যদিন, আজ শুধু পথটা একটু দেখিয়ে দাও।

এক শিখ যুবক আমাদের সাথে রওনা হল, কথার এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কোত্থেকে এসেছ?'

বললাম, জম্মু থেকে এসেছি সরদার!

ও বলল, 'চল! আমি তোমাদের রাস্তায় উঠিয়ে দিয়ে আসছি।'

কয়েকশ' গজ এগুতেই একটি বালক বলল, 'সামনে আর্মি ক্যাম্প আছে, আপনারা অন্য পথে যান।'

শিখ বলল, 'ভয়ের কারণ নেই, আমি তোমাদের নিরাপদ পথে উঠিয়ে দেব। আপনারা সহজেই সে পথে মঞ্জিলে যেতে পারবেন।'

শিখ যুবক আমাদেরকে একটি নিরাপদ পথের সন্ধান দিয়ে চলে এল। আমরা ওর প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম। পুরো জিহাদেই শিখরা মুজাহিদদের জন্যে সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত রেখেছে।

অনেক পথ চলে রাতে আমরা একটি গ্রামে এসে পৌঁছলাম। এখানে আহসান ডারের সাথে মোলাকাত হল। রাতটা সে গ্রামে বিশ্রাম করে পরদিন সবাই সোপুরের দিকে পা বাড়ালাম।

আমাদের নিরাপত্তায় ঘোড়ার আশ্চর্য ইঙ্গিত

অগ্রগামী দু' সাথী আমাদের চেয়ে অনেক দূরে এগিয়ে চলে গেছে। তাদের বলা হয়েছিল, যদি সামনে কোন অসুবিধা থাকে, তবে ফায়ার করবে, আমরা সতর্ক হয়ে যাব।

রাত তিনটার সময় যখন পাটনাখোড়া নামক গ্রামে পৌঁছলাম, একটি ঘোড়াকে দেখতে পেলাম সড়কের মধ্যপথে চলছে। আমরা মনে করলাম, হয়ত ঘোড়াটা দড়ি ছিড়ে পালাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর ঘোড়াটি আমাদের পাশাপাশি চলতে লাগল। ঘর পালানো ঘোড়ার মত ওর মধ্যে কোন চঞ্চলতা নেই। নিশ্চিন্তে ধীরভাবে সমান তালে আমাদের আগে আগে যাচ্ছে। আমরাও ওকে কোন জ্বালাতন করিনি।

দীর্ঘক্ষণ ঘোড়াটি আমাদের সাথে চলল। হঠাৎ করে একজন মুজাহিদের ঘাড়ে ঘোড়াটি কামড়ে দিলে মুজাহিদ চীৎকার দিয়ে দৌড় দেয়। আমরা শান্ত ঘোড়ার হঠাৎ দুষ্টুমিতে খুব মজা করে বললাম, আরে ওতো তোমাকে আদর করছে। এরপর আরো কিছুক্ষণ শান্তভাবেই এগিয়ে চলে আবার একজনকে কামড়ে দিল।

এবার ঘোড়ার বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিলাম। কয়েক ঘা লাগিয়ে তাড়িয়ে দিলাম রাস্তা থেকে। দশ-পনের মিনিট আমরা চুপচাপ হাঁটার পর দেখি, ধানক্ষেত মাড়িয়ে ঘোড়াটি আমাদের সামনে সড়কের মাঝখানে পথ আগলে দাঁড়াল। আমরা ওটাকে এড়িয়ে পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ঘটলো অদ্ভুদ ঘটনা। সেই ঘোড়াটিই সামনে দিয়ে দৌড়ে এসে চার পা উপর দিকে করে মাঝ পথে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। ভাবখানা এমন যে, কোন ক্রমেই আমাদের এগুতে দেবে না, হয় কামড়ে দেবে, না হয় চড়াও হবে।

এ পর্যন্ত আমরা ঘোড়াটির আচরণে বেশ মজা পাচ্ছিলাম। কিন্তু এ অবস্থা দেখে আহসান ডার বলল, 'বিপদ বন্ধুরা! আমাদের সামনে একটা কিছু অবশ্যই সমস্যা আছে। ঘোড়াটির বার বার এই অদ্ভুদ আচরণ আমার কাছে এমন কোন অশুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ঘোড়াটা বার বার আমাদের থামিয়ে দেয়ার জন্যে চেষ্টা করছে, কিন্তু আমাদের রুখতে পারছে না।'

অধিকাংশ মুজাহিদ আহসান সাহেবের এ যুক্তিকে উড়িয়ে দিল উদ্ভট কল্পনা বলে। কিন্তু তার ক্রমাগত চাপের মুখে সবাই যাত্রায় বিরতি দিল।

সবাই বলল, 'ঠিক আছে, আমরা পনের-বিশ মিনিটের জন্যে যাত্রা বিরতি দিলাম। দেখা যাবে ঘোড়া এবার কি করে, আর অস্বাভাবিক কোন সংকেত পাওয়া যায় কিনা।'

তখনও কয়েকজন সাথী বলছিল, 'আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিৎ, একটি কাল্পনিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম!'

কিন্তু আহসান ভাই নিজে কমাণ্ডার, তার নির্দেশ এবং অধিকাংশ সাথীরও তখন একটু বিরতির পক্ষেই মত থাকায় শেষতক আর অগ্রসর হলাম না। রাস্তার পাশেই ছিল মাড়ানো ধান ও খড়ের আঁটির স্তূপ। আমরা খড় বিছিয়ে আর ধানের আঁটি মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই ঘুমিয়ে গেলাম, আর দু'জন প্রহরায় রইল।

৩০/৩৫ মিনিট ঘুমিয়ে আমরা জেগে দেখি, ঘোড়াটি নেই। যে ঘোড়াকে পিটিয়ে তাড়াতে পারলাম না, আর এটি এখন নিজেই কোথাও চলে গেল। এ বিষয়টি আমাদের ভাবিয়ে তুলল। আমরা ঘোড়ার এই ড্রামা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু সামনে এগুতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

মিনিট বিশেক সময় পথ এগুতেই আমরা রাস্তায় একজনের দেখা পেলাম। আমাদের হাতে রাইফেল দেখে লোকটি বুঝতে পেরেছিল, আমরা কাশ্মিরী মুজাহিদ। সে বলল, 'আপনাদের ভাগ্য ভাল। মাত্র ২০ মিনিট আগেও এখানে শতাধিক সেনা ছড়িয়ে ছিল। এরা এখন গ্রামের দিকে চলে গেছে, হয়ত কোথাও ক্রেক ডাউন দিয়েছে।'

তখন ঘোড়া বার বার আমাদের পথ আগলে দাঁড়ানোর ভেদ আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। থেমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করলে আমরা আর্মিদের মুখোমুখি

পৌঁছে যেতাম। আর তখন আমাদেরই বেশী ক্ষতি হওয়ার আশংকা ছিল। যেহেতু আর্মিরা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে অনেক বেশী।

পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। অপ্রত্যাশিতভাবে ভয়ংকর বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে আমরা কায়মনোবাক্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। অদূরে গ্রামের মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসছে ফজরের আযান। 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' আল্লাহ মহান, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়।

ইথারে ভেসে আসা সুমিষ্ট আযানের আহবানে আমার হৃদয় থেকে অবচেতন মনে উচ্চারিত হল, নিঃসন্দেহে আমার প্রভূ সবচেয়ে বড়, সব চেয়ে মহান। সকল কিছুই আল্লাহর মহাশক্তির কাছে তুচ্ছ। ভারতীয় সেনাদের কোন শক্তি নেই যে, আমাদের অগ্রযাত্রা রোধ করে। আল্লাহ পদে পদে আমাদের সাহায্য করছেন, আমরা কেন মহাপ্রভূর রহমত থেকে নিরাশ হব! অবচেতন মনে অনর্গল আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হল এসব শব্দ। আল্লাহ্‌র অভাবিত মদদে সকল বাঁধার পাহাড় আমার কাছে নগণ্য মনে হচ্ছিল।

পাশেই প্রবাহিত ঝরণার ঠাণ্ডা পানিতে অযু করে আমরা শুকরিয়া নামায আদায় করলাম। হৃদয়ে প্রোথিত আল্লাহর অস্তিত্বকে যখন গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়, তখন যে নামাযে কি অপূর্ব স্বাদ, তা কাউকে বুঝানো যাবে না।

নামাযান্তে সোপুরের নির্ধারিত মিটিংয়ে যোগদানের জন্যে আমরা রওয়ানা হয়ে গেলাম। আল্লাহর বিশেষ রহমতে আর কোন বাঁধা-বিপত্তি ছাড়াই মিটিং শেষ করে ইসলামাবাদ চলে এলাম।

আশরাফ ডার এর সাথে মোলাকাত

ইসলামাবাদ ফেরার পথে ফালওয়ামা জেলার সীমান্ত দিয়ে আমরা আসছিলাম। পথে একজনের কাছে খবর পেলাম, আশরাফ ডার ফালওয়ামা এসেছেন। কাশ্মীরে আশরাফ ভাই এসেছেন প্রায় এক মাস আগে, কিন্তু আমার সাথে এ পর্যন্ত তাঁর দেখা হয়নি। তাঁর আগমনের খবর পেয়ে আমি বহুবার সাক্ষাতের জন্য গিয়েছি, কিন্তু ততক্ষণে তিনি সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছেন।

আশরাফ ভাই এর সাথে আমার সাক্ষাতের আগ্রহ দেখে যাত্রীরা যাত্রা বিরতি দিয়ে আমাকে বাসনা পূর্ণ করার সুযোগ দিলেন। সুরক্ষিত স্পটে গিয়ে আশরাফ ভাইয়ের দেখা পেলাম। পরস্পর চোখাচোখি হতেই মাসুম শিশুর মত দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন আশরাফ ভাই। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে থাকলাম। দীর্ঘ বিরহের পর মিলনের আতিশয্যে কারো মুখ থেকে কোন কথা উচ্চারিত হয়নি।

আশরাফ ভাই ও আমার মধ্যে যে কত প্রগাঢ় হৃদ্যতা, কত গভীর ভালোবাসা, তা মৃত্যুর মুখোমুখি জিহাদের ময়দানে নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্যের জীবন বাঁচানোর বাজীতে যারা অভ্যস্ত নন, তাদের বোঝানো যাবে না। জিহাদের

ময়দান সকল পার্থিব স্বার্থের ফানুসকে ধূলো-মলিন করে আমাদের মধ্যে যে জান্নাতী হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল, ভালোবাসার যে সেতু রচিত হয়েছিল, তাতে কোন দেনা-পাওনার হিসাব ছিল না। ছিল না কোন বীর-বাহাদুরীর অহংকার।

আল্লাহর জন্য ছিল আমাদের ভালোবাসা। ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই আমাদের বুলেট ঝাঁঝরা করে দিত দুশমনের বুক। 'দোস্তী-দুশমনী সবই আল্লাহর উদ্দেশ্যে' এই মহান বাণীর বাস্তব দর্শন ছিল আমাদের যুদ্ধজীবন।

বিগত এক বছর কাশ্মীরে এসে আমি আশরাফ ভাই এর শূন্যতা এই মর্মে উপলব্ধি করছিলাম। হঠাৎ তাঁর সাক্ষাৎ পেয়ে মনে শত পুঞ্জিভূত বেদনা সুখ-দুঃখের কথার ডালি খুলে দিলাম। দীর্ঘক্ষণ চলল আমাদের হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা। অধিকৃত কাশ্মীরের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আমি তাঁকে ধারণা দিচ্ছিলাম। আর তিনি আমাকে আজাদ কাশ্মীরের নানা ঘটনা শুনাচ্ছিলেন।

জম্মু কাশ্মীরের মুজাহিদদের জিহাদী অগ্রগতির দাস্তান শুনে তাঁর চেহারা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। এমন অপার্থিব খুশির আভা চেহারায় খেলে গেল, যেমন কোন রসিক বাগানের মালিক পরিশ্রমের পর কাঙ্খিত ফুলের সৌরভে নিজেকে হারিয়ে তন্ময় হয়ে যায় ফুলের সৌন্দর্যে, সৌরভে। আমি জানি, জম্মুর আযাদী আন্দোলনের অগ্রগতি এই মহান মুজাহিদ নেতাদের রোপিত বীজেরই অঙ্কুরোদগম চারা।

একবার আমরা ক'জন সাথী গ্রামের মেঠো পথে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি। এমন সময় চোখে পড়ল, দশ পনেরজন টহলরত আর্মি আমাদের অদূরের পথ দিয়ে এগুচ্ছে।

হাঁটতে এসে মোকাবেলা করার কোন প্রোগাম আমাদের ছিল না। কিন্তু এতগুলো শিকার চোখের সামনে দিয়ে নিরাপদে চলে যেতে দেখে আমাদের সংকল্প পাল্টালাম। নিজেদের মধ্যে কয়েকমিনিট কথা বলে ঠিক করলাম, না এদেরকে এভাবে মুজাহিদদের ভূখণ্ডে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করার স্বাদ বুঝিয়ে দেয়া দরকার।

ক্লাসিনকোভে ম্যাগাজিন ভরে বড় বড় পাথরের আড়ালে পজিশন নিয়ে আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। তারা আমাদের খুব কাছাকাছি আসা মাত্রই একসাথে সবাই ফায়ার করে দিলাম। কয়েকজন আর্তচীৎকার করে লুটিয়ে পড়ল, আর বাকীরা চীৎকার দিয়ে পেছনে দৌড় দিল। আকস্মিক আক্রমণে এরা বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ করার চিন্তা করতে পারেনি।

অক্ষত সেনারা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে আমাদের দিকে গান ফায়ার করল, আমরা এদের জবাবে কয়েক রাউন্ড গুলী চালালাম। শেষতক ওরা স্তব্ধ হয়ে গেলে আমরা পাথরের আড়ালে আড়ালে ওদের রেঞ্জের বাইরে এসে গ্রামের দিকে রওনা দিলাম।

পথে আশরাফ ডার ও শামসুল হক ভাই আমাদের সাথে যোগ দিলেন। শামসুল হক ভাইয়ের সাথে একত্রে সফর করা সিকিউরিটি প্রশ্নে ঠিক ছিল না। আমি বিষয়টির প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করলে তিনি বললেন, 'কোন অসুবিধা নেই; আল্লাহ-ই শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তাদাতা।'

যাবার পথে এক স্থানে আমাদেরকে একটি হাইওয়ে পার হতে হবে। কিন্তু এ রাজপথে সব সময় আর্মি-পুলিশের টহল থাকে। সড়ক থেকে অল্প দূরে অপেক্ষা করে দু'জন সাথীকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আসতে বলা হল। তারা এসে জানাল, আপাততঃ কোন পুলিশের গাড়ি রাজপথে চোখে পড়েনি।

ফাঁকা মনে করে আমরা যেই মাত্র সড়কে উঠতে যাচ্ছি, অমনি সামনের দিক থেকে ৫/৬টি আর্মির সাজোয়া যান (ছাদে মেশিনগান স্থাপন করা) চোখে পড়ল। আমরা অতি সন্তর্পণে ক্লাসিনকোভগুলো জামার ভিতরে লুকিয়ে রাস্তার দু'ধার দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে এক মনে হেঁটে যাচ্ছি। ঘুণাক্ষরেও কেউ সেনাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি। সেনারা সাধারণ পথচারী ভেবে আমাদের প্রতি সন্দেহ করার অবকাশ পায়নি।

কিন্তু আমরা যদি সেনাদের গাড়ি থেকে পেছনে ফিরে যেতে ইচ্ছা করতাম, তাহলে ওদের সন্দেহের শিকার হতে হত। সবাই ভারতীয়দের গুলীর লক্ষ্যে পরিণত হতাম।

পাশ দিয়ে মারণাস্ত্র সজ্জিত শত্রুদের অতিক্রম করে চলে যাবার পর আমার বিশ্বাস হল, যতক্ষণ আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়ে রাখবেন, ততক্ষণ শত্রু বাহিনী আমাদের একটি পশমও নাড়াতে পারবে না।

ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাজোয়া যানগুলো চলে যাওয়ার পর আমরা আবার একত্রিত হলাম। আশরাফ ভাই ও আমি পাশাপাশি হাঁটছি। তার পরিধেয় জামা কাপড়গুলো খুব ময়লা হয়ে গিয়েছিল। আমি বললাম, আশরাফ ভাই! আপনি জামা-কাপড়গুলো বদলিয়ে নিন, এগুলো ভীষণ ময়লা হয়ে গেছে। আপনি একজন বড় কমাণ্ডার, আপনার ময়লা থাকা বেমানান। অন্ততঃপক্ষে মানানসই জামা-কাপড় পরা তো উচিৎ।

তখন শীতের তীব্রতাও ছিল বেশী, কিন্তু তাঁর পরনে একটি সোয়েটারও ছিল না। আমি এ বিষয়টিও উত্থাপন করলাম। তিনি হেসে বললেন, 'শামশীর ভাই! আমি পাকিস্তান থেকে এ কাপড়গুলো নিয়ে এসেছি। যতদিন পর্যন্ত এগুলো দিয়ে আবরু ঢাকা যায়, ততদিন গায়ে জড়িয়ে রাখব, ছিড়ে গেলে আবার পাকিস্তান গিয়ে বদলে আনব।'

তাঁর কথায় আমার হাসি পেল। বললাম, 'এ আবার কেমন কথা? আপনি শুধু কাপড় বদলাতে পাকিস্তান ফিরে যাব!'

আশরাফ ভাই আমার কথায় কোন জবাব দিলেন না। রেডিও অন করে এয়ার ফোনে ক্রিকেট খেলার ধারাভাষ্য শুনছিলেন। আশরাফ ভাই খেলার পাগল নন; কিন্তু তখন পাক-ভারত ক্রিকেট ম্যাচ চলছিল, আর পাক দল ক্রমাগত জয়ী হচ্ছিল।

পাক-ভারত ক্রিকেটে স্বভাবতঃই উভয় পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে টানটান উত্তেজনা থাকে। পাক দলের বিজয় সংবাদে তাঁর হৃদয়েও নাড়া দিল। পাকিস্তান দলের বিজয় তাকে খুবই উজ্জীবিত করে।

পাক-ভারত ক্রিকেট ম্যাচ কেন্দ্রীয় কমাণ্ডারকেও ভীষণ নাড়া দিল। তিনি আশরাফ ভাইকে খোঁচা দিয়ে বললেন, 'কাশ্মীর ধ্বংস করে দিচ্ছে ভারত। আর পাকিস্তানকে দেখ, ভারতের সাথে কেমন খাতির জমিয়ে পাতানো খেলা শুরু করেছে, আর তোমরা ভারতের বিরুদ্ধে জীবন দিয়ে লড়ছ।'

আশরাফ ভাই পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে বললেন, 'পাকিস্তান এক তরফাভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না, আন্তর্জাতিক চাপ তাকে মেনে নিতে হয়। তবে দেখছেন না, পাকিস্তান খেলায় জিতে যাচ্ছে? কাশ্মীরেও তো এখন ভারতীয় বাহিনী চরম মার খাচ্ছে। কাশ্মিরীরা কি তাতে খুশী হচ্ছে না!'

দীর্ঘক্ষণ চলল তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমাণ্ডার সাহেব হার মানার ভান করে আলোচনার ইতি টানলেন।

সানারাকুলীপুর পৌঁছে আমি আশরাফ ভাইয়ের সাথে তাদের বাড়িতে উঠি। আশরাফ ভাইদের বাড়ি আমি এর আগেও কয়েকবার গিয়েছি, কিন্তু একদিনও আশরাফ ভাইকে পাইনি। আজ তাকে সাথে করেই হাজির হলাম। বাহারী খানার ব্যবস্থা হল, মজা করে খেলাম।

আগেই উল্লেখ করেছি, শামসুল হক ভাইয়ের বাড়ীও এ গ্রামেই। তাঁর প্রচেষ্টায় এ অঞ্চলে স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। বলতে গেলে সানুরাকুলীপুর এতদাঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু।

দ্বিতীয় দিন আমার ভাই খালেদ আর পাকিস্তানী কিশোর সারফরাজ এল।

একান্ত সাহচর্যে আশরাফ ভাই ও আমি

নেতৃবৃন্দের ব্যস্ততায় আমরা ছিলাম দায়িত্বমুক্ত। ছুটির দিনগুলো আশরাফ ভাইয়ের সাথে উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরা করে কাটাচ্ছি। ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের নয়নাভিরাম দৃশ্যগুলো আশরাফ ভাইদের এখানে মুক্ত মনে দেখতে পেলাম। কাশ্মীরের টলটলে ঝরণাধারা ফলে-ফুলে সুশোভিত বাগান, চারদিকে সবুজের

সমারোহ, চোখ জুড়ানো ফসলে ভরা মাঠ, পাখ-পাখালীর কুঞ্জন, সাজানো গোছানো পল্লীর বাড়ী-ঘর।

দিনভর আমরা চষে বেড়াচ্ছি এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে। এতদাঞ্চলের গোপন মুজাহিদ আস্তানাগুলো ঘুরে দেখেছি। প্রতিদিন একবার সানুরাকুলী গ্রামে আমাদের আসা হত।

একদিন সানুরাকুলী গ্রামের বাইরে আশরাফ ভাই আমাকে তাদের ফসলী জমিন দেখাতে নিয়ে গেলেন। ছোট ছোট আখরুট গাছ দেখিয়ে আশরাফ ভাই বললেন, 'এগুলো আমার নিজের হাতে লাগানো।'

অদূরে এক বৃদ্ধ রাখাল এক পাল ছাগল চড়াচ্ছিল। আশরাফ ভাই বললেন, এই পালের সবগুলো ছাগল আমাদের। আর এই বুড়ো ছোট বেলা থেকেই ছাগল চড়ান।'

আমি টিপ্পনি কেটে বললাম, আচ্ছা! তাহলে তো এতে আমাদেরও হিস্যা আছে, তাই না? আশরাফ ভাই বললেন, 'হ্যা, অবশ্যই আছে। আপনি যত ইচ্ছে নিতে পারেন। আপনি সহ সকল মুজাহিদের খাওয়ানোর আয়োজন করার ইচ্ছা আছে।'

তিন-চার দিন পর আশরাফ ভাই আমাদের দাওয়াত দিলেন। ছাগলের গোশত দিয়ে ঐতিহ্যবাহী কাশ্মিরী বিরানী পাকানো হল। আমরা ক'জন পাকিস্তানীর জন্যে বিশেষভাবে পাকিস্তানী রান্নার ব্যবস্থা হল।

দীর্ঘদিন পর নানা স্বাদ ও হরেক আইটেমের উপাদেয় খানার গন্ধে ভরে উঠল নাসারন্দ্র। আশ-পাশের মুজাহিদদের আগমনে ভরে গেল আশরাফ ভাইদের বাড়ী। উমর সরফরাজ, খালেদ ও আমাকে পাকিস্তানীদের দস্তরখানে বসান হল। আশরাফ ভাই আমাদের সাথে বসতে বসতে বললেন, 'ভাই! আমরাও পাকিস্তানী, পাকিস্তানীদের সাথেই আমরা বসব।'

খেতে খেতে উমর সরফরাজ বলল, ভারতীয় সেনারা বেপরোয়া আনাগোনা করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে। এদের বিরুদ্ধে এ্যাকশন নেয়া দরকার।'

দস্তরখানে বসেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভারতীয় সেনাদের এ অঞ্চলে বাহাদুরীর মজা দেখাতে অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেয়া হল সরফরাজকে।

আহার পর্ব সেরে আশরাফ ভাই আমাকে তার আম্মার সাথে সাক্ষাত করতে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে আগে থেকেই জানতেন। আশরাফ ভাই আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আম্মু! ও আমার ঘনিষ্ট বন্ধু শামশীর খান, পাকিস্তানে আমরা এক সাথেই থাকতাম।'

আশরাফ ভাইয়ের আম্মা বললেন, 'আমি ওকে জানি। ও-ই তো আমার কাছে তোমার খবরা-খবর পৌছাত।

আশরাফ ভাইয়ের মা এমন একজন মহিয়সী মহিলা, যাকে দেখলে স্বর্ণযুগের মহিমান্বিত মহিলাদের কথা মনে পড়ে, যারা নিজেদের পেটে ধারণ করতেন যুগ শ্রেষ্ঠ বীর মুজাহিদ ও বিজয়ী শহীদদের নিজ কোলেই দিতেন তাদের বিজয়ী থাকার প্রশিক্ষণ।

আশরাফ ভাইদের পুরো পরিবারটি ছিল জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত। তাঁর বোনও স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন নিবেদিতপ্রাণা কর্মী।

আহারান্তে খোশ-গল্পের পর মুজাহিদরা নিজ নিজ ঠিকানায় চলে গেলে সরফরাজ আমাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিল, আমি এ কয়দিন সেনাবাহিনীর গতিবিধি কড়া পর্যবেক্ষণ করে আপনাদের তথ্য দেব, কোন্ দিন এদের উপর হামলা করা যায়।

জীবনের শেষ নিশিতে আশরাফ ভাই

দু'-তিন দিন বিভিন্ন স্থানে ঘোরা-ঘুরি করে চতুর্থ দিন আমরা সানুরাকুলী থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি গোপন ঠিকানায় রাত কাটালাম। আমাদের আশ্রয়দাতা পরিবারটি ছিল শিয়াদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তবুও রাতভর আমরা নির্ভয়ে ঘুমালাম।

ভোর বেলায় ফজরের নামায পড়তে উঠে দেখি, আশরাফ ভাই নেই। বাইরে বেরিয়ে দেখি, আশরাফ ভাই ক্লাশিনকোভ নিয়ে দাঁড়িয়ে। বিস্মিত হলাম তার এ কাজে। আমরা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন থেকে তিনি বাইরে রাইফেল নিয়ে পাহারা দিচ্ছেন রাতভর জেগে জেগে। তাকে বললাম, 'আশরাফ ভাই, আপনি! পাহারার কি প্রয়োজন ছিল? এ বাড়ী তো সুরক্ষিত, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কোন আশংকা নেই। আপনি জেনে-শুনে এতটা কষ্ট কেন করতে গেলেন?

আশরাফ ভাই বলল, 'তবে পাহারার প্রয়োজন ছিল।'

আমি বললাম,আশরাফ ভাই! যদি আর্মি এসে যেত, তাহলে আপনি একা কি ঠেকাতে পারতেন?

স্মিত হেসে আশরাফ ভাই বললেন, 'আসলে তখন দেখা যেত।'

পাহারারত সেই রাতই ছিল তার জীবনের শেষ নিশি। ফজরের নামাযের পর আমাদের ইচ্ছা ছিল সানুরাকুলীপুরার শামসুল হক ভাইয়ের বাড়ীতে সকালের নাশতা সারব। কিন্তু গৃহস্বামী তাঁর এখানে নাশতা না খাইয়ে আমাদের বিদায় করতে রাজী হল না। তাঁর বার বার অনুরোধে আশরাফ ভাই বললেন, 'ভাই! একজন মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে যাওয়ার চেয়ে না হয় আমরা এখানে নাশতাটা খেয়েই যাই।'

শেষ পর্যন্ত আমরা চায়ের সাথে এক স্লাইস রুটি খেয়ে নাশতা সেরে সানুরাকুলীপুরার পথে পা বাড়ালাম।

বাড়ী পৌঁছে শামসুল হক ভাই আমাদের মেহমানখানায় বসিয়ে এ বলে বাড়ির ভেতরে গেলেন যে, দশ মিনিটের মধ্যেই তিনি এসে আমাদের নাশতায় শরীক হব। নাশতা আগে থেকে তৈরী ছিল। কয়েক মিনিট পরই তিনি নাশতাসহ চলে এলেন আমাদের কাছে।

আমরা সবেমাত্র খাওয়া শুরু করেছি, এমন সময় গ্রামের অপর প্রান্ত থেকে উপর্যুপরি ফায়ারিং ও কোলাহলের আওয়াজ ভেসে এল। তাড়াতাড়ি বাড়ির বাইরে এসে দেখি লোকজন ওদিক থেকে দৌড়ে এদিকে আসছে। এক ব্যক্তি আমাদের উদ্দেশে বলল, 'ও পাড়ায় মুজাহিদরা আর্মি ব্লকের মধ্যে আটকা পড়েছে, ক্রস ফায়ার চলছে।'

শামসুল হক ভাই বলল, 'পাহারাদার মুজাহিদদের একত্রিত কর।'

আশরাফ ভাই চার মুজাহিদের খোঁজে বেরিয়ে গেলেন। আমি শামসুল হককে বললাম, আপনারা কোন নিরাপদ স্থানে চলে যান, হতে পারে আর্মিরা এখানে আপনাদের অবস্থান জেনে যাবে। না হয় এখানে হামলার উদ্দেশ্যেই আসছিল, পাহারারত মুজাহিদরা ওদের ঠেকিয়ে রেখেছে।

আমরা বিলক্ষণ জানতাম যে, মুজাহিদ কমাণ্ডারদের শহীদ কিংবা গ্রেফতার করা ভারতীয় সেনাদের প্রধান টার্গেট। এজন্যে কমাণ্ডার ও নেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মুজাহিদদের প্রধান দায়িত্ব।

শামসুল হক ভাই আমাকে নির্দেশ দিলেন, 'আশরাফ ও অন্যান্য মুজাহিদদের নিয়ে শীঘ্রই তোমরা আমার কাছে চলে আসবে।'

শাহাদাতের আগে আশরাফ ভাই

আশরাফ ভাইয়ের কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, 'আমরা সব সাথী মিলে এখানে প্রায় ১৫/১৬ জন হব। আমার ইচ্ছে হল, সবাই এক সাথে পেছন থেকে আর্মিদের উপর হামলা করব। যদি আমাদের সাথীরা এদের ঘেরাওয়ে পড়ে থাকে, তারা সহজেই বেরিয়ে আসতে পারবে।

আমি বললাম, 'আশরাফ ভাই, আর্মিদের জনবল ও অবস্থান আমাদের জানা নেই, এমতাবস্থায় হামলা করলে আবার আমরাও ঘেরাওয়ে পড়ে যাই কিনা। এছাড়া শামসুল হক ভাই আপনাকে নিয়ে যাবার কথা বলেছে।'

আশরাফ ভাইয়ের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল, তিনি আমাকে বললেন, 'শামশীর ভাই, সাথীদের জীবন রক্ষা করাও আমাদের প্রধান কর্তব্য। এদের ঘেরাওয়ে ফেলে রেখে আমরা চলে যেতে পারি না।

আমি তখন দেখছি, আশরাফ ভাইয়ের চেহারায় শাহাদাতের খুনরাঙ্গা জ্যোতি খেলে যাচ্ছে। সাথীদের মুক্তি ও প্রতিশোধের দুর্বার আকাঙ্খা তাকে করে

তুলছে দুর্দমনীয়। আমার কথোপকথনের মধ্যেই হাজির হল আশরাফ ভাইয়ের আব্বা। সেনাদের সাথে মোকাবেলার সিদ্ধান্ত শুনে তিনিও নিষেধ করলেন না। ছেলে যেমন দৃঢ় ঈমান ও অসীম সাহসের পাহাড়, পিতাও অনুরূপ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার দরিয়া। তদুপরি পুত্রের অনিষ্ট চিন্তায় তার চোখে-মুখে একটা আশংকার কালিমা ভেসে উঠেছিল।

আশরাফ ভাই তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আব্বু, আপনি ঘরে চলে যান, আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই সাথীদের মুক্ত করে নিয়ে আসব।'

আমার মন সায় দিচ্ছিল না। একান্ত প্রিয়বন্ধু আশরাফ ভাইকে মোকাবেলায় পাঠিয়ে আমার পক্ষে থেকে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। আমিও তাঁর সাথে রওনা হলাম। গ্রামের শত শত নরনারী আমাদের কল্যাণের দু'আ করছিল। আশরাফ ভাইয়ের মা-বোনেরাও আমাদের বিজয় কামনা করে বিদায় জানালেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা কাউসা গ্রামের কাছে পৌঁছে গেলাম। তখনও থেমে থেমে ফায়ারিং চলছিল। কিন্তু কোন আর্মি বা মুজাহিদ আমাদের চোখে পড়ল না। গ্রামের পেছনে থেকে একটা নদী বয়ে গেছে। নদীর পাড়ে আর্মিরা উঁচু বাংকার তৈরী করে রেখেছে।

আমরা নদীর উপর সরু কাঠের সেঁতু পেরিয়ে ওপারে উঠলেই আর্মি নজরে পড়ল। কিছু সাধারণ লোক এদিক-সেদিক ঘোরা-ফেরা করছিল। আশরাফ ভাই বললেন, 'আমাদের পিছিয়ে পুলের ওপারেই থাকতে হবে। এখান থেকে আর্মির উপর ফায়ার করলে সাধারণ লোকজন ক্রস ফায়ারের মধ্যে পড়ে যাবে।'

আমরা পিছিয়ে এসে নদীর পাড়ের মোর্চার আড়ালে পজিশন নিলাম। আশরাফ ভাই আমাদের একটু দূর থেকে টার্গেট নিলেন। আশরাফ ভাই বললেন, 'আমি সামনের আর্মিদের উপর গুলী চালাব। ওরা যদি পুল পেরিয়ে এপারে আসতে চায়, তাহলেই তোমরা ওদের আক্রমণ করবে, এভাবে আমরা ওদের উপর চাপ বৃদ্ধি করলে এদিকে ওরা ঝুকে পড়লে ঘেরাও শিথীল হয়ে যাবে। এই সুযোগে মুজাহিদরা পালাতে সক্ষম হবে।'

আমি আশরাফ ভাইয়ের সাথে বসে গেলাম। কয়েকজন আর্মিকে দেখলাম এগিয়ে আসছে। আশরাফ ভাই এদের উপর হামলা করল, ওরা হয়ত এরকম হামলার আশংকা করেনি, তাই দ্রুত পালিয়ে গেল।

ওরা আমাদের সংখ্যা সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারেনি। কিছুদূর গিয়ে হয়ত ওরা ভেবেছে মাত্র একটি রাইফেলের গুলী হল। হয়ত কোন এক মুজাহিদ নিজের উপস্থিতি জানিয়ে দিচ্ছে। কয়েকজন আর্মি দৌড়ে এল নদীর তীরে। আমরা যদিও নদীর পাড় থেকে দূরে, কিন্তু অন্যান্য সাথীরা তীরেই ছিল। আর্মিদের কাছে আসতে দেখে তারা সবাই এক সাথে ট্রিগার টিপে দেয়। আর্মিরা আবার দৌড়ে আশ্রয় নিয়ে জবাবী ফায়ার করল।

আর্মিরা ছিল মোর্চাবন্দী, অস্ত্র ও সংখ্যায় শক্তিশালী। আমরা শুধু ক্লাসিনকোভ দ্বারা না ওদেরকে হটাতে পারছিলাম, না ওদের উপর কঠিন হামলা করতে পারছিলাম।

আমাদের এক সাথীর কাছে রকেটলাঞ্চার ছিল। আশরাফ ভাই আমাকে বললেন, 'কাউকে বলুন রকেট বহনকারীকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে সে যেন ওর স্থানে অবস্থান নেয়।' আমি ক্রোলিং করে আমার একেবারে নিকটের মুজাহিদকে বললাম, 'আপনি রকেটলাঞ্চারধারীর স্থানে গিয়ে ওকে আশরাফ ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিন।'

অল্পক্ষণ পরেই আশরাফ ভাইয়ের দিক থেকে রকেটলাঞ্চার আঘাত হানল আর্মির অবস্থানে। ধূলো-বালি উড়তে দেখা গেল। ওদের পক্ষ থেকে জবরদস্ত জবাবী হামলা শুরু হল। দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল তুমুল যুদ্ধ।

অল্পক্ষণের মধ্যে আগুনের কুণ্ডলি আর গোলার আঘাতে ধূলোবালু উড়তে শুরু করল আকাশের দিকে। একটু পরে আর্মিদের পক্ষ থেকে কিছুক্ষণ কোন গুলী বর্ষিত হল না। হয়ত মোর্চায় অবস্থানরত আর্মিরা আহত বা নিহত হয়েছিল। ওদিকের আর্মিরা ঘেরাও ছেড়ে সবাই আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমাদের হাতে গোলাবারুদ ছিল খুবই কম, কিন্তু তবুও আমরা পুল পেরিয়ে তাদের অগ্রসর হতে দিচ্ছিলাম না। উভয় দিকে কান ফাটানো গোলাবর্ষণের আওয়াজ, এদিকে আমাদের বুলেট শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম।

আশরাফ ভাই আমাকে খবর পাঠালেন, অন্যান্যদের পিছু হটার নির্দেশ দিতে। আমি নদীর তীরের সাথীদের পাহাড়ের উপর দিকে ক্রোলিং করে পিছিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়ে আমিও আর একজনকে নিয়ে পিছাতে থাকলাম।

আশরাফ ভাই একা তখনও স্বস্থানে অবস্থান করছিল। আমি গুলী করতে করতে পিছিয়ে যাচ্ছি, যাতে ওরা দ্রুত এগিয়ে আসার সাহস না পায় এবং সাথীরা নিরাপদ দূরে চলে যেতে পারে। এক পর্যায়ে আমিও পিছিয়ে সামনের দিকে চলে এলাম। আশরাফ ভাই একা ভিন্ন পথে রয়ে গেছেন।

সানুরাকুলিপুরা এসে দেখি মানুষ এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে পালানোর জন্যে। গ্রামের মানুষ আশংকা করছে মুজাহিদরা পিছিয়ে এলে আর্মি এ গ্রামের উপর চড়াও হতে পারে। আমারও আশংকা ছিল তাই। এক কিশোরকে ডেকে বললাম, 'গ্রামের সকল কিশোর যুবককে বাইরে চলে যেতে বল। ক্রেক ডাউন পড়লে এদের ঝামেলা হবে।'

এরপর এ গ্রাম ছেড়ে আমিও নিরাপদ অবস্থানে চলে গেলাম।

সন্ধ্যায় সানুরাকুলীপুরে এসে দেখি, সবার চোখে-মুখে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। আশরাফ ভাইয়ের মাকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আশরাফ ভাই কোথায়?

তিনি জিজ্ঞাসু নেত্রে আমাকে বললেন, 'কেন, সেই যে বেরিয়ে গেল এখনও ফিরেনি।'

আশরাফ ভাই আর্মিদের মোকাবেলায় আমাদের সাথে ছিল একথা আমি ইচ্ছা করেই তাঁর মাকে জানাইনি। আশরাফ ভাইয়ের ফেরার বিলম্বে সবার চেহারায়ও ফুটে উঠল উৎকণ্ঠা। গ্রামের এক লোক বলল, 'বেটা, দু'আ কর, শুনেছি দু'জন মুজাহিদ শহীদ হয়েছে।'

এ সংবাদ শুনে আমি শরীয়া আদালতের স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছে গিয়ে বললাম, আপনি থানায় গিয়ে জেনে আসুন, কে কে শহীদ হয়েছেন। চেয়ারম্যান সাথে সাথে মোটর সাইকেলে খবরের সত্যতা যাচাই করতে থানায় যান। (এখানে জেনে রাখা দরকার, কাশ্মীরে প্রতিগ্রামে মুজাহিদদের সমর্থিত একজন চেয়ারম্যান সামাজিক অপরাধ ও প্রয়োজনীয় বিচারানুষ্ঠান শরীয়তের বিধান মতে করে থাকেন)

চেয়ারম্যান চলে যাওয়ার পরই প্লাটুন কমাণ্ডার শবনমের সাথে আমার দেখা। তিনিও আমাকে শাহাদাতের সংবাদ দিলেন, যে সংবাদ আমি মোটেও শুনতে চাচ্ছিলাম না। তিনি বললেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আশরাফ ভাই শহীদ হয়েছেন।'

আমি বললাম, 'আপনি কি করে নিশ্চিত হলেন, আশরাফ ভাই শহীদ হয়েছেন?'

'শবনম বলল, 'আমরা আর্মি ঘেরাও থেকে পালানোর সময় দেখেছি, আশরাফ ভাই আমাদের আগে আগে যাচ্ছেন। আমরা যে যেদিকে পেরেছি পিছিয়ে গিয়েছি। কিন্তু ততক্ষণে আশরাফ ভাইকে আর্মিরা ঘিরে ফেলেছে। এখন পর্যন্ত তাঁর না পৌঁছার অর্থই হল তিনি আর্মিদের হাতে শহীদ হয়েছেন।'

আমি শবনমকে বললাম, আপনি এখনই একথা অন্য কাউকে বলবেন না।

দু'ঘন্টা পরে চেয়ারম্যান ফিরে এলেন, তার চেহারায় দুশ্চিন্তা ও শোকের চিহ্ন। অবস্থাটা এমন ছিল যে, তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেই তিনি কেঁদে ফেলবেন।

আমি তাকে অন্য ঘরে নিয়ে একাকী জিজ্ঞেস করলাম, কি খবর নিয়ে এলেন?

তিনি সেই হৃদয়-বিদারক খবরটি বললেন, 'আশরাফ ও একজন পাকিস্তানী শহীদ হয়েছেন।'

আমি সব সময়ই যে কোন কঠিন সংবাদ শোনার মত মনোবল পোষণ করতাম। কিন্তু আশরাফ ভাইয়ের মৃত্যু আমাকে ভীষণভাবে দুর্বল করে ফেলল। একসাথে দীর্ঘদিন যাবৎ পাশাপাশি দু'জন জিহাদের ময়দানে বিচরণ করেছি। কিন্তু তিনি মনযিলে মকসুদে চলে গেলেন আর আমি এখনও রয়ে গেলাম ঝড়-ঝঞ্জামময় দুনিয়ায়।

কমাণ্ডার শের খান

খুনরাঙা পথ

[কমাণ্ডার শের খান আযাদ কাশ্মীরের একজন বীর মুজাহিদ। স্বজাতির আযাদী অর্জনের লক্ষ্যে কাশ্মীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেনাক্যাম্পে সফল আক্রমণ চালিয়ে ভারতীয় সেনাদের মনে তিনি ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৯৪ সালে কাশ্মির জিহাদের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি পাকিস্তান থেকে পুনরায় সদলবলে কাশ্মীরে পৌছেন। দীর্ঘ আট মাস কাশ্মীরে অবস্থান করে তিনি বিভিন্ন সেনাঘাঁটিতে আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁর নিজের বিবরণীতেই তা চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনাই হুবহু এখানে তুলে ধরা হয়েছে]

বিপদসংকুল পথে যাত্রা শুরু

সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ এর এক আঁধার রাতে আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে জিহাদের উদ্দেশ্যে আমরা কাশ্মীর রওনা হই। এ বরকতময় কাজের জন্যে আমাদেরকে মনোনীত করা ছিল আল্লাহর অপর করুণা ও অনুগ্রহ। আমাদের দলে আমরা ২৮ জন মুজাহিদ। অধিকৃত কাশ্মীর রওনা হবার আগে আমাকে মুজাহিদদের আমীর নিযুক্ত করা হয়। নায়েবে আমীর আরশাদ ভাই সফর শুরু হওয়া মাত্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। আরেক উদ্যমী সাথী আমের ভাইও অসুস্থ হয়ে যান।

এভাবে সফর শুরু হওয়ার সাথে সাথে আমাদের জিহাদের পথে সমস্যার সূত্রপাত হয়। আমি আমার অসুস্থ সংগীদ্বয়কে সাহস দিতে থাকি। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁদের রুগ্ন দেহ নিস্তেজ হয়ে আসে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাঁদের পা একেবারে নিশ্চল হয়ে যায়। আমরা যাত্রা মুলতবী করে সেখানে থেমে যাই।

কিন্তু গাইডরা পরামর্শ দিল যে, এদেরকে এখানে রেখে যাত্রা অব্যাহত রাখা হোক। কারণ, সবেমাত্র সফর শুরু। প্রথমেই যখন এরা অসুস্থ হয়ে পড়ল, তো পরের অবস্থা কী হবে! সামনে আমাদের অতিক্রম করতে হবে আকাশচুম্বী সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ, সীমাহীন দুর্গম পথ।

কিন্তু তাদের এ পরামর্শ আমার মনঃপূত হল না। আমি বললাম, এখানে যদি আমাদের আট রাতও অপেক্ষা করতে হয়, তা-ও করব, তবুও সাথীদেরকে ফেলে যাব না।

তারপর আমি অসুস্থ সাথীদের রাইফেল ও সরঞ্জামাদির কিছু নিজে তুলে নেই আর অবশিষ্টগুলো অন্য সাথীদের মধ্যে পালাক্রমে বহন করার দায়িত্ব দিয়ে ধীরে ধীরে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে শুরু করি।

মাল-পত্র পিঠে করে দুর্গম গিরি অতিক্রম করার অনুশীলন আগে থেকেই আমার ছিল। কিন্তু ২৫/৩০ কিলোঃ ওজনের সরঞ্জাম কারো পক্ষেই কম নয়। তদুপরি ঘোর অন্ধকার, পদে পদে বিপদের শংকা আর পাথুরে চড়াই তো আছেই। অতি মন্থর গতিতে রাতের শেষ প্রহরে আমরা এক জঙ্গলে গিয়ে উপনীত হলাম। এখানে সাথীদেরকে ঘুম পাড়িয়ে আমি আকবর ভাইয়ের সাথে পাহারাদারীতে নিয়োজিত হলাম।

প্রত্যুষে সাথীদের ঘুম থেকে জাগ্রত হবার পর আমাদেরও কিছু সময় বিশ্রাম নেয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু গাইডরা জানাল যে, এ অঞ্চলে বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। এক্ষুণি আমাদের সম্মুখপানে রওনা হওয়া উচিত। অগত্যা বিশ্রাম না করেই আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। দুপুর পর্যন্ত আমাদের এ চলা অব্যাহত থাকে। আমের ও আরশাদ ভাইয়ের অসুস্থতার কারণে সফর খুব ধীর গতিতে হচ্ছিল। দুপুরের সময় একস্থানে যাত্রা বিরতি দিয়ে আহার ও নামায আদায় করার সিদ্ধান্ত হল।

প্রত্যেকে নিজ নিজ পুটুলি থেকে একটি করে রুটি বের করে আহার পর্ব শেষ করলাম। এ ধরনের সফরে বেশী খাওয়া শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি করে, তাই আমরা মাত্র কয়েক লোকমা করে খেয়ে নিলাম। আরশাদ ভাই কিছুই না খেতে চাওয়ায় সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। বিলকুল না খেয়ে তিনি বাঁচবেন কী করে, এমন কঠিন পথ অতিক্রমই বা করবেন কেমনে?

আমরা সকলে মিলে তার সুস্থতার জন্যে দু'আ করি। আরশাদ ভাইয়ের শরীর দুর্বল হলেও তার মনোবল কোন অংশেই কম ছিল না। তিনি বললেন, 'আপনারা আমার জন্যে চিন্তা করবেন না। আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছি। তিনি অবশ্যই আমাদেরকে সাহায্য করবেন।' যোহর নামাযের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সাথীদের সংগে পরামর্শ করে আমি জানিয়ে দিলাম যে, অসুস্থ ও দুর্বল সাথীদেরকে কোনক্রমেই আমরা পথে রেখে যাব না। পেছনে ফিরে যাওয়া এখন আর তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ঘোষণা শুনে সকল সাথী পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলল যে, 'ঠিক আছে, প্রাণ দিতে হয় দেব, তবুও সাথীদেরকে নিঃসঙ্গ ও নিরুপায় অবস্থায় ফেলে যাব না।'

আবার যাত্রার পালা। কিন্তু আরশাদ ভাইয়ের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হল না। হাঁটার শক্তি তাঁর নেই। অবিরাম বমি হচ্ছে, গায়ে জ্বর। কিন্তু তাঁর মনোবল দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। অন্যদেরকে, বিশেষ করে আমের ভাইকে তিনি সাহস দিচ্ছেন। অগত্যা তাঁকে নিয়ে ধীরপদে আমরা রওনা হলাম।

আরশাদ ভাই পথে কোথাও বেশী অসুস্থ বোধ করলে, তার শরীর মনের কামনার সাথে সায় না দিলে অত্যন্ত ব্যাথিত হৃদয়ে তিনি বলতেন, 'আমাদের দু'জনের জন্যে আপনারা ২৮ জন মুজাহিদ নিজেদেরকে বিপদে ফেলবেন না। আমাকে আর আমের ভাইকে রেখে আপনারা এগিয়ে যান।'

কিন্তু কেউই তাঁর এ কথার সাথে একমত হল না। সাথীদের এমন নিষ্ঠা ও হৃদ্যতা দেখে আমি আনন্দিত হলাম। বিশেষ করে আরফাক ভাইয়ের উপস্থিতিটা ছিল আমার মনোবল ও সাহসিকতার বিরাট এক পুঁজি। বারবার তিনি বলছেন যে, 'দেখুন, কোথাও কোন সাথী ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি যেন রাইফেলটা আমার কাছে দিয়ে দেন।'

মাগরিবের নামায জামাতের সাথে আদায় করা হল। সামনে রাতের কঠিন সফরের পালা। তাই আমরা অনুনয়-বিনয় ও কাকুতি-মিনতি করে মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করলাম। তিনি-ই তো আঁধার রাতে পথ দেখান, বিপদে সাহায্য করেন।

আমাদের যে সাথীর কাছে পিকাগান ছিল, তার নাম ফয়সাল। তারও হাটুতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। তাকে নিয়েও আমাদের আশংকা ছিল যে, পথে কোথাও সে পেছনে থেকে গেলে আমাদের বিপদের সীমা থাকবে না। তাছাড়া অসুস্থ ভাইদের নিয়ে আলাদা পেরেশানী তো আছেই।

মোটকথা, সফরের প্রতিটি মুহূর্ত, পথের প্রতিটি কদম যেন আমাদেরকে এ কথাটি বলে যাচ্ছিল, 'জীবন কারো প্রিয় হলে এখান থেকেই তুমি কেটে পড়, সম্মুখপানে আর তুমি অগ্রসর হয়ো না।'

কিন্তু জীবনের মায়া আছে কার? এখানে সবাই তো কাঁটায় জড়িয়ে জীবন দিতে এসেছে। আল্লাহর পথের সৈনিকদের আবার জীবনের মায়া! এবার রওনা দেয়ার আগে আমি আমার সবচেয়ে সাহসী সাথী আরফাক ভাইকে সঙ্গে নিয়ে গাইডদেরকে বলে দিলাম যে, তোমরা মুজাহিদদের নিয়ে অগ্রসর হতে থাক। পথে কোথাও থামবে না। কোন সাথী পেছনে থেকে গেলে আমরা তাকে সাথে করে নিয়ে আসব। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা নিলাম, অসুস্থ ভাইদের যদি কাঁধে করেও নিতে হয়, তবে এ কাজও আমি করব।

আরো তিন ঘন্টা কেটে গেল। আরশাদ ও আমের ভাইদের পা আর চলে না। আরো তিন সাথী মুদ্দাচ্ছির, রাহীল ও সাইফুল্লাহর অবস্থাও খারাপের দিকে। এরা তিনজন ভাওয়ালপুরের বাসিন্দা, আল্লাহর রাহে জীবন দেয়ার স্পৃহা এদেরকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এসেছে।

সমতল মাঠে-ময়দানে চলার মানুষ আকাশচুম্বী পর্বতমালা আর দুর্গম গিরি পথে কতক্ষণ আর কতটুকু চলতে পারে। তাদের রাইফেলগুলো আমি আরফাক ভাইয়ের হাতে সোপর্দ করে নিজে তাদের পোটলা-পাটলি তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। বেশ কিছুক্ষণ আমরা ধীর গতিতে হাঁটতে থাকি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা পাঁচজন নিশ্চল হয়ে বসে পড়ে। আমি তাদেরকে সাহস দেয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু উত্তরে তারা বলে দেয়, 'আমাদেরকে আপনি গুলী করে মেরে ফেলুন, তবুও হাঁটতে বলবেন না।'

অচেনা মদদগার

এ কঠিন বিপদের সময় একটি শিয়াল আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। এসব বনে বিপুলসংখ্যক শিয়াল ও বানর বাস করে। গহীন অন্ধকারে আমাদের নিকটে আসা শিয়ালটি অন্যদের নিকট অপরিচিত হলেও আমি ব্যাপারটা বুঝে ফেলি। একটা কিছুর আগমন টের পেয়ে সাথীরা পরস্পর কানে কানে বলতে শুরু করে, 'মনে হয় ভারতীয় সৈন্যরা এসে পড়েছে। তাই এখানে না থেমে নিঃশব্দে আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়া উচিত।'

অজানা শত্রুর ভয় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তাদের দেহের শিরা-উপশিরায় যেন শক্তির বান ডাকে। নিশ্চল পা আবার চলতে শুরু করে।

কিছুদূর অগ্রসর হবার পরই আমরা আমাদের অন্যান্য সাথীদের সাথে মিলিত হই। একস্থানে থেমে তাঁরা আমাদের অপেক্ষা করছিল। সেখানে সকলের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে ক্লান্ত ও অসুস্থ মুজাহিদদের কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রামের সুযোগ দেয়া হল। এ সুযোগ অন্যান্য সাথীরাও শুয়ে পড়ে। আমার বীর সাথী আরফাক ভাই দ্বিতীয়বারের মত আমার সঙ্গে পাহারায় যোগ দেন।

এ অবস্থায় অল্প কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে মাত্র। হঠাৎ এক দিক থেকে ভয়ঙ্কর ও প্রচন্ড একটি শব্দ ভেসে আসে। আমার সাথী আরফাক ভাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমার আশংকা হল, ভারতীয় সৈন্যরা আমাদের আগমন টের পেয়ে গেল কিনা।

রাইফেলের ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে আমি সতর্ক অবস্থায় বসে থাকি। এ ভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। কিন্তু আর কোন আওয়াজ শোনা গেল না। আমি নিশ্চিন্ত হলাম। ভাবলাম, এটা কোন বন্য প্রাণীর আওয়াজই হবে। ভারতীয় সৈন্যরা এত বীর নয় যে, এ গভীর বনে শোরগোল করতে করতে আসতে সাহস পাবে।

সেপ্টেম্বর মাস। পাহাড়ী অঞ্চলে তখন প্রচন্ড শীত। শিশির পড়ে মাটি আদ্র ও ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ তীব্র শীতের মধ্যেও আমার সাথীরা নিশ্চিন্ত মনে দিব্যি আরামে ঘুমাচ্ছেন। তাদের এ বিশ্রামে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে আমি নিজেও কতক্ষণ ঘুমিয়ে কতক্ষণ জেগে ভোর পর্যন্ত পাহারা দিতে থাকি।

ভোর পাঁচটার সময় আমি সাথীদেরকে নামাজের জন্যে তুলে দেই। কয়েকজন সাথী অলসতা হেতু এপাশ-ওপাশ করতে শুরু করলে আমি কঠোর ভাষায় বললাম, এ কঠিনতর সফর এবং ভয়ানক স্থানে নামায আর দু'আই তো আমাদের একমাত্র সম্বল। তাই আর বিলম্ব না করে উঠে ওযু করে নামাযটা আদায় করে নাও।

নামাযের পর আকবর ভাই ও ফয়সাল ভাইয়ের উপর পাহারার দায়িত্ব অর্পণ করে আমি আর আরফাক ভাই শুয়ে পড়ি। শোয়ার পর আমার মনে চিন্তা এল,

পাছে আবার এমন না হয় যে, আমি উদাসীনভাবে ঘুমিয়ে যাব আর শত্রু বাহিনী হঠাৎ এসে হামলা করে বসে।

তাই সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আমি জেগে গেলাম। অথচ আজ দু'দিন যাবত বিশ্রামের এতটুকু সুযোগও আমার হয়নি। গাইডদের ঘুম থেকে উঠিয়ে আমি তাদেরকে বলে দিলাম, যেন তারা সজাগ দৃষ্টি রাখে। প্রহরীদেরকেও গাইডদের ব্যাপারে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে বলে দিলাম। কারণ, তাদের মধ্যে শত্রু পক্ষের কেউ থাকাটা মোটেও বিচিত্র নয়। তাদের কেউ যেন একাকী কোন দিকে যেতেও না পারে। এরপর নিশ্চিন্ত মনে আবার শুয়ে পড়ি।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হরেক রকমের স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে খানা খেলাম, চা পান করলাম। দীর্ঘ নিদ্রার পর জাগ্রত হয়ে সাথীদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জোহর নামায আদায় করে আবার শুয়ে পড়লাম। ইতিমধ্যে খবর পেলাম, আরশাদ ভাই ও আমের ভাইয়ের অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে।

জিহাদের বরকত

সাথীদের অসুস্থতার খবরে আমি অস্থির হয়ে পড়ি। কী করব, কিছুই ভেবে পেলাম না। ঔষধ-পত্র যা কিছু আমাদের কাছে ছিল, তা আরো আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় বসে বসে ভাবতে লাগলাম, কী করা যায়।

হঠাৎ মনে পড়ল, আমার থলেতে কিছু ডালিম আছে। ডালিমগুলো বের করে ভেঙ্গে আমি তাদেরকে খেতে দিলাম। দু'জনই ডালিমগুলো পরম আগ্রহের সাথে খেয়ে ফেলে। তাদের মুখমন্ডলে আনন্দের দীপ্তি দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম। কিছুটা সুস্থতা অনুভব করার পর তাঁরা গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েন। আল্লাহর ইচ্ছে থাকলে ডালিমের কয়েকটি দানাও ঔষধ হয়ে যায়।

রোগীদের সাথে আমিও পুনরায় শুয়ে পড়ি। ঘুম থেকে উঠে সাথীদেরকে আসরের নামাযের জন্যে উঠিয়ে দেই। জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করে আমরা এ অভিযান সফল করার জন্যে আল্লাহর দরবারে দু'আ করি।

দু'আ শেষে পুনরায় সফর শুরু হয়। আমাদের রুগ্ন সাথীদ্বয় এখনো সফরের শক্তি ফিরে পায়নি। এদিকে কাশ্মীর উপত্যকাও আর বেশী দূরে নয়। অত্যন্ত সাহসের সাথে পা টেনে টেনে তাঁরা আমাদের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করেন।

আমার কাছে তিনটি রাইফেল আর দু'টি পুটুলী। অতিরিক্ত তিনটি রাইফেল ছিল আরফাক ভাইয়ের কাঁধে। নায়েবে আমীর তখন আরফাক ভাই। আমীর ও নায়েবে আমীর দু'জনই কাফেলার একেবারে পেছনে হাঁটছিলাম। যে পরিমাণ সরঞ্জাম আমরা দু'জনে বহন করছিলাম, তা বহন করা চার জনের পক্ষেও কষ্টকর ছিল। এটাও আল্লাহ তা'আলার বিশেষ একটি অনুগ্রহ, তিনি তাওফীক না দিলে এত কষ্ট স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ সবই ছিল জিহাদের রাহের বিশেষ বরকত।

আমরা যে পথে হাঁটছিলাম, তা এত দুর্গম ছিল যে, রাতের বেলা তাতে শূন্য পদে হাঁটতে পারা আল্লাহর বিশেষ মদদ ছাড়া সম্ভব ছিল না। দুর্গম পথে কাঁধে ভারী বোঝা বহন করে ক্লান্ত ও অবসন্ন পায়ে আমরা হেঁটেই চলছি। কিন্তু কোন দুঃখ নেই, নেই কোন বেদনা। আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে বের হতে পেরেছি, এতেই আমরা ধন্য।

আমরা অবিরাম দীর্ঘ পাঁচঘন্টা চলতে থাকি। রাত তখন তিনটে বাজে। গাইডদেরকে থামিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাশ্মীর পৌছুতে আর কত সময় লাগবে?

তারা জানাল, 'এখনো আট ঘন্টার সফর বাকী আছে।'

আমি বললাম, তাই যদি হয়, তাহলে দিবালোকে শত্রুদের ফাঁড়ির সম্মুখে দাঁড়াবার পরিবর্তে এখানে অবস্থান নিয়ে বিশ্রাম নেয়াই উত্তম হবে।

আমি আমার সাথীদেরকে জরুরী উপদেশ প্রদান করলাম যে, আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় চুপচাপ সময় অতিবাহিত করবেন। একান্ত প্রয়োজনেও কারুর নড়াচড়া করার অনুমতি নেই। আরশাদ ও আমের ভাইয়ের স্বাস্থ্য ও মানসিকতা ভালো না থাকায় তাদের ব্যাপারে আমি খুব ভাবনায় পড়ে গেলাম। কারণ, শত্রবাহিনী আমাদের আগমনের কথা টের পেয়ে গেলে যদি আমাদের পালাতেই হয়, তাহলে অসুস্থ এ দু' ভাইয়ের উপায় কী হবে। পালাবার মত কোন শক্তিই তো এদের নেই।

নির্দেশ অনুযায়ী সাথীরা সকলে নিজ নিজ স্থানে নিশ্চুপ বিশ্রাম করতে থাকে। সকলের মধ্যে পরম নিষ্ঠা ও সৌহার্দের পরম বন্ধন স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। আরফাক ও আমি অসুস্থ আরশাদ ভাইকে নিজের বাহুর উপর শুইয়ে নেই আর রাইফেল নিয়ে পাহারার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাই। দু'ঘন্টা পর্যন্ত আমি নীরবে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পাহারা দিতে থাকি। সাথীদের নাক ডাকার আওয়াজ ব্যতীত অন্য কোন সাড়া নেই। এক প্রচন্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে চতুর্দিকে।

দু' ঘন্টা পর হঠাৎ কয়েকটি কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ভেসে এল আমার কানে। পরক্ষণেই চতুর্দিক থেকে বেশ কিছু টর্চের আলো বিচ্ছুরিত হতে শুরু করে। শত্রু বাহিনীর ক্যাম্প নিকটেই ছিল। এমন একটি ঘটনা ঘটতে পারে, আগে থেকেই আমি তা অনুমান করেছিলাম। কিন্তু তাতে ভয় পেলাম না। তাছাড়া আমি হলাম মুজাহিদ কাফেলার আমীর। আবার পাহারার দায়িত্বও ছিল আমার। এ কারণে, আমানতদারী ও খবরদারীর অনুভূতি আমার অপেক্ষাকৃত বেশীই ছিল।

কোন সাথীকে গভীর নিদ্রা থেকে জাগানো সঙ্গত মনে হল না। মহান আল্লাহর দরবারে অক্ষমতার কথা প্রকাশ করে আমি দু'আ করতে শুরু করলাম, 'প্রভু হে! তোমার বান্দাদের তুমি নিজেই রক্ষা কর।'

হাত তোলার সাথে সাথে মনটা আমার মোমের মত গলে যায়। অশ্রু ঝর ঝর নেত্রে আরজ করলাম, 'আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে হেফাজত কর, তুমিই আমাদের একমাত্র সহায়, তুমি ছাড়া আমাদের কেউ নেই।'

এভাবে কাকুতি-মিনতির মধ্য দিয়েই আমার রাতের অবসান হল। ফজর নামায আদায় করে আমি সাথীদেরকে সফর পুনরায় শুরু না হওয়া পর্যন্ত ঝোপের মধ্যে নীরবে বসে থাকতে বললাম। এমনকি হাঁচিটা পর্যন্ত সাধ্য মত দমন করে রাখতে বলে দিলাম।

আরফাক ভাইকে পাহারার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আমি গভীর নিদ্রায় তলিয়ে গেলাম। তখনো আমি কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন। এ সময়ে জনৈক সাথী আমাকে আলতোভাবে নাড়া দিয়ে কানে কানে বলল, এখান থেকে অনুমান একশ' মিটার দূরে ভারতীয় সৈন্যের একটি টহল বাহিনী দেখা যাচ্ছে।

ঈমানের অস্ত্র

এ খবর শুনে সংগে সংগে আমি উঠে গেলাম। দেখতে পেলাম, আমাদের থেকে অল্প দূরেই ওরা ঘোরা-ফেরা করছে। আমাদের দিকে না তাকালেও আমাদেরকে দেখে ফেলেছে হয়ত। আমি সাথীদেরকে পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়ার আদেশ দিলাম। কিন্তু সাথে সাথে বলেও দিলাম, যে পর্যন্ত মনে না হবে যে, ওরা আমাদের দিকে আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কোন শব্দ করবে না।

সকল সাথীকে আমি সূরা ইয়াসীন পড়ে শত্রুদের দিকে ফুঁ দেয়ার পরামর্শ দেই। শুধু জাগতিক অস্ত্রই নয়, আত্মিক অস্ত্রও মুমিনের বিরাট সম্বল। এ আমলটি আমরা কয়েকবারই পালন করি।

এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সৈন্যরা আমাদের উপস্থিতি টের পেল না এবং একটু পরেই তারা তাদের ক্যাম্পের দিকে চলে যায়। শংকামুক্ত হয়ে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম।

আমরা যে ক'জন সাথী জাগ্রত ছিলাম, কেবল সে ক'জনই যোহরের নামাযটা আদায় করে ফেলি। আর অবশিষ্ট যারা অনতিদূরে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, সতর্কতার খাতিরে তাদেরকে আর জাগানো হল না। এভাবে আসরের সময়ও আমরা তাদেরকে জাগালাম না। [জিহাদের ময়দানে নামায মাফ হয় না ঠিক, কিন্তু প্রয়োজনে বিলম্ব করার অনুমতি আছে]

মাগরিবের নামাযের পর ক্রোলিং করতে করতে আমি প্রথমে গাইডদের নিকট পৌঁছে সফরের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দিলাম। তারপর সাথীদেরকে এক এক জন করে জাগিয়ে তাদেরকেও প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দেই। ঘুম থেকে জেগে হাত-মুখ ধুয়ে তারা হালকা কিছু খাবার খেয়ে নেয়। কারণ সামনে আমাদের অপেক্ষা করছে ধৈর্য যাচাইকারী দীর্ঘ সফর।

আল্লাহর যিকির করতে করতে আমাদের অপেক্ষার ক্ষণটির এক সময়ে অবসান ঘটে। রাতের নিশ্ছিদ্র গভীর আঁধারে আমাদের সফর পুনরায় শুরু হল। পা টিপে টিপে অতি সতর্কতার সাথে আমরা সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকি।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আমরা এমন একটি স্থানে উপনীত হলাম, যেখান থেকে আমাদের উর্ধ্বে আরোহণ করতে হবে। কিন্তু উপরে উঠার পথটি এতই দুর্গম যে, উঠতে গিয়ে আমাদের অসুস্থ সাথী দু'জন আমের ও সাইফুল্লাহ ভাই নীচে পড়ে যায়।

এখন নীচে গিয়ে তাদেরকে তুলে আনতে হবে। কিন্তু কিভাবে? একে তো সাথে আমার বহন ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশী ভারী বোঝা। তাছাড়া নামার জন্যে এসব রাখব কোথায়? নীচে নামবই বা কী করে? ওদেরকে নিয়ে আবার উপরে ওঠার উপায়ই বা কী?

অবর্ণনীয় এক সমস্যায় পড়ে গেলাম। কিন্তু কুদরত আমাদের সহায়তা করে। এ গহীন জঙ্গলে পরিত্যক্ত লম্বা একটি কাঠ আমাদের কাজে আসে। কাঠটি নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে পালাক্রমে উভয় সাথীকে উপরে তুলে আনি।

পথে এক স্থানে পানির একটি নালা পাওয়া গেল। আমরা সকলেই পিপাসায় কাতর ছিলাম। কিন্তু আমি কঠোরভাবে সকলকে সতর্ক করে দিলাম, যেন কেউই এখান থেকে পানি পান করার চেষ্টা না করে। পানি পান করলে সামনে অগ্রসর হওয়া দুষ্কর হয়ে পড়বে।

অধিকাংশ সাথী আমার নিষেধাজ্ঞা পালন করে। কিন্তু কয়েকজন পিপাসার তীব্রতা বরদাশ্‌ত করতে না পেরে আমার নিষেধের আগেই পানি পান করে ফেলে। অল্পক্ষণ হাঁটার পর তারা একেবারেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ফলে আমাদের সফরের গতি আরেকবারের মত মন্থর হয়ে যায়।

কিন্তু তারপরও আরশাদ ভাই ছাড়া সকল মুজাহিদ যাত্রা অব্যাহত রাখে। অসুস্থ আরশাদ ভাই এক স্থানে মাটিতে পড়ে যান। এবার উঠে দাঁড়ানোও তার পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়ে। অগত্যা আরশাদ ভাইকে কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করি।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর আমি ক্লান্ত হয়ে গেলে আরশাদ ভাই বলল, 'ভাই! আমাকে নামিয়ে দিন, চেষ্টা করে দেখি, নিজেই হাঁটতে পারি কিনা।'

আমি কাঁধ থেকে তাকে নীচে নামিয়ে দিলাম। তিনি ক্লান্ত দেহে পা টেনে টেনে কোন রকমে হাঁটতে শুরু করেন।

আকাশ থেকে নেমে এল ঘুটঘুটে কালো আঁধার

সামান্য অগ্রসর হওয়ার পরে বন ও ঝোপ-ঝাড়ের বিস্তৃতি শেষ হয়ে যায়। জঙ্গল পার হয়ে আমরা একটি ময়দানে এসে উপনীত হলাম। চাঁদনী রাত,

ঝলমল করছে চাঁদের নির্মল আলো। এতটুকু ছায়াও নেই কোথাও। চাঁদের আলোয় আমাদের চলা-ফেরা, গতিবিধি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল বহু দূর থেকে।

কয়েক পা চলার পরে আমরা এক স্থানে এসে থমকে দাঁড়ালাম। কারণ, আমাদের একেবারে সামনে ভারতীয় আর্মির একটি পোস্ট। তার পাহারায় নিয়োজিত লোকদেরকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমি সাথীদেরকে বললাম, আমরা যখন তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি, তো একথা স্পষ্ট যে, তারাও আমাদেরকে দেখে থাকবে, তোমরা বসে পড়।

আমাদের সামনে ছিল একটি সড়ক, যা পার হয়ে আমরা অনায়াসে কাশ্মীর ঢুকে যেতে পারতাম। কিন্তু বাঁধ সাধল আর্মি পোস্টটি। আমার ধারণা মতে তারা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে। তাই আরও একবার আমরা অনুনয়-বিনয় করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলাম, 'প্রভু হে! আমাদের সহায় হও। আমাদের জন্যে একটু আঁধারের ব্যবস্থা কর, যাতে দুশমন আমাদেরকে দেখতে না পায়। আমরা যেন সড়ক পার হয়ে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারি।' আল্লাহ আমাদের আবেদন কবুল করলেন। মুহূর্তে আকাশ জুড়ে ভেসে ওঠে ঘোর কালো মেঘ। চাঁদের আলো ম্লান হয়ে নেমে আসে আমাদের কাংখিত অন্ধকার। এখন আর পথ-ঘাট কিছুই দেখা যায় না।

আমি সাথীদেরকে ডেকে বললাম, শীঘ্র উঠে এস। আল্লাহর সাহায্য এসে পড়েছে। আর দেরি নয়, ছুটে চল।

কাল বিলম্ব না করে আমরা দ্রুত রওনা হয়ে নিরাপদে সড়ক পার হলাম। এখন আমাদের আলোর প্রয়োজন। সাথে সাথে কালো মেঘ দূরীভূত হয়ে আকাশে ভেসে ওঠে সেই উজ্জ্বল চাঁদ। অন্ধকার দূর হয়ে ঝলমল করে ওঠে পরিবেশ। আমরা ধীর পদক্ষেপে সম্মুখপানে এগিয়ে চলছি। একটু অগ্রসর হওয়ার পরে কয়েকটি ঘর চোখে পড়ল। তা ভারতীয় পোস্ট বলেই মনে হল। কারণ, এখানে জনবসতি থাকার সম্ভাবনা খুবই কম।

আমরা আরেকবারের মত সমস্যায় পড়ে গেলাম। পিছনে সরে যাওয়া তখন আর সম্ভব ছিল না। আরশাদ ভাইকে এক স্থানে বসিয়ে রেখে বললাম, আমি ওই ঘরটির কাছে গিয়ে দেখি, যদি তা দুশমনের পোস্ট হয়, তাহলে নির্ঘাত আমার উপর ফায়ার করা হবে। তাই যদি হয়, তাহলে আমি যতক্ষণ সম্ভব মোকাবেলা করব। কিন্তু আপনি আমার কাছে না এসে এ নালা বেয়ে সোজা এগিয়ে যাব। বেঁচে থাকলে আমিও আপনার সঙ্গে মিলিত হব।

তারপর পা টিপে টিপে অগ্রসর হয়ে ঘরটির নিকটে পৌঁছে কয়েকটি ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। অতি সন্তর্পণে আমি ঘোড়াগুলোর একেবারে কাছে পৌঁছে যাই। ঘরে তখন আলো জ্বলছিল। মনে মনে ভাবলাম, এ যদি দুশমনের পোস্ট না হয়, তো জনবসতি হবে নিশ্চয়। তা-ই যদি হয়, তাহলে সাথীদের

খানাপিনার জন্যে কিছু খাদ্যদ্রব্য চেয়ে নেব। একথা ভেবে আমি আরও একটু অগ্রসর হলাম।

স্বজনদের মাঝে

রাইফেল তাক করে আমি সতর্ক পদক্ষেপে ঘরটির একেবারে কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। একস্থানে ঘরের দেয়াল কতটুকু ভাঙ্গা ছিল। রাইফেলটি দেয়ালের উপর রেখে আমি ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলাম, আমাদের এক মুসলিম বোন কুলোয় করে চাল ঝাড়ছে। আমার মনে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। আমি অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে মুসলিম ভাই-বোনদের সাথে মিলিত হয়ে কুশল বিনিময় করলাম। আরশাদ ভাইকে ডাক দিয়ে অন্যান্য সাথীদেরকে নিয়ে এখানে চলে আসার জন্যে বললাম।

আমরা পাকিস্তান থেকে এসেছি জানতে পেরে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে এবং আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা করে। তাদের সযত্ন আতিথেয়তায় খাওয়া শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে আবার আমরা সম্মুখপানে রওনা হলাম।

অবিরাম চলতে চলতে ভোর নাগাদ নিরাপদে কাশ্মীর উপত্যকায় উপনীত হই। বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ওজু করে ফজর নামায আদায় শেষে সব সাথী মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে দু'আ করলাম।

বহু চড়াই-উৎরাই আর অবর্ণনীয় প্রতিকূলতা ও বিপদাপদ অতিক্রম করে আমরা এখন জিহাদের ময়দানে। এ সফর ছিল আমাদের সৌভাগ্য ও শাহাদাতের সফর। এরূপ সফরের প্রতিটি কদমই সফলতার এক একটি মনযিল।

বিকেল তিনটা পর্যন্ত আমরা উপত্যকার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থান করি। এখান থেকে মারকাজের সাথে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করার সুযোগ ছিল। ওয়্যারলেস মারফত মারকাজকে জানালাম, 'আপনাদের কয়েকজন ভাই জিহাদে অংশ নেয়ার জন্যে কাশ্মীর পৌঁছে গেছে। আদেশ করুন আমাদের কী করতে হবে?' অপরদিক থেকে আনন্দভরা কণ্ঠে আমাদেরকে খোশ আমদেদ জানিয়ে বলা হল, 'আপনারা সামনে অগ্রসর হোন, আমরা আপনাদের সব ব্যবস্থাই করে দিচ্ছি।'

আমরা রওনা হয়ে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরে দেখতে পেলাম, বিপুলসংখ্যক মুজাহিদ ভাই আমাদেরকে অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছে। আমাদের আনন্দ তখন দেখে কে।

অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদেরকে প্রাথমিক বিশ্রামাগারে পৌঁছে দেয়া হল। বিশ্রামের সব ব্যবস্থাই সেখানে মওজুদ ছিল। স্থানীয় লোকজন খানা খাওয়ানের পরে আরাম শয্যায় আমাদের শুইয়ে দিয়ে নিজেরা পাহারার জন্যে যথাস্থানে চলে যায়।

সংক্ষিপ্ত বিশ্রামের পর আমরা সকলে সিজদাবনত হয়ে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। তারপর সাথীদেরকে সেখানে রেখে কেন্দ্রের নির্দেশ

জানার জন্যে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছি। সংক্ষিপ্ত আলাপ-পরিচয়ের পর সুপ্রীম কমাণ্ডার আমাকে অবিলম্বে কাপওয়াড়ার প্রধান কমাণ্ডার তাহের এজাজের সাথে যোগাযোগ করার আদেশ দিয়ে বললেন, 'আমাদের সব রকম নির্দেশনা আপনি তাঁর মাধ্যমেই লাভ করতে পারবেন। আপনি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। তিনি যেখানে ভালো মনে কর আপনাকে সেখানেই রাখবেন এবং আপনার কী করতে হবে, তিনিই তা বলে দেবেন।'

বিদায়ের প্রাক্কালে সুপ্রীম কমাণ্ডারকে আমি বললাম, আমরা সঙ্গে করে কিছু সরঞ্জামও এনেছিলাম। আমাদের আবেদন, যদি ভালো মনে কর, তো সে সব আমার দলের মুজাহিদদেরকেই প্রদান করুন, যাতে আমরা দুশমনের উপর অধিক সফল হামলা চালাতে পারি।

কমাণ্ডার আমার দরখাস্ত সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন না ঠিক, কিন্তু জেলা শাখার অধীনে কাজ করার এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংগঠনের আওতায় থেকে অস্ত্র ও অ্যামুনিশন ব্যবহার করার আদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন।

আদেশ শিরোধার্য জানিয়ে আমি সাথীদের কাছে ফিরে আসি। সাথীদেরকে প্রোগ্রাম সম্পর্কে অবহিত করে আমি বললাম, দু'দিন পর আমরা জেলা কমাণ্ডারের কাছে কাপওয়াড়ায় চলে যাব। এখন আপনারা এখানেই আরাম করতে থাকুন। এর মধ্যে আরশাদ ভাইকে ভালো ডাক্তার দেখিয়ে নেয়া দরকার।

তখন আমরা যে গ্রামে ছিলাম, তার অনতিদূরেই ছিল বাণ্ডিপুর এলাকা। সেখানে অভিজ্ঞ ডাক্তার পাওয়া যায়। কিন্তু পায়ে হেঁটে বান্ডিপুর যাওয়া খানিকটা দুষ্কর ছিল। কোন বাহন পাওয়া যায় কি না, ভাবতে ভাবতেই আল্লাহ তারও ব্যবস্থা করে দেন।

আমাদের রওনা হওয়ার খানিক আগে দুই মুজাহিদ ভাই ঘোড়ায় চড়ে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। দু'জনের একজন ছিল কমাণ্ডার তোফায়েল। মুজাহিদদের প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার তিনি জিম্মাদার। কাশ্মীর আগমনের জন্যে তিনি আমাদেরকে মোবারকবাদ জানান। তাঁর ঘোড়ায় চড়েই আমরা বান্ডিপুর গেলাম।

ধৈর্যের পরীক্ষা

বান্ডিপুরের কমাণ্ডার ওমর চাচা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাদের স্বাগত জানিয়ে তৎক্ষণাৎ আমাদের বিশ্রামের বন্দোবস্ত করেন। তার একটু পরেই তিনি আরশাদ ভাইয়ের চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার নিয়ে আসেন। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ-পথ্য প্রদান করেন।

ইতিমধ্যে সেখানকার মুজাহিদ ও স্থানীয় সাধারণ লোকদের মধ্যে আমাদের আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। বিপুল সংখ্যক লোক আমাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্যে মিলিত হয়। তাই সে রাতে আর আমাদের প্রত্যাবর্তন সম্ভব হল

না। ওয়্যারলেস মারফত সাথীদেরকে জানিয়ে দিলাম, যেন তারা এ রাতের জন্যে আমাদের অপেক্ষা না করে নিশ্চিন্ত মনে আরাম করে।

স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলাপ শেষ করে আমি বসে আছি। এমন সময়ে ওয়্যারলেস মারফত খবর এল যে, তিনশ'র মত ভারতীয় সৈন্য ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে, সকল মুজাহিদ যেন সতর্ক থাকে।

খবর শুনে আমার শরীরের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। ভারতীয় সৈন্যদেরকে উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্যে আমি প্রস্তুতি গ্রহণ করি। কিন্তু ওমর চাচা আমাকে শান্ত হওয়ার উপদেশ দিয়ে বলল, 'এখানে তাদের উপর আক্রমণ করা আমাদের জন্যে কল্যাণকর হবে না। তাদের পথ ছেড়ে দেয়াই ভালো'।

ওমর চাচার পরামর্শ মত আমরা হামলা করা থেকে বিরত হলাম। ভারতীয় সৈন্যরা অন্যদিকে চলে গেল।

বান্ডিপুর থেকে ক্যাম্পে ফিরে এসে আমরা কমাণ্ডার তাহের এজাজের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি আমাদের নিকট চারজন মুজাহিদ পাঠিয়ে দেন। তারা আমাদেরকে তাদের অস্থায়ী ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

কমাণ্ডার তাহের এজাজের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমরা যথেষ্ট আনন্দিত হলাম। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে আমাদেরকে বরণ করেন ও সাদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। কিছুক্ষণ খোশ-গল্পের পর আমাদেরকে চারদিনের ছুটি দিয়ে বললেন, 'এ ক'দিন আপনারা বিশ্রাম করে সফরের ক্লান্তি দূর করে নিন। চারদিন পর আমার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে। তখন আমি আপনাকে আপনার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেব।

সুপ্রীম কমাণ্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ

কমাণ্ডারের আদেশ মত আমরা আরো চারদিন বিশ্রাম নিলাম। দিনগুলো আমাদের বড়ই আনন্দে কেটেছে। ঘুম, নামায ও খাওয়া-দাওয়ার বাইরে যে অবসর সময়টুকু পেতাম, তা কুরআন তেলাওয়াত ও জেলা কমাণ্ডারের রচিত জ্বালাময়ী জিহাদের তারানা শুনে কাটালাম।

চারদিন পর যথাসময়ে কমাণ্ডার আমাকে বললেন, 'আপনার ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। অতি শীঘ্র সুপ্রীম কমাণ্ডারের সঙ্গে আপনাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করছি। তিনি আপনাদেরকে পূর্ণ কর্মসূচী প্রদান করবেন এবং সর্বপ্রকার জরুরী হেদায়াত দান করবেন।'

আরো দু'দিন অপেক্ষা করার পর সুপ্রীম কমাণ্ডারের সঙ্গে আমাদের প্রতীক্ষিত সাক্ষাত হয়ে গেল। এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব তিনি, কাশ্মীর রণাঙ্গনের মুজাহিদরা তাকে এক নজর দেখতে পারাকে সৌভাগ্য মনে করে। আমরাও তাঁর দর্শন লাভে ধন্য হলাম।

কুশল বিনিময়ের পর তিনি আমাকে জিহাদের প্রাথমিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেন। আমার জবাবে আশ্বস্ত হয়ে তিনি বলেন, 'আপনারা সাথে করে যে সব অস্ত্র ও অ্যামুনিশন নিয়ে এসেছেন, তা আমি আপনাদের হাতেই অর্পণ করলাম। আশা করি, আপনারা দক্ষতার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে যাব।'

আমাদের সফলতার জন্য দু'আ করে তিনি আমাদেরকে বিদায় দেন।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাথীদের নিকট এসে সুপ্রীম কমাণ্ডারের দেয়া দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের অবহিত করি। তারা সকলেই আনন্দিত হন এবং শীঘ্র একটি জোরদার অপারেশন পরিচালনার জন্যে সকলেই উদগ্রীব হয়ে পড়েন। কিন্তু আমি তাদেরকে বললাম, আমাদের সব কাজই ধৈর্য সহকারে এবং জিহাদের নিয়ম-নীতি ও কৌশল মোতাবেক হতে হবে। বর্তমানে আমাদের হাতে যে অস্ত্র আছে, প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই কম। তাই পর্যাপ্ত অস্ত্র সংগ্রহ না করে কোন এ্যাকশন নেয়া ঠিক হবে না। এখন সর্বপ্রথম যে কাজটি আমাদের বেশী প্রয়োজন, তা হল নিজেদেরকে জিহাদের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী সংগঠিত করা।

তারা সকলেই আমার সঙ্গে একাত্মতা পোষণ কর। তারপর আমি আমার বাহিনীকে দু'টি প্লাটুনে বিভক্ত করে এক গ্রুপের কমাণ্ডের দায়িত্ব আমি নিজের হাতে রাখি আর আরশাদ ভাইকে অপর গ্রুপের কমাণ্ডার নিযুক্ত করি।

প্রথম এ্যাকশন

পর্যাপ্ত অস্ত্র ও অ্যামুনিশন সংগ্রহ করার পর এবার আমাদের ভারতীয় বাহিনীর সন্ধান নেয়ার পালা। আমার সাথীরা তো অস্থির। স্থানীয় জনগণও তাঁদের বীরত্ব আর ঈমানী জযবার বহিঃপ্রকাশের জন্যে অপেক্ষার প্রহর গুণছিল। আমরা ক্যাম্প 'ক' এর উপর আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করি। (ক্যাম্পের নাম নিরাপত্তার খাতিরে গোপন রাখা হল)

আমি সাথীদের পরিকল্পনার কথা অবহিত করি, কিন্তু এ আক্রমণ কোথায় এবং কখন করব, ইচ্ছে করেই তা গোপন রাখি। তারা আমার পরিকল্পনার কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠে। বারংবার তারা জানতে চাচ্ছিল যে, এ হামলা কখন কোথায় কিভাবে হবে। তারা সকলেই নতুন। অধিকৃত কাশ্মীরের পথ-ঘাট সবই তাদের অচেনা।

আমি তাদেরকে শান্ত হবার পরামর্শ দিয়ে বললাম, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনারা নতুন হলেও আমার এ অঞ্চলের পথ-ঘাট সবই জানা। ভারতীয় সৈন্যদের উপর কোথায় কখন কিভাবে সফল হামলা করতে হবে, তার অভিজ্ঞতা আমার আছে। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে নীরবে আমার সাথে আসুন।

সাথীদের নিয়ে আমি রওনা হলাম। পথে দু' মুজাহিদ সাথীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাদের একজন হল, ফয়সালাবাদের সাকেব ভাট, অপরজন মেরী

অঞ্চলের ফরহাতুল্লাহ ভাই। তারাও আমাদের সঙ্গে অভিযানে যোগ দেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছিল।

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তারা বলল, 'রাইফেল ও এ্যামুনিশনের অভাবে আমরা দীর্ঘ আট মাস পর্যন্ত নির্জীবের মত বসে আছি।'

আরও একটু অগ্রসর হবার পরে দেখা হল অধিকৃত কাশ্মীরের আরও কিছু মুজাহিদের সঙ্গে। তারাও আমাদের সঙ্গে এ্যাকশনে যোগ দেয়ার জন্যে অপেক্ষমান ছিল। তাদের অভিযোগ হল, অস্ত্র না থাকায় একটানা এক বছর পর্যন্ত তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে।

তাদের কয়েকজনকে পথ প্রদর্শনের জন্যে আমরা সঙ্গে নিয়ে নিলাম। পথে কয়েকজন মুসলিম বোন আমাদের অভ্যর্থনা জানায় এবং দু'আ করে বিদায় দেয়।

আমরা বিশেষভাবে একটি বিষয় অনুভব করলাম যে, কাশ্মীর ভূখণ্ডে মুজাহিদের অভাব নেই। অভাব শুধু অস্ত্র এবং যুদ্ধ সরঞ্জামের। অস্ত্র হলে আমাদের মা-বোনরাও ভারতের কাপুরুষ সৈন্যদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারত।

আমরা ভারতীয় সৈন্যদের ক্যাম্পের কাছে পৌঁছুলে মুজাহিদরা শিকার দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কৌশল অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে আমরা তাদেরকে ঘিরে ফেলি। পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি প্রথমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, যাতে পরিকল্পনায় কোন প্রকার ত্রুটি না থাকে।

সকল সাথীকে তিনটি দলে বিভক্ত করে আক্রমণের জন্যে উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করে দেই। আগে থেকেই আমার জানা ছিল যে, সন্ধ্যা সাতটায় ভারতীয় সৈন্যদের ক্যাম্পে হাজিরা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাই এ্যাকশনের জন্যে আমি এ সময়কেই বেছে নিলাম।

সিদ্ধান্ত নেয়া হল, এক এক স্থানে এক এক রকম অস্ত্র তাক করা হবে। হ্যান্ডগ্রেনেড নিক্ষেপ ও লাঞ্চার ব্যবহারের দায়িত্ব নিজের হাতে রাখি। একজন সাথীকে রকেট নিক্ষেপ করার দায়িত্ব দেয়া হল। তৃতীয় গ্রুপ, অর্থাৎ– কোরিং পার্টিকে নির্দেশ দেয়া হল যে, আক্রমণকারী গ্রুপ আক্রমণ করার পরে পিছপা হতে শুরু করলে তারা যেন অবিরাম ফায়ার করে তাদেরকে নিরাপদে সরে আসতে সহায়তা করে।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় সাথীদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ক্যাম্পের নিকটতম পয়েন্টের কাছে পৌঁছাই। ক্যাম্প থেকে এক'শ গজ ব্যবধানে অবস্থান নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে ওয়্যারলেস সেট অন করলাম। অপর দিক থেকে হ্যালো হ্যালো আওয়াজ ভেসে আসে।

পুনরায় সাথীদেরকে অপারেশনের নিয়ম সম্পর্কে অবহিত করি। বললাম, সর্বপ্রথম রকেট ফায়ার হবে, কিন্তু আমি যখন আদেশ করব ঠিক তখন। তারপর আমি গ্রেনেড নিক্ষেপ করব। এরপর চতুর্দিক থেকে মুজাহিদরা গুলী ছুড়তে শুরু করবে। কোন প্রকার অস্থিরতা দেখানো যাবে না।

অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে দৃঢ়তার সাথে ঘড়ির কাঁটা যখন সাতটার ঘর ছুঁই ছুঁই করছিল, ঠিক তখন আমি আমার রকেটবাহক সাথীকে ইংগিতে ফায়ার করার আদেশ দিলাম। রকেটলাঞ্চারের ট্রিগারে আঙ্গুল রাখার সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড এক বিস্ফোরণে প্রকম্পিত হয়ে গোটা ক্যাম্প। দেখলাম, নিক্ষেপিত রকেট সোজা সে ব্যারাকের ছাদের উপর গিয়ে আঘাত হানে, যাকে আমরা টার্গেট বানাতে চেয়েছিলাম।

এ রকেট ভারতীয় সৈন্যদের ক্যাম্পে কতটুকু ধ্বংস সাধন করেছিল এবং তার পরে আমাদের গুলীবৃষ্টি ও গ্রেনেডসমূহ কিরূপ প্রলয় সৃষ্টি করেছিল, তার বিবরণ একটু পরে আসছে। তার আগে যে সামরিক ক্যাম্পটিকে আমরা আক্রমণের টার্গেট বানিয়েছিলাম, তার কিঞ্চিত পরিচয় এবং এ এ্যাকশনের কৌশল সম্পর্কে কয়েকটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোকপাত করব।

এ ক্যাম্পের নাম হল ওটলব। অত্র এলাকার নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। বান্ডিপুরে এর অবস্থান। ১৫ পাঞ্জাব, ১৬ পাঞ্জাব এবং গুর্খা রেজিমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ক্যাম্প এ অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে অবস্থানকারী ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা পাঁচ হাজারের মত। চতুর্দিকের জনবসতিগুলোতে তারা রীতিমত আতংক সৃষ্টি করে রেখেছিল। সাধারণ জনগণের উপর নির্যাতন ছাড়া মুজাহিদদের জন্যেও এ ক্যাম্পটির অস্তিত্ব আলাদা এক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভারতীয় বাহিনীর এত দুঃসাহসের এও একটি কারণ ছিল যে, এ ক্যাম্পের উপর বিগত দু'বছর পর্যন্ত মুজাহিদরা কোন আক্রমণ করতে পারেনি। কারণ, ক্যাম্পটি ছিল অপেক্ষাকৃত গভীরে, অত্যন্ত নিরাপদ স্থানে। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিক জলাশয়ে ঘেরা। পশ্চিম দিকে অবস্থিত টিলাসমূহের একেবারে চূড়ায় উঠে মিসাইল বা রকেট ফায়ার করা ব্যতীত তার উপর হামলা করার দ্বিতীয় কোন উপায় ছিল না।

কিন্তু এ পদ্ধতিতে আক্রমণ করতে গেলে আক্রমণকারীরা গোটা ক্যাম্পের ফায়ারিং এর আওতায় পড়ে যাওয়া ছিল এক রকম নিশ্চিত। হামলা করে পালাবার উপযুক্ত কোন পথ ছিল না। এমন কোন আশ্রয়স্থল ছিল না, এ্যাকশন নেবার পর যেখানে আত্মরক্ষার্থে গা ঢাকা দেয়া যেত। আমরা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম।

আমার সঙ্গে মাত্র বারজন সাথী ছিল। ৯ অক্টোবর, ১৯৯৪ এর সন্ধ্যার সময়টি আক্রমণের জন্যে নির্বাচন করার আগে ভালোভাবে ভেবে নিয়েছিলাম যে, এ হামলায় আমরা সম্ভাব্য কি কি সমস্যায় পড়তে পারি।

প্রাণের ভয় সব সময় লেগেই থাকে। কিন্তু আল্লাহর পথের সৈনিকরা এ ভীতিকে কমই প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু কমাণ্ডার হিসেবে আমার সব চেয়ে বড় দায়িত্ব ছিল, সর্বপ্রথম অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিচক্ষণতার সাথে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নেয়া, যাতে শত্রু পক্ষের অধিক ক্ষতি সাধন করা যায় এবং মুজাহিদদের তেমন কোন ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয়।

আমি আমার সাথীদেরকে 'আক্রমণকারী' ও 'প্রতিরক্ষাকারী' এ দু'টি গ্রুপে ভাগ করে নেই। প্রতিরক্ষা গ্রুপে ফয়সালাবাদের সাকেব ভাটও ছিল। তার কাছে একটি ভিডিও ক্যামেরা। অপারেশনের চিত্রগুলো তিনি ক্যামেরাবন্দী করছিল। ক্যাম্পের উপর পরিচালিত হামলার জবাবে ভারতীয় বাহিনীর প্রতিরক্ষা মোর্চা থেকে যে ফায়ার আসবে, তার প্রতিরোধে পাল্টা ফায়ার করা ছিল তার আসল দায়িত্ব।

পশ্চিম দিকের যে পাহাড়ের উপর থেকে হামলা করার জন্যে আমরা পরিকল্পনা নিয়েছিলাম, তার চূড়া থেকে নদীর দূরত্ব সাড়ে ছ'শ ফুটের মত।

সেদিন ক্যাম্পে ঘন্টা বাজানো হচ্ছিল। তা তাদের ধর্মীয় কোন পূঁজা-অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বলে মনে হল।

আমরা অনুমান করলাম, সৈন্যরা সবাই তখন কোন একটি ব্যারাকে সমবেত হয়েছে। কিন্তু কোন্ ব্যারাকে, এটা ঠিক করা গেল না। বহু ভেবে-চিন্তে এবং দূরবীন দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে আমরা তাও নির্ণয় করতে সক্ষম হই এবং তাকে টার্গেট করে আমরা মিসাইল স্থাপন করি।

এ্যাকশনের জন্যে সাথীরা সকলেই প্রস্তুত। আমি মিসাইলবাহক সাথীকে ইঙ্গিতে ফায়ার করার আদেশ দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে মিসাইল লক্ষ্যস্থলে নির্ভুলভাবে আঘাত হানে। ধুয়া, ধূলোবালি ও মানুষের শোর-গোল শুনে আমরা নিশ্চিত হলাম যে, এ্যাকশন সফল হয়েছে।

এবার পূর্ব পরিকল্পিত কৌশল অনুযায়ী তিনটি গ্রেনেড ফায়ার করলাম। একটি গ্রেনেড ব্যর্থ হলেও বাকী দু'টো লক্ষ্যস্থলে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয়। ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হল গোটা ক্যাম্প।

ক্যাম্পের একটু উপরে অবস্থিত প্রতিরক্ষা মোর্চা থেকে আমাদের উপর জবাবী ফায়ারিং ও গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে যায়। তারা আমাদের মিসাইল লাঞ্চ করার অবস্থানটি চিহ্নিত করতে পেরেছিল। তাই তাদের নিক্ষিপ্ত গোলা-বারুদগুলো আমাদের ঠিক পায়ের কাছে এসে পড়ে।

অপরদিক থেকে টহলরত একটি সেনা দলও পরিস্থিতি টের পেয়ে ফায়ারিং শুরু করে দেয়। কিন্তু তাদের ফায়ারিং অনেকটাই ছিল আত্মরক্ষামূলক। অর্থাৎ– তারা কেবল আমাদেরকে একথা অবহিত করার জন্যে গোলাবর্ষণ করছিল যে, আমরা আছি, পালাবার ব্যর্থ চেষ্টা কেউ কর না।

তদুপরি শত্রুদের ক্যাম্প ও প্রতিরক্ষা মোর্চা থেকে আসা জবাবী হামলা ছিল অত্যন্ত জোরদার। এর অল্পক্ষণ পরেই তারা মর্টার গানের গোলাবাজী শুরু করে দেয় এবং শূন্যে ফাঁকা গুলি ছুড়ে গোটা এলাকা দিনের মত আলোকিত করে তোলে।

শত্রু পক্ষের জবাবী হামলার সাথে সাথে আমাদের প্রতিরক্ষা গ্রুপ তাদের কাজ শুরু করে দেয়। তারা ফায়ারিং শুরু করে দিলে আমরা ধীরে ধীরে পিছপা

হতে শুরু করি। আমার সাথী ফরহাতুল্লাহ ভাইয়ের পা একটুখানি মচকে যাওয়ায় তাকে সামনে রেখে আমি আস্তে আস্তে সম্মুখে অগ্রসর হতে শুরু করি।

ফেরার পথে শত্রু পক্ষের গুলীবর্ষণ ছাড়া কাটাতারের মোকাবেলাও করতে হয়েছে। পাঁচ ফুট অন্তর একটি করে কাটাতারের বেড়া আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছে। তার কাটার কোন অস্ত্র আমাদের কাছে ছিল না। ফলে এসব বাঁধা অতিক্রম করে অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে আমাদের অগ্রসর হতে হচ্ছিল। এদিকে গোলাবর্ষণও চলছিল বিরামহীনভাবে। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে আমার সাথীদের কোনই ক্ষতি হয়নি। পাথর আর কাটাতারের ফলে আমাদের যতটুকু বিব্রত হতে হয়েছিল, এ-ই যা।

পরিকল্পনা মোতাবেক আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা ছিল। অবিরাম এক ঘন্টা সাধনার পরে আমরা পাঁচশ' মিটার পথ অতিক্রম করে তাদের সঙ্গে মিলিত হলাম।

এ সময়ে একটি মজার ঘটনা ঘটে। যে সব ভারতীয় সৈন্য আমাদেরকে লক্ষ্য করে মর্টার ও মেশিনগানের গুলী ছুড়ছিল, আমাদের কোরিং পার্টির জবাবী হামলা ও অবিরাম ফায়ারিংয়ে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে।

আমাদের সাথীরা একটু পর পর পিকাগান দ্বারা তাদের উপর ফায়ারিং করছিল। বোধ হয়, এতেই তারা ভয় পেয়ে যায় যে, এবার তারা যমের হাতে এসে পড়েছে। ফলে তাদের দু'জন সৈন্য মোর্চা থেকে বের হয়ে পালাতে শুরু করে। একজন পালিয়ে নীচের ক্যাম্পের চলে যায় এবং অপরজন, সম্ভবত– সে একটু আহত ছিল– উপর দিকে গিয়ে আত্মগোপনের চেষ্টা করে।

নীচের থেকে ভারতীয় সৈন্যরা ওকে দেখে মনে করেছিল, ও কোন আহত মুজাহিদ। আমরাও তাকে নিশানা বানাতে পারতাম। কিন্তু, ভারতীয় সৈন্যরা নিজেরাই গুলী করে তাকে যমের হাতে তুলে দেয়।

আমরা ভারতীয় সৈন্যদের ক্যাম্প থেকে দূরেই চলে গিয়েছিলাম। তবে এখনও বিপদমুক্ত হতে পারিনি। কিন্তু যেভাবে এ যাবত আমরা নিরাপদে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে এসেছি এবং শত্রু পক্ষের অসংখ্য গুলীর কবল থেকে রক্ষা পেয়ে এসেছি, তাতে আমাদের মনে এ আসা জাগে যে, আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যতেও আমাদেরকে বিপদে ফেলবেন না।

কিছুক্ষণ পরে আমরা উপর থেকে নীচে নামতে শুরু করলাম। তখন ওটলব ক্যাম্প থেকে আসা গুলীগোলা শূন্য আকাশ আলোকিত করছিল ঠিক, কিন্তু আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ নিরাপদ।

মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করে ওয়ারলেস সেট অন করলাম। কেন্দ্রের সঙ্গেও যোগাযোগ হল। আমাদের অভিযান সম্পর্কে তাঁদেরকে অবহিত করে বলে দিলাম, দুশমনের চ্যানেল সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে এ অভিযানে তাদের কী পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, তা যেন আমাদেরকে জানানো হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কমাণ্ডারের পক্ষ থেকে সিগন্যাল আসতে শুরু করে। ওয়ারলেস মারফত তাঁরা আমাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল।

দু' বছরের মধ্যে ওটলব ক্যাম্পের এটাই ছিল প্রথম অথচ পূর্ণাঙ্গ ও সফল হামলা। এরই মধ্যে ওয়ারলেস সেটে শত্রু পক্ষে চ্যানেল শোনারও সুযোগ মিলে গেল। শুনতে পেলাম, ওটলব ক্যাম্পের সৈন্যরা চেঁচামেচি করছে এবং অন্যান্য ক্যাম্পের কাছে এ বলে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে, 'সন্ত্রাসীরা আমাদের উপর প্রচন্ড হামলা করেছে। এখন আমরা চতুর্দিক থেকে তাদের বেষ্টনীর শিকার। অতি সত্ত্বর আমাদের সাহায্য করুন।'

আমরাও এ মজার সুযোগ হাতছাড়া করলাম না। বললাম, 'উল্টা-পাল্টা কথা বলছ কেন? আমরা সন্ত্রাসী নই-মুজাহিদ। এ ছোট্ট শিক্ষাটুকু স্মরণ রেখ। মনে রেখ, পাল্টা কিছু করতে চাইলে তোমাদের তার চরম মাশুল দিতে হবে।'

জবাবে অসহায়ের মত অপর দিক থেকে বলা হল, 'তোমরা আস তো মরার জন্যে, তা আমাদেরকে মারছ কেন? মারতেই যদি হয় অফিসারদেরকে মার। তোমাদের বিরুদ্ধে যা কিছু করা হচ্ছে, সবতো ওরাই করছে।' এ বলে অকথ্য ভাষায় তারা গালাগাল দিতে শুরু করে। আমি সেট অফ করে দিলাম।

তারপর আনন্দচিত্তে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে করতে আমরা নিরাপদ অঞ্চলপানে রওনা হই। দু'টি জনপদ অতিক্রম করে তৃতীয় জনপদে প্রবেশ করে কিছুক্ষণের জন্যে যাত্রা বিরতি দিলাম। কিন্তু ভাবলাম, এখানে অবস্থান করাও বিপদের কারণ হতে পারে। ভোর হওয়া মাত্রই শত্রুরা আহত ফনিনীর ন্যায় ফোঁস ফোঁস করতে করতে ছড়িয়ে পড়তে পারে এলাকায়। তাই সিদ্ধান্ত হল, রাতারাতিই আমরা লোলাব পৌঁছে যাব।

ভোর বেলা যখন ক্লান্তিতে আমাদের পা আর চলছিল না, ঠিক তখন সংকীর্ণ এক গিরিপথ অতিক্রম করে লোলাব উপত্যকায় অবতরণ করছিলাম। ঠান্ডা পানি দিয়ে ওজু করে ফজর নামায আদায় করায় কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেলাম। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির সকলেই। কিছু একটু না খেলে আর চলে না।

নাস্তার জন্যে সাথীদেরকে দু'টি দলে বিভক্ত করা হল। প্রথমে একদল লোকালয়ে গিয়ে মুজাহিদ সমর্থক জনগণের মেজবানির সুযোগ গ্রহণ করে। তাদের ফিরে আসার পর গেল দ্বিতীয় দল। আমি ছিলাম দ্বিতীয় দলে। আমরা যাদের মেহমান হলাম, তাদের একান্ত কামনা, আমরা মন ভরে তৃপ্তি সহকারে আহার করি। আমরাও তাদের খুশী করতে ত্রুটি করলাম না। পেট পুরে খেয়ে জঙ্গলে ফিরে এলাম।

তখন সকাল সাতটা। এটা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সমগ্র কাশ্মীরের কমান্ডারদের হাজিরা দেয়ার সময়। রেডিও মারফত এ হাজিরা হয়ে থাকে। নিয়মানুযায়ী কুরআন তেলাওয়াতের পর একটি মুজাহিদ নিয়ন্ত্রিত রেডিও স্টেশন থেকে মুজাহিদ কমাণ্ডারদের হাজিরা ডাকা শুরু হল।

সাধারণত প্রথমে সিনিয়র কমাণ্ডারদের হাজিরা হয়ে থাকে। কিন্তু আজ হল তার উল্টো। প্রথমে ডাকা হল আমার নাম।

শুরুতে আমার কোড নাম 'এ, আর-২' শুনে আমি অবাক। এটা ছিল সফল অভিযানের পুরস্কার স্বরূপ আমাদের মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ। আমাদেরকে জানানো হল যে, শত্রুনিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যমগুলোর রিপোর্ট অনুযায়ী ওটলব ক্যাম্পের নিহতদের সংখ্যা পঁচিশেরও উর্ধ্বে। আহতের সংখ্যা আরও বেশী।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের জেলা কমাণ্ডার তাহের এজাজ সাহেব ওয়্যারলেস মারফত আমাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'ওটলব ক্যাম্পের সফল আক্রমণ আপনাদের বিরাট সাফল্য। আমি আপনাকে হৃদয়ের গভীর থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।'

এ হামলায় আমাদের হাতে বেশীর ভাগ সে সব দুশমনের পতন ঘটেছে, যাদেরকে ভারত থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে কাশ্মীরে পাঠানো হয়েছিল। এরা ১৫ পাঞ্জাবের সে সব সৈন্য, যারা পূর্ব পাঞ্জাবের আন্দোলনে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিল এবং গ্রেফতার হওয়ার পর বিভিন্ন কারাগারে আটক ছিল। খালিস্তান আন্দোলন দমনের পর তাদেরকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে দেয়া হয়।

জেলা কমাণ্ডার তাহের এজাজ একটি গুপ্তস্থানে বিশেষ দাওয়াতে আমাদেরকে আহবান করেন। সাক্ষাতের পর এ অসম সাহসিকতার জন্যে আমাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'এ সফল অভিযানের পরে অত্র অঞ্চলে ওটলব ক্যাম্পের প্রভাব অনেকটা হ্রাস পাবে নিশ্চয়।'

আমার জন্যে এটাও কম মর্যাদার কথা ছিল না যে, আল্লাহ তা'আলা এহেন বিপজ্জনক অপারেশনে আমাদেরকে সফলও করলেন এবং আমার কোন সাথীকেও তাতে কোন প্রকার দৈহিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়নি।

কোলগামের সফল অভিযান

ওটলবের ন্যায় কোলগামের ক্যাম্পও স্থানীয় জনবসতি এবং মুজাহিদদের জন্যে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ ক্যাম্পটি স্থাপন করা হয়েছিল লোলাবের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণকে স্বাধীনতার শাস্তি দেয়ার জন্যে।

উর্ধ্বতন কমাণ্ডারের পক্ষ থেকে এবার এ ক্যাম্পকে টার্গেট বানানোর জন্যে আদেশ দেয়া হল। আমাদের ডিভিশনাল কমাণ্ডার মাজেদ জাহাঙ্গীর এ অভিযানের জন্যে আমাদেরকে নির্বাচন করে এবং জেলা কমাণ্ডার তাহের এজাজের মাধ্যমে এতদসংক্রান্ত নির্দেশনাবলী প্রেরণ করে।

জেলা কমাণ্ডার এ বিষয়ে আমাকে জরুরী নির্দেশ দিলেন এবং জানালেন যে, এখানকার শত্রুপক্ষ দূরন্ত চালাক ও ভয়ংকর। ইতিপূর্বে কয়েকবার গুপ্ত হামলা চালিয়ে মুজাহিদদের বেশ ক্ষতি সাধন করেছে তারা। 'আল-বারক' এর বহু

মুজাহিদকে তারা শহীদ করেছে এবং অনেককে বন্দী করেছে। হিজবুল মুজাহিদীনের বেশ কিছু মুজাহিদও তাদের হাতে শহীদ হয়েছে।'

এ ক্যাম্পে সাধারণ সৈন্যদের ছাড়া বিপুলসংখ্যক বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সও (বিএসএফ) ছিল। ক্যাম্পের মধ্যে সাধারণ সৈন্য এবং বিএসএফ এর ব্যারাক ছিল আলাদা আলাদা।

আমার উপর দায়িত্ব সোপর্দ করার প্রধান কারণ এ ছিল যে, কাপওয়াড়া, বারামুল্লা ও সোপুর অঞ্চলে কয়েকবছর অবস্থান করার ফলে তথাকার নাড়ি-নক্ষত্র সবই আমার আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে কোন কোন অঞ্চলের স্থানীয় মুজাহিদরাও আমার থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করে থাকে।

১৯৯৪ এর ২৭ শে নভেম্বর আমি ক্যাম্পের উপর আক্রমণ করার সিগন্যাল পাই। সুপ্রীম কমাণ্ডার আমাদেরকে যে সরঞ্জাম দান করেছিলেন, আমরা তা একটি নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। ধেরকোটের আকবর ভাইকে মজুদ থেকে কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে আসার জন্যে স্থানীয় একজন মুজাহিদের সাথে পাঠিয়ে দিলাম।

এ ফাঁকে কোলগাম ক্যাম্প সম্পর্কে আরো অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পেলাম। ক্যাম্পের পশ্চিমে মদনপুরা নামক একটি গ্রাম। সে গ্রাম অতিক্রম করে আমাদের অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ক্যাম্পের উপরে উত্তর দিকে বিশাল এক গভীর বন। পূর্বে পানির নালা।

আক্রমণ করার আগে আমাদের ভালোভাবে এটা নির্ণয় করা জরুরী ছিল যে, হামলা করার পরে প্রয়োজনে পিছনে সরে আশ্রয় নেয়ার উপযুক্ত স্থান কোনটা। আর এ তথ্যও নেয়া দরকার ছিল যে, ক্যাম্পে পাহারাদানকারী গ্রুপটি কোথায় অবস্থান করে এবং কোথায় কোথায় টহল দেয়।

টহলদার বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে ভালোভাবে তথ্য নিয়ে আমি আমার এ ক্ষুদ্র বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করে নিলাম। পরিস্থিতি অনুযায়ী একটি এ্যাকশন গ্রুপ এবং কোরিং পার্টিং তৈরি করলাম। সিদ্ধান্ত হল, একদল আক্রমণের স্থল থেকে আমাদেরকে বের করে আনার কাজে সহায়তা করবে এবং আর একদল গ্রামের রাস্তায় প্রস্তুতি নিয়ে বসে থাকবে, যাতে ফেরার সময় প্রয়োজনে তারা আমাদের সাহায্য করতে পারে এবং বাইরে থেকে কোন সাহায্যকারী সৈন্য আসতে চাইলে তাদের প্রতিরোধ করে। সাথীদের সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আমি সাথীদের থেকে পৃথক হয়ে পড়লাম।

এ অপারেশনে সর্বাপেক্ষা কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল যে, সাথীদের দ্বারা কাজ তো ষোল আনাই আদায় করে নেব, আবার সম্পূর্ণ গোপনীয়তাও রক্ষা করতে হবে। কী ভাবে কী হচ্ছে ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ টের না পায়, তার প্রতি সজাগ ও সযত্ন দৃষ্টি রাখতে হবে।

এ কারণে আমরা এক দু'জন সাথী ছাড়া কেউই এ অপারেশনের পরিকল্পনার কিছুই জানত না। সাথীদের জানের নিরাপত্তা এবং অভিযানের সাফল্যের জন্যেই এমনটি প্রয়োজন ছিল।

এ্যাকশনের আগে সব ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণ হবার পরেও আমাদের একটি কাজ বাকী ছিল। ক্যাম্পের একেবারে কাছে গিয়ে এ তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন ছিল যে, শত্রুবাহিনী এখন ক্যাম্পের কোন্ স্থানে অবস্থান করছে, অর্থাৎ ক্যাম্পের কোন্ অংশকে আমরা হামলার টার্গেট বানাব, তা নির্ণয় করা।

আমি অন্ধকার হবার অপেক্ষায় রইলাম। শীতের দিন অতি দ্রুত ফুরিয়ে রাত এল। সাতটা পর্যন্ত আমি পার্শ্ববর্তী গ্রামের আশে-পাশে চক্কর দিতে থাকি। তার পরে এক ঘরে থেকে একটি কম্বল এবং একস্থান থেকে শুকনা ঘাসের ছোট্ট কয়েকটি আঁটি তুলে নিলাম। এর মধ্যে রাইফেলটি লুকিয়ে নিয়ে ঘাসের আঁটিগুলো মাথায় করে ভারতীয় ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা দিলাম।

ক্যাম্প থেকে একশ' গজ দূরে থাকতেই আমি অনুমান করলাম যে, আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। এ পর্যন্ত তো ঘাসের বোঝা মাথায় করে ছদ্মবেশে আসা গেছে, কিন্তু এ বেশেও সামনে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক। যদি ওরা জিজ্ঞেস করে বসে যে, ঘাসের বোঝা মাথায় করে ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছ কেন, তখন উপায় কি হবে!

অগত্যা ঘাস ফেলে দিয়ে টলতে টলতে ক্যাম্পের দেয়ালের ঠিক নিকটে চলে গেলাম এবং এক স্থানে কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে নিজেকে অনেকটা লুকিয়ে বসে পড়লাম, যেন আমি প্রশ্রাব করতে বসেছি।

সামনেই কয়েকজন সৈন্য তাদের নির্ধারিত টয়লেটের দিকে আসছিল, আর কয়েকজন ওখান থেকে ফেরত যাচ্ছিল। আমাকে তারা দেখতে পায়, কিন্তু নিরীহ পল্লীবাসী মনে করে কেউ আর ভ্রুক্ষেপ করেনি। তাদের এ উদাসীনতাকে আমি কাজে লাগালাম। গোটা ক্যাম্পটিকেই আমি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলাম।

ওদিকে আমার সাথীরা গায়ে কম্বল জড়ানো কাউকে ক্যাম্পের দিকে যেতে দেখে ভাবল, হয়ত কোন গুপ্তচর হবে, আমাদের সন্ধান নিয়ে সে ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু ভাগ্যিস! আমার আদেশ পালনার্থে তারা তাদের সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশন নেয়নি। তা না হলে আমাদের পরিকল্পনা সূচনাতেই নিজেদের হাতে ভণ্ডুল হয়ে যেত। আমার বিশ্বাস, এটাও ছিল মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত।

কয়েক মুহূর্তেই আমি দেখে নিলাম যে, ক্যাম্পের ভেতরে দুশমনরা কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থান নিয়ে আছে, কোন্ কোন্ ব্যারাকে মিসাইল হামলা করা সফল হবে, শত্রুদের জবাবী এ্যাকশন কোন দিক থেকে আসার সম্ভাবনা আছে এবং আমাদের আত্মরক্ষার উপযুক্ত পথ কেমন হবে।

পর্যবেক্ষণ শেষে সাথীদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। তারা তখন সন্দেহভাজন গুপ্তচরকে গ্রেফতার করার জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে। কিন্তু আমাকে চিনে ফেলার পর তারা হাসিতে ফেটে পড়ে। তাদের এ মহতি পরিকল্পনার কথা শুনে আমিও হাসি ধরে রাখতে পারলাম না। হালকা রসিকতা বিনিময়ের পরে আমি এ্যাকশনের কার্যক্রম শুরু করে দেই।

আরশাদ ভাই ও আমের ভাইকে মিসাইল পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে আমি যথারীতি গ্রেনেড লাঞ্চারের দায়িত্ব গ্রহণ করি। ওয়ারলেস মারফত অবশিষ্ট সাথীদেরকেও জানিয়ে দিলাম যে, তোমরা প্রস্তুত থাক। এ্যাকশন যে কোন মুহূর্তে শুরু হয়ে যেতে পারে।

প্রত্যহ রাত সাতটায় ক্যাম্পের কোল ঘেষে একটি যাত্রীবাহী বাস অতিক্রম করে। অপেক্ষা শুধু সে বাসটির। কারণ, এর আগে হামলা পরিচালনা করলে যাত্রীদের সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

যথা সময়ে বাসটি অতিক্রম করল। তার আলোতে আমরা ক্যাম্পের দৃশ্য আরেকবারের মত দেখার সুযোগ পেলাম। দূরবীনের সাহায্যে টার্গেট মত মিসাইল স্থাপন করে আরশাদ ভাইকে বলে দিলাম, যেন সে আমার ইংগিত পাওয়া মাত্র 'টাচ' দিয়ে দেয়।

উল্লেখ্য যে, মিসাইল লাঞ্চার লোড করার পর 'টাচ' দেয়ার অর্থ হচ্ছে, দু'টি তারের মাথা একত্র করে ফায়ার করা। কিন্তু আমরা নতুন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করে নিয়েছিল। তা হল মিসাইলের শূন্য অংশে এক লিটার পেট্রোলও নিয়ে নিলাম, যাতে লক্ষ্যস্থলে আঘাত হানার পরে আগুন জ্বলে উঠে অধিক ক্ষতি সাধন করতে পারে এবং তার আলোতে আমরাও আমাদের অভিযানের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে পারি।

ক্যাম্প থেকে বের হওয়ার পথে আমরা একটি পিকাগান স্থাপন করে রেখেছিলাম। উদ্দেশ্য, আত্মরক্ষার জন্যে ক্যাম্প থেকে কোন সৈন্য বাইরের মোর্চার দিকে পালাবার চেষ্টা করলে যেন পালাতে না পারে।

একটু নীচে আমি নিজেই গ্রেনেড-লাঞ্চার ও রাইফেল নিয়ে বসে ছিলাম। আরশাদ ভাই মাত্র দশ গজ দূরে আমার নির্দেশের অপেক্ষায় বসে আছে। যথা সময়ে আমি ফায়ার করার আদেশ দিলাম। এক---দু'---তিন। তিন বলার পরে আর বিলম্ব হল না। সঙ্গে সঙ্গে মিসাইল নিক্ষেপ করে সে।

মিসাইল সোজা ক্যাম্পের দেয়ালে গিয়ে আঘাত হানে এবং প্রচন্ড বিস্ফোরণের সাথে গোটা ব্যারাক বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ভেতরে ও বাইরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। তার সাথে আমাদের কানে ভেসে আসে ভারতীয় কাপুরুষ সৈন্যদের আর্তচীৎকার, আহতদের আহাজারি আর কারোও কারোও গালাগালের অকথ্য ভাষা।

ক্যাম্পের ভেতরে আমাদের কার্যক্রম এতটুকুই ছিল। আসল খেলা যা হওয়ার তা ছিল ক্যাম্পের বাইরে। আমাদের অনুমান সঠিক হলে ক্যাম্পের ভেতরে প্রাণে রক্ষা পাওয়া সৈন্যরা বাইরের দিকে কোথাও পালাবার কথা। আমরা এবার সে অপেক্ষায় রইলাম, দেখি পালায় কে!

কিছুক্ষণ পরেই কয়েকজন সৈন্য ক্যাম্পের প্রধান ফটক দিয়ে বের হয়ে দ্রুত দক্ষিণ দিকে ছুটে চলে। কিন্তু দক্ষিণ পয়েন্টে নিয়োজিত আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর পিকাগান এবং ক্লাশিনকোভ তাদের পালাবার চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়।

ভীত-বিহ্বল চিত্তে তারা আমাদের দিকে, অর্থাৎ– ক্যাম্পের পশ্চিম দিকে চলে আসে। আমাদের সম্মুখস্থ নালা বেয়ে পশ্চিমে কেটে পড়ার চেষ্টা করে তারা। আমি একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করলাম তার উপর। হাউমাউ করে তারা পেছন দিক সরে গেল। কিন্তু যাবে কোথায়? যে দিকে যাবে সেদিকেই ওদের যমের হাতে ধরা দিতে হবে। উপায় নেই। দিশেহারা হয়ে জ্ঞানশূন্য দিগ্বিদিক ছুটতে লাগল ওরা।

ফয়সাল ভাই ছিল পিকাগানের দায়িত্বে নিয়োজিত। পঞ্চাশ রাউন্ডের বেশী ফায়ার করার অনুমতি তাকে দেয়া হয়নি। কিন্তু এত মজার শিকার দেখে তিনি লোভ সামলাতে পারলেন না। বিশেষ করে যখন শত্রুর পক্ষ থেকে জবাবী হামলা আসতে শুরু করে এবং হাজার হাজার গুলী-গোলা আমাদের অবস্থানের উপর বর্ষিত হতে থাকে, তখন ফয়সাল ভাইয়ের সন্দেহ হয়েছিল যে, শের খান আর আরশাদ ভাই দুশমনের বেষ্টনীতে পড়ে গেল কিনা! তাই তিনি ম্যাগজিন উজাড় করে গুলী ছুড়তে শুরু করে দিলেন।

আমরা বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে শত্রু বাহিনীর কথা-বার্তা এবং করুণ দশা শুনছিলাম। দূর-দূরান্তের সৈন্যদেরকে তারা সাহায্যের জন্যে এ বলে আহবান করছিল যে, 'হাজার হাজার সন্ত্রাসী আমাদের উপর হামলা করেছে। জলদি এসে আমাদেরকে উদ্ধার কর।'

তাদের কথা শুনে আমাদের হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু সে মুহূর্তে আমাদের টু শব্দটি করা সঙ্গত ছিল না। কারণ, তখনো আমরা নিরাপদ অবস্থানে পৌঁছুতে পারিনি। শত্রুর হামলার শিকার হওয়ার আশংকা তখনো ছিল।

কিছুক্ষণ পরে আমি ওয়ারলেস মারফত ফয়সাল ভাইকে কল করলাম। এবার তার দেহে প্রাণ ফিরে আসে। তিনি আমাকে জানালেন যে, পিকাগানের একটি ম্যাগজিন সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। এখন আরো ফায়ারিং এর জন্যে তিনি আমার অনুমতি চাচ্ছেন।

আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম, সাবধান আর একটি গুলীও নষ্ট করবেন না। এবার বেরিয়ে আসার চেষ্টা করুন।

অন্যান্য গ্রুপকেও আমি নির্ধারিত স্থানে ফিরে আসার আদেশ দিলাম। আমাদেরও ফেরার জন্যে এমন পথ অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল, যাতে আমার কোন সাথী কোথাও বেকায়দায় পড়ে গেলে তাকে উদ্ধার করে নিতে পারি।

পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা সকলে পূর্ব দিকে হাঁটতে শুরু করি। শত্রু বাহিনীর গুলী তখনো অবিরাম চলছিল। কিন্তু তা জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গের মত শূন্যে গিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

রাত প্রায় ন'টার সময় আমরা সকলে একস্থানে একত্রিত হলাম। আল্লাহ আরেকবারের মত আমাদেরকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রেখেছেন। এ লড়াইয়ে সময় ব্যয় হয়েছে মাত্র দেড় ঘন্টা।

এ সফলতার জন্যে আমার সাথীরা সকলেই আনন্দিত। খোশ-গল্প করতে করতে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। হাঁটতে হাঁটতে আমরা চরম ক্ষুধা অনুভব করি। আমাদের কাছে খাওয়ার মত কিছুই ছিল না। আর খাওয়ার জন্যে পার্শ্ববর্তী কোন গ্রামে যাওয়াও নিরাপদ নয়। এ জন্যে সে রাতটি আমরা প্রচণ্ড শীতের মধ্যে না খেয়ে চরম অভুক্ত অবস্থায়ও জেগে জঙ্গলে কাটিয়ে দিলাম।

রাত কেটে ভোর হল। ফজর নামাজের আযান হল। কিন্তু ওজু করার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই অনেক নীচের নালায় গিয়ে আমরা ওজু করে ফজর নামায আদায় করলাম।

নামায আদায় করে আবার জঙ্গলে। সেখান থেকে আমরা আমাদের অপারেশনের সঠিক ফলাফল জানার চেষ্টা করি। কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করার পর শত্রুপক্ষের প্রচার মাধ্যম মারফত তাদের ক্যাম্পে সংঘটিত ধ্বংসযজ্ঞের খবর পেলাম। তাদের ওয়ারলেস অপারেটর এ বলে সংবাদ আদান-প্রদান করছিল যে, 'সন্ত্রাসীরা আমাদের কোলগাম ক্যাম্পে প্রচণ্ড হামলা করেছে। শীঘ্র আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা নেয়া হোক।'

এরপর আমাদের নিজেদের কেন্দ্রীয় চ্যানেলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়। আমাদের কেন্দ্রীয় চ্যানেল আগের দিন থেকেই আমাদের অভিযানের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল। তাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, শত্রুপক্ষের সাতাশ জন্য সৈন্য মারা গেছে। ব্যারাক বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে ধ্বংস্তূপের নীচে চাপা পড়ে আছে তেরজন সৈন্য। এ সংবাদ শুনে আমরা আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করলাম।

এবার আমাদের সমস্যা একটি। তা হল খাওয়া। ক্ষুধার জ্বালা আর কারো সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু উপায় কি? দুপুর দু'টা পর্যন্ত একইভাবে আমরা সফর অব্যাহত রাখি। চলতে চলতে এক সময়ে জেলা কমান্ডার তাহের এজাজের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হল। তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং খানাও খাওয়ালেন।

এ সময়ে একটি মজার ঘটনা ঘটে। তাহের এজাজ ভাইকে বললাম যে, আমি ডিভিশনাল কমাণ্ডার মাজেদ জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই। তিনি কোথায় আছেন?

শুনে তিনি হেসে ফেললেন। কারণ, মাজেদ জাহাঙ্গীর তখন তাঁর পাশেই বসা; কিন্তু আমি চিনতে পারিনি। যাহোক, মাজেদ ভাইয়ের সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হল। পরবর্তী এ্যাকশনের দায়িত্ব ও পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিয়ে তিনি আমাদের বিদায় দিলেন।

পরবর্তী দু'সপ্তাহের কনকনে শীতের দিনগুলো আমরা কখনো কম্বল মুড়ি দিয়ে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে অতিবাহিত করেছি, আবার কখনো কাটিয়েছি সাথীদের ছোট-খাট রোগ-ব্যাধির শুশ্রুষা-চিকিৎসায়।

এ সময়ে আমরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি। তা হল একটি স্থান নির্বাচন করে সেখানে আমরা একটি পরিখা খনন শুরু করি। তিনদিন পর্যন্ত মাটি ও পাথর কেটে পরিখা খনন কাজ চলে। এরপর আমাদের সমস্ত আসবাবপত্র সেখানে একত্রিত করে থাকার মত নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করে এ তীব্র শীতের মওসুমে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করা থেকে নিশ্চিন্ত হলাম। এখন আমরা চিন্তা মুক্ত। দিনগুলো আরামের সাথেই কাটছে।

টার্গেট বি, এস, এফ ক্যাম্প

ডিসেম্বরের ১৭ তারিখ। শুরু হল আমাদের নতুন প্রোগ্রাম। এবারের এ্যাকশন হিন্ডুয়ারায় অবস্থিত বিএসএফ ক্যাম্পের উপর। এ ক্যাম্পের কাপুরুষ সৈন্যরা এলাকায় নিরীহ জনসাধারণ, বিশেষ করে মহিলাদের উপর নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রেখেছে।

তাহের এজাজ ভাই আমাকে ডেকে নিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং জেলা কমান্ডার কাসেম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের স্থানও বলে দেন। অতঃপর খানা খাইয়ে ও চা পান করিয়ে আমাকে বিদায় দেন।

ক্যাম্পে ফিরে এসে আমি আমার সাথীদেরকে একত্র করে জানালাম যে, আর বসে থাকার সময় নেই। আমাদের আবার শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সময় এসে গেছে।

শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার খবর আনন্দেরই হয়ে থাকে। তদুপরি আমাদের পাকিস্তান ও আযাদ কাশ্মীরের দূর-দূরান্ত অঞ্চল থেকে ওখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যই হল, সেই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা, যারা আমাদের নিরপরাধ মুসলিম ভাই-বোনদের জান-মাল ইজ্জত-আব্রু নিয়ে তামাশা করছে।

যাহোক আক্রমণের সংবাদ শুনে সাথীরা সকলেই খুশী হল এবং বিজয়ের আনন্দঘন মুহূর্তটির অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগল। অস্ত্র-সাজে শত্রুর অতি নিকটে গিয়ে যখন আক্রমণ করা হয় এবং ঘাতক ও হায়েনাদেরকে ঘেরাও করে হত্যা করা হয়, সে মুহূর্তটির আনন্দের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়।

১৭ ডিসেম্বরের তৃতীয় প্রহরে আমরা রওনা হলাম। সন্ধ্যার সময় এক জনপদে পৌঁছে ওয়ারলেস মারফত কাসেম ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। উক্ত জনপদে পৌঁছে যাত্রা বিরতি দিয়ে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করার কথা তিনি আগেই বলে দিয়েছিল। মুজাহিদভক্ত এক হৃদয়বান ব্যক্তির ঘরে খানা খেয়ে রাত যাপনের জন্যে আমরা আমাদের 'কুদরতী নিবাস' জঙ্গলে চলে গেলাম।

কাশ্মীর ভূখন্ড এমনিতেই শীতপ্রধান দেশ। তার উপরে ডিসেম্বরের কনকনে শীত। আবার সময়টিও হল রাতের বেলা। আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে শোয়ার চেষ্টা করে তাতেও ব্যর্থ হলাম।

মধ্য রাতের কিছু আগে তাপমাত্রা ছিল শূন্যের কয়েক স্তর নীচে। চোখ খুলে আমি দেখতে পেলাম যে, এ বরফজমা পরিবেশেও সকল মুজাহিদ আরামের সাথে ঘুমুচ্ছেন। আসলে আল্লাহ্ যখন তাঁর বান্দাকে স্বস্তি দিতে চান, তখন কঠিন থেকে কঠিনতর মুহূর্তেও বান্দার চোখে নিদ্রা এসে যায়।

ওয়ারলেস সেট অন করে কাসেম ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি শীঘ্র আমাকে তাঁর কাছে চলে যেতে বললেন। সাথীদের সবাইকে ঘুম থেকে উঠিয়ে রওনা হলাম। অল্পক্ষণ পরেই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

রাতের তখন তৃতীয় প্রহর। গভীর নিদ্রায় সকলেরই চোখ বুজে আসছে। আমারও একই অবস্থা। ভাবলাম, একটু ঘুমিয়ে নিলে মন্দ হত না। কিন্তু কীভাবে? এখানে তো বিছানা-কম্বল কিছুই নেই। তবুও একটি গাছের সাথে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে রইলাম। ভাগ্যিস, কাসেম ভাই দয়া করে আমাকে পাহারার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল।

এভাবে কিছুক্ষণ জেগে, কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে রাত কাটালাম। ভোর হল। আমরা জামাতের সাথে ফজর নামায আদায় করলাম। নামাযের পর কাসেম ভাই সু-সংবাদ শুনালেন যে, তিনি আমাদের সকলকে চা পান করাবেন। স্থানীয় কয়েকজন সাথীকে পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে চা আনার জন্যে পাঠানো হল। কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেলাম, গ্রামের কয়েকজন মহিলা নানা রকম খাদ্যদ্রব্য ও চা হাতে করে মুজাহিদদের পেছনে পেছনে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এতে আমরা কিছুটা বিব্রত বোধ করলাম। কারণ, যে কোন এ্যাকশনে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করে চলা আমাদের জন্যে অপরিহার্য। করে আসছিও তাই।

এ ধরনের গেরিলা যুদ্ধে জনসাধারণের কারো সঙ্গে বিশেষ করে মহিলাদের সঙ্গে মুজাহিদদের কথা বলা নীতির পরিপন্থী। কিন্তু কাশ্মীরে মা-বোনদের আবেগ ও চেতনার সামনে অনেক সময় গেরিলা যুদ্ধের নীতিও মুখ থুবড়ে পড়ে। বোনেরা তাদের ভাইদেরকে এক নজর দেখে এবং নিজ হাতে পানাহার করিয়ে আনন্দ বোধ করে থাকে।

নাস্তা ও চা পানের পর্ব সমাপ্ত করে আমরা অভিযানের জন্যে সম্মুখপানে রওনা হলাম। এ অঞ্চলে আমাদের কমাণ্ড ছিল কাসেম ভাইয়ের হাতে। কিন্তু

তিনি আমাকে বললেন, এ্যাকশনের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন আপনাকেই করতে হবে। আর কাজও করবে আপনার গ্রুপ। আমরা শুধু আপনার সহযোগিতায় থাকব।

তাঁর কথামত আমাকে গোটা অভিযানের পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল প্রস্তুত করতে হল। আমরা যে ক্যাম্পের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা নিয়েছি, তা হিন্দুয়ারা বারারীপুর ক্যাম্প নামে পরিচিত। এটি আমাদের এক মহান মুজাহিদ শহীদ শওকতের বাড়ির নিকটে একটি খোলা মাঠে অবস্থিত। এ কারণে তার উপর হামলা করা অসম্ভব না হলেও দুষ্কর ছিল নিঃসন্দেহে।

ক্যাম্পের পেছন দিকটা ছিল ঢালু। এ স্থানটি আমরা আড়াল হিসেবে ব্যবহার করতে পারতাম। কিন্তু সামনে বেশ কিছু গাছ থাকায় পেছন দিক থেকে মিসাইল নিক্ষেপ করা ছিল অসুবিধাজনক। অন্যান্য দিকে কোন আড়াল না থাকায় সেসব দিক থেকেও হামলা করা ছিল অসম্ভব। মিসাইল ছোড়ার সাথে সাথে শত্রু বাহিনী আমাদের উপর অনায়াসে গুলী ছুড়তে পারত আর আমরাও পালাবার কোন সুযোগ পেতাম না।

সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে, হামলা নিকটবর্তী ক্ষেতের দিক থেকেই পরিচালনা করা হবে। ওখানে এক আধটু ঝোপ-জঙ্গলও আছে, যা প্রয়োজনে আমরা কাজে লাগাতে পারব। ক্ষেতের মধ্যে প্রকান্ড একটি গাছ এবং পানির একটি ছোট নালাও আছে।

আল্লাহর নাম নিয়ে আমি সেই গাছের পেছনে মিসাইল স্থাপন করলাম। কোরিং পার্টিকে আড়ালে বসিয়ে বলে দিলাম, যেন তাঁরা রাস্তার দিকে দৃষ্টি রাখে, যাতে ওদিক থেকে কোন হামলা আসতে না পারে।

আমাদের আক্রমণের নির্দিষ্ট সময় ঘনিয়ে আসলে ঠিক সে সময় দূরে একটি গাড়ীর আলো দেখা গেল। গাড়িটি ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছিল। আমরা শংকিত হয়ে পড়লাম। তাহলে কি ওরা আমাদেরকে দেখে ফেলল? দু' দিক থেকে আমাদেরকে ঘিরে ফেলল নাকি ওরা?

কিন্তু না গাড়িটি স্বাভাবিকভাবে পথ অতিক্রম করে চলে গেল। আসলে ওটা ছিল একটি প্রাইভেট ট্যাক্সি। আমরা শংকামুক্ত হলাম। পুনরায় অভিযানের প্রতি মন দিলাম। তখন ক্যাম্প থেকে আমরা মাত্র ৭৫ মিটার দূরে। মুজাফফরাবাদের আশফাক ভাই এবং স্থানীয় এক মুজাহিদ আলীম কাশ্মিরী তখন আমার সঙ্গে ছিল। এ্যাকশনের আগে আমি সাথীদেরকে আর একবার রিহার্সেল করালাম। আশফাক ভাই মিসাইল নিক্ষেপ করবেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা নালায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রোলিং করে বের হবার চেষ্ট করব।

শুরু হল এ্যাকশন। প্রচন্ড বিস্ফোরণে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে ক্যাম্প। আগুন, ধুয়া ও বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে গোটা ক্যাম্পে। সঙ্গে সঙ্গে শত্রু বাহিনীর পক্ষ

থেকে প্রচন্ড ফায়ারিং শুরু হয়। সার্চ লাইট ও নিক্ষেপিত গোলার আলোতে সমগ্র এলাকা দিনের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ততক্ষণে আমার সব সাথী নালায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু আলো এত উজ্জ্বল ছিল যে, মাটিতে পড়ে থাকা সুইটি পর্যন্ত চোখে পড়ার মত। ফলে আমি একটুও নড়াচড়া করতে পারলাম না। বাধ্য হয়েই দু'জন সাথীর সঙ্গে গাছের পেছনে লুকিয়ে রইলাম।

কাসেম ভাই ওয়ারলেস মারফত সংকেতে আমাকে বললেন, 'চল, এখানে থাকা বিপজ্জনক।'

আমি কোন জবাব দিলাম না, পাছে শত্রু পক্ষের কোন অপারেটর আমার কথা শুনে না ফেলে এবং আমাদের পালাবার পরিকল্পনা ভন্ডুল হয়ে না যায়।

এতে কাসেম ভাইয়ের আশংকা হল, আমি আহত হয়ে পড়ে রইলাম কিনা! তাই আবারও তিনি আমাকে সংকেত দিলেন। কিন্তু আমি এবারও সাড়া দিলাম না।

দু' ঘন্টা পর্যন্ত ফায়ারিং ও আলো বিচ্ছুরণের ধারা চলতে থাকে। আমরা চুপচাপ গাছের পেছনে লুকিয়ে রইলাম। অতঃপর আমি আমার সাথীদ্বয়কে দ্রুত কাসেম ভাইয়ের কাছে চলে যেতে বলে নিজে তাদের পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করি।

কাসেম ভাই এতক্ষণে আমাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছেন। ওয়ারলেস মারফত তিনি শেষবারের মত আমাকে কল করলেন, 'এস, আর-২ তুমি কোথায়? আমার ডাক শুনে থাকলে জলদি বেরিয়ে এস। অন্যথায় আমরা চললাম।'

এবার আমি ক্ষীণ স্বরে জবাব দিলাম। বললাম, কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার অপেক্ষা করুন। আমি আসছি। আপনি রওনা দিলে শত্রুরা আপনাকে দেখে ফেলবে। ফলে এখান থেকে বের হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

ঠিক দু'ঘন্টা পরে আলো কিছুটা কমে আসে। কিন্তু দুশমনের রাইফেলগুলো তখনো ক্ষান্ত হয়নি। মর্টারের গোলা আমাদের মাথার উপর দিয়ে হালকা আলো বিচ্ছুরণ করে চলেছে তখনও। ক্যাম্পের সৈন্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আমরা সামনে অগ্রসর হতে সমর্থ হলাম।

ইত্যবসরে পার্শ্ববর্তী গ্রাম রফাবাদ থেকে গাড়ীর একটি বহর আমাদের জন্য সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে। আমরাও বহু কষ্টে পানির নালা পর্যন্ত পৌঁছতে সমর্থ হই। কিন্তু মাথা তুলে হাঁটার সুযোগ এখনো হয়নি। কারণ গোলার আলো না থাকলেও রফাবাদ থেকে আগত গাড়ীগুলোর আলো গোটা সড়ক এবং তার আশ-পাশ আলোকিত করে রেখেছে।

একটানা ক্রোলিংয়ের কারণে আমাদের কনুইগুলো ছিলে গিয়েছিল। কেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল পরনের কাপড়। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমাদের এ কঠিন সফর চলতে থাকে।

চলতে চলতে এক পর্যায়ে আমি কোন রকমে সড়কও অতিক্রম করলাম। কাসেম ভাই সাথীদেরকে নিয়ে সড়কের ওপারে অপেক্ষমান ছিলেন। আমাকে দেখা মাত্র তাদের চেহারায় আনন্দের দ্যুতি খেলতে শুরু করে।

চাঁপা কণ্ঠে আমরা কুশল বিনিময় করলাম। কিন্তু তখনো আমরা শংকামুক্ত হতে পারিনি। শত্রুবাহিনী কোথাও ওঁৎ পেতে বসে আছে কিনা এ আশংকায় আমরা সম্মুখে সকলে একত্রে রওয়ানা না হয়ে গোটা কমান্ডোজকে তিন ভাগে ভাগ করে নিলাম। কথা হল, পরস্পর জানাজানি ছাড়াই তিনটি গ্রুপ তিন দিকে চলে যাবে, যাতে কোথাও ওঁৎ পেতে থাকা শত্রুর কবলে পড়তে হলে সকলকে পড়তে না হয়।

একে অপরকে আল্লাহর হাওলা করে আমরা পৃথক পৃথক রওনা হলাম। প্রথমে কাসেম ভাইয়ের গ্রুপ, তারপর সলীম কাশ্মীরীর এবং সব শেষে আমার গ্রুপ। প্রতি দুই গ্রুপের রওনার মাঝে ব্যবধান রেখেছি পাঁচ মিনিট।

বেশ কিছু পথ চলার পরে চাঁদের ক্ষীণ আলোতে দেখতে পেলাম যে, কয়েকজন লোক ওঁৎ পেতে সড়কের কিনারায় বসে আছে। দেখামাত্র আমরা দ্রুত মাটিতে শুয়ে পড়ে পজিশন নিয়ে ক্রোলিং করতে করতে ওদের একেবারে নিকটে চলে গেলাম।

আমাদের সকলের আঙ্গুল রাইফেলের ট্রিগারের উপর। গুলী করার আদেশ দেব ভাবছি। অপর দিকের কথার আওয়াজ শুনে আমার মনে সন্দেহ জাগল। আসলে ওরা ভারতীয় সৈন্য নাকি আমাদেরই লোক, পরীক্ষা করার জন্যে আমি আমার কোড নাম বললাম।

জবাবে যে কোড নাম আসল, তা শুনে আমরা সকলে হাসিতে ফেটে পড়লাম। তারা ছিল কাসেম ভাইয়ের গ্রুপের মুজাহিদ। এবার কাছে গিয়ে রসিকতা করে আমি বললাম, কাসেম ভাই, আপনি আজ আমাদের হাতে শহীদ হতে গিয়েও বেঁচে গেলেন।

জবাবে কাসেম ভাই বললেন, 'এমনই যদি হত, তো আমি একা কেন, আপনাদেরও সাথে করে আল্লাহর নিকট চলে যেতাম।'

কিছুক্ষণ খোশ-গল্পের পর আমরা আবার সামনে রওনা হলাম। পথে তৃতীয় দলটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কিন্তু বেশী বিলম্ব না করে আবার আমরা আলাদা আলাদাভাবে সফর শুরু করি।

ছয়জন সঙ্গী সাথে নিয়ে সারা রাত অবিরাম হাঁটার পর সকাল বেলা একটি গোপন আস্তানায় গিয়ে উপস্থিত হই। সেখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে শুয়ে চোখ বুঝে একটু ঘুমাবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু শোয়ার খানিক পরেই তন্দ্রাভাব নিয়েই আমাকে উঠে যেতে হল। কারণ, আমাদের হাই কমাণ্ডের আদেশ, কোন অবস্থাতেই লোকালয়ে রাত কাটানো যাবে না।

যদি আমরা নিরাপদে সরে যেতে সক্ষমও হই আর ভারতীয় সৈন্যরা আমাদের সন্ধানে নেমে পড়ে, তাহলে নিরপরাধ বেসামরিক লোকেরা সৈন্যদের অত্যাচারের শিকার হবে।

তাই সকাল সকাল সাথীদের ঘুম থেকে উঠিয়ে সেখান থেকে আমরা রওনা দিয়ে পুনরায় জঙ্গলে চলে গেলাম। কাপুরুষ ভারতীয় সৈন্যদের এতটুকু বুকের পাটা নেই যে, বাঘ-ভল্লুকের আবাস এ গভীর অরণ্যে আমাদের খুঁজে বেড়ায়।

ফজর নামাযের পর একটি উঁচু স্থানে বসে ওয়ারলেস মারফত শত্রুবাহিনীর কথা শোনার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হল না।

আটটার সময় কেন্দ্রীয় চ্যানেল আমাদের হাজিরা টানতে শুরু করেই নিয়ম অনুযায়ী আমাকে কল করল। একে অপরের খোঁজ-খবর নিলাম, কুশলাদি জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু আমাদের হামলায় শত্রুপক্ষের কি পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, সে সম্পর্কে কারুরই কিছু জানা ছিল না।

এর কারণ সম্ভবতঃ এটা ছিল যে, যে ক্যাম্পের উপর আমরা হামলা করেছিলাম, তা ছিল এমসি থেকে অনেক দূরে। অপরদিকে স্কুল ছাত্রের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করার ন্যায় আমরা আমাদের অভিযানের ফলাফল জানতে অস্থির। পরবর্তীতে আপ্রাণ চেষ্টা করে শত্রুপক্ষের ওয়ারলেস বার্তা থেকে আমরা ছোট-খাট সংবাদ পেতে থাকি।

হিন্দুয়ারা ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারের সংবাদ, 'পনের ব্যক্তি মারা গেছে এবং অ্যামুনিশন ডিপো পুড়ে গেছে।'

আমি ওয়ারলেসে তাদের লক্ষ্য করে বললাম, 'কি ভাই, রাত কেমন কাটল?'

জবাবে তাদের অপারেটর চড়া গলায় বলল, 'আমি জানি, তুমি আফগানী। কিন্তু তোমরা আমাদের মারছ কেন? মারতেই যদি হয়, তো নরসীমাকে মার। আমাদের গরীব ছেলে-মেয়েদেরকে এতীম করে তোমাদের লাভ কী?'

জবাবে আমি হাসিমুখে বললাম, 'ভালো কথা, কিন্তু আমাদের মজলুম কাশ্মিরী ভাই-বোনদের রক্ত ঝরানোর জন্যে নরসীমা রাও তো এখানে আসে না!'

আমার জবাব শুনে সে অশ্রাব্য ভাষায় আমাকে গালাগাল করতে শুরু করে। অগত্যা আমি সেট বন্ধ করে দিলাম।

আইবির ক্যাম্পে আক্রমণ

এবার আমাদের টার্গেট কাপওরায় অবস্থিত ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর (আই বি) একটি কেন্দ্র। যুগের কলংক এ প্রতিষ্ঠানটির অপতৎপরতার কুখ্যাতি সকলেরই জানা। কাশ্মীরে আইবি কর্মকর্তাদের কাজ হল, মুজাহিদদের মাঝে পরস্পর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা এবং জনসাধারণের মনে মুজাহিদদের প্রতি অনাস্থা জন্ম দেয়া।

একদিন লোলাব থেকে ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার জাবের জাব্বার আমাকে জানালেন যে, আইবি সদস্যরা আমাদের গোপন ঘাঁটির সন্ধান পেয়ে গেছে। অতি দ্রুত তারা হানা দিতে আসবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যথাশীঘ্র আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

আমাদের এ গোপন ঘাঁটিতে এমন কোন ভারী সরঞ্জাম ছিল না, যা অন্যত্র সরাতে হবে। সকল সাথী ঘাঁটি ছেড়ে অদূরে এক নিরাপদ স্থানে পজিশন নিয়ে ওঁৎ পেতে বসে পড়ি।

আমরা সারা দিনের ক্ষুধার্ত, এক‌ফোঁটা পানিও পান করা সম্ভব হয়নি। শত্রু বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার স্পৃহা ক্ষুধার জ্বালা দূর করে দিয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করা সত্ত্বেও সৈন্যদের আগমনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ফলে আমি ওয়ারলেস মারফত আবার ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ করি।

তিনি বললেন, 'এটা আসলে একটি গুজব ছিল। তার কারণ, ভারতীয় সৈন্যরা ঘোষণা করেছিল, তোমাদের এ মুজাহিদ গ্রুপটিকে কেউ ধরে দিতে পারলে তাকে মোটা অংকের পুরস্কার দেয়া হবে। আইবির সহায়তায় কিছু লোক সুযোগটি গ্রহণের জন্যে এ অপপ্রচারে লিপ্ত হয়।'

আইবির এ ক্যাম্পটি ছিল ভারতীয় সৈন্যদের ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারের নিকটে। এ কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আক্রমণ ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারের উপরও করা হবে।

একদিন প্রচন্ড বরফপাত হল এবং সমগ্র এলাকা ছিল বরফের সাদা চাদরে আবৃত। আমরা ক্যাম্পের উপর আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা নিলাম। বাইরে প্রায় চার ফুট বরফের আস্তর জমে আছে। আমাদের কারো কাছে গরম পোষাক ছিল না।

পোষাকের বন্দোবস্ত হল। গরম বুটেরও ব্যবস্থা করলাম। তারপর গন্তব্যে এগিয়ে চললাম।

সকাল এগারোটা থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা হাঁটতে থাকি। প্রচন্ড শীত ও বরফ আমাদের সফরকে অত্যাধিক জটিল করে তুলেছিল। সন্ধ্যা প্রায় ছ'টার সময় আমরা ক্যাম্পের নিকটে পৌঁছে গেলাম।

একটি নিরাপদ স্থানে সাথীদেরকে রেখে আমি নিজে ক্যাম্পের খবরাখবর সংগ্রহ করতে চলে গেলাম। ক্যাম্পের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে আক্রমণ করার স্থান এবং পেছনে হাঁটার পথ নির্ণয় করে সাথীদের কাছে ফিরে এলাম।

সাথীদেরকে ক্যাম্পের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করে নিকটবর্তী একস্থানে গিয়ে জেলা কমাণ্ডারের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি এ এ্যাকশনের প্রয়োজনীয় প্রচুর অ্যামুনিশন আনার জন্য নির্দিষ্ট একস্থানে কাউকে পাঠানোর কথা বললেন। আমি একজন কাশ্মিরী মুজাহিদ এবং আমাদের দু'জন সাথীকে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিলাম। দু'দিন পর কাংখিত সরঞ্জামাদি নিয়ে তারা ফিরে আসে।

আক্রমণের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিতে দু'দিন কেটে গেল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে আমরা ক্যাম্প অভিমুখে রওনা হলাম।

সংখ্যায় আমরা পনেরজন। তন্মধ্যে পাঁচজন ছিল স্থানীয় মুজাহিদ। গোটা এলাকা এখনো রীতিমত বরফে ঢাকা।

ক্যাম্পের নিকটে পৌঁছে মিসাইল স্থাপন করার স্থান ঠিক করা হল। কিন্তু বরফের কারণে মিসাইল লাঞ্চার স্থাপন করা ছিল দুষ্কর।

সকলে মিলে হাতের সাহায্যে বরফ সরালাম। এক ঘন্টা কঠোর পরিশ্রমের পর মিসাইল স্থাপনের জায়গা করে নিতে সক্ষম হলাম।

সাথীরা সকলেই তখন শীতে থরথর করে কাঁপছে। মিসাইল স্থাপন করে ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিকে কোরিং পার্টিকে বসালাম। আর তৃতীয় দিকে বসালাম রকেটলাঞ্চার সজ্জিত গ্রুপকে।

প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আমি নিজে মিসাইল থ্রো করার জন্যে ফিরে আসি। রাওলাকোটের আদেল ভাইকে বলেছিলাম যে, তিনি আগে রকেট নিক্ষেপ করবেন। আমার মিসাইল থ্রো করার কথা তার পরে।

৩১ জানুয়ারী সন্ধ্যায় ঠিক ছ' টার সময় আদেল ভাই পরিকল্পনা মোতাবেক সর্বপ্রথম রকেট নিক্ষেপ কর। রকেট সোজা গিয়ে আইবির অফিস ভবনের উপর আঘাত হানে। পর মুহূর্তেই আমি মিসাইল নিক্ষেপ করলাম। চোখের পলকে ভবনটি বিধ্বস্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এবার অন্যান্য সাথীরা লাঞ্চারের মাধ্যমে গ্রেনেড ছুড়তে শুরু করে।

আইবির ভবনের অদূরে এক কিলোমিটারের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের আরো চারটি ক্যাম্প ছিল। আমাদের আশংকা ছিল, গোলাগুলির শব্দ শুনে তারা বীরত্ব দেখানোর চেষ্টা করে বসে কিনা। এ কারণে তাদের আগমনের পথে আগেই আমি পিকাগান সজ্জিত কয়েকজন মুজাহিদ মোতায়েন করে রেখেছি।

আমাদের ধারণা অনুযায়ী কয়েকজন সৈন্য এদিকে আসার চেষ্টা করলে মুজাহিদরা তাদের উপর প্রচন্ড ফায়ারিং করে, যার ফলে তাদের কয়েকজন সৈন্য মারা যায়। আমাদের এ হামলা পনের মিনিট পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপর পরিকল্পনা মোতাবেক আমরা পিছনে সরতে শুরু করি।

জঙ্গলে একস্থানে বসে আমি ওয়ারলেস অন করলাম। শুনতে পেলাম আইবির মেজর ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টার প্রধানের নিকট সাহায্য তলব করছে। নিজেদের ২২ জন সৈন্যের মৃত্যু এবং অনেকে ধ্বংসাবশেষের নীচে চাপা পড়ে থাকার সংবাদ দিয়ে সে হেড কোয়ার্টারকে বলল যে, 'আশ-পাশের চার ক্যাম্পে যেন বলে দেয়া হয়, তারা যেন 'সন্ত্রাসীদের' প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখে এবং গতিবিধি দেখে রাখে। ওরা যে গ্রামে গিয়ে অবস্থান নেবে, আগামী দিন ঘেরাও করে আমরা ওদেরকে গ্রেফতার করব।'

হৃদয়বান মেজবানদের আশ্রয়ে

আমাদের অভিযান শেষ। এবার আমাদের সামনে ক্ষুধা ও পিপাসার ন্যায় কঠিন সমস্যা। এখান থেকে সরে যাওয়াও একান্ত প্রয়োজন। কারণ, আশেপাশে অসংখ্য ভারতীয় সৈন্যের ক্যাম্প।

তীব্র ঠাণ্ডা ও বরফের মধ্য দিয়ে পা টেনে টেনে রাত দু'টার সময় লোকালয় থেকে কিছু দূরে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেই। কনকনে শীত এবং ক্লান্তিতে আমরা সকলেই অস্থির। পর্যাপ্ত পরিমাণ লাকড়ি ছিল আমাদের কাছে। কিন্তু ভিজা হওয়ায় তা আর জ্বালানো সম্ভব হল না।

আরো কয়েক ফার্লং হাঁটার পর এক স্থানে আমরা যাত্রা বিরতি দিলাম। এখানে কিছু শুকনো কাঠ পাওয়া গেলে আগুন জ্বালাতে সক্ষম হই।

শীতার্ত দেহে আমরা সকলে কিছু উত্তাপ গ্রহণ করলাম। পরনের কাপড় ভিজে গিয়েছিল, তাও শুকিয়ে নিলাম। এরপর আহারের সন্ধানে রওনা হলাম পার্শ্ববর্তী গ্রামের দিকে।

গ্রামে পৌঁছে আমি একটি ঘরের দরজায় করাঘাত করি। ঘরের মালিক আমার বহু পুরোনো পরিচিত লোক। হাসিমুখে আমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বললেন, 'আপনি আজ বিরাট এক কাজ করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ সফল অভিযান আপনারই কীর্তি।'

আমি মুচকি হেসে বললাম, কৈ আমরা তো কিছুই করিনি।

'করিনি বললে কী হবে? অভিযানে যাওযার সময় আমি আপনাদেরকে দেখেছিলাম।' তারপর তিনি বললেন, 'মনে হয় আপনারা সকলেই ক্ষুধার্ত।'

আমি কিছুই বললাম না। কিন্তু আমাদের মনের কথা বুঝতে তাঁর বাকী থাকল না। রাত তৃতীয় প্রহরে তিনি আমাদের জন্যে খাবারের আয়োজন করেন। চা পান করাতেও ভুল করলেন না। অবশেষে সেখানেই শুয়ে পড়ার প্রস্তাব করলে আমি রসিকতা করে বললাম, ভোরে যদি ভারতীয় সৈন্যরা আপনার বাড়ীতে মেহমান হয়ে যায়, তাহলে?

জবাবে তিনি বললেন, 'চিন্তার কোন কারণ নেই, এ গৃহকেই আপনি মোর্চা বানিয়ে নিন।'

কিন্তু তখন ওখানে অবস্থান করা ছিল কৌশলের বিরোধী। তাই আমি বললাম, না, রাতটা আমাদের জঙ্গলেই কাটাতে হবে।

পুনরায় চা পান করে জঙ্গলের দিকে রওনা দিলাম। জঙ্গলে বরফের বিছানায় শোয়া আর সম্ভব হল না। তাই বড় একটি গাছের নীচে বসে পড়লাম। আমি পাহারার দায়িত্ব গ্রহণ করলে অন্যান্য সাথীরা বসে বসে ঝিমুতে শুরু করে।

সূর্যোদয়ের পর তন্দ্রাচ্ছন্ন সাথীদেরকে জাগালাম। সকলের কাপড়-চোপড় কাদামাখা। দেখে মনে হল, সবাই প্লাস্টিকের কাপড় পড়ে আছে। একে অপরের অবস্থা দেখে হাসতে শুরু করি।

কিছুটা বেলা হলে সাথীদের নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করে একটি ঘরে গিয়ে বসলাম। অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের নির্জীব দেহে প্রাণ ফিরে আসে। আমাদের মেজবান বিভিন্ন ঘর থেকে কাপড় সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন এবং আমাদের ভিজা ও কাদামাখা কাপড়গুলো পরিষ্কার করার জন্যে নিয়ে যান।

আমাদের গোসলের অবসরে গৃহকর্তা আমাদের খানাপিনার আয়োজন করে ফেলেন। এটা ছিল মুজাহিদদের প্রতি কাশ্মিরী জনগণের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও আনন্দের সাথেই এসব করেছিলন আর বারবার বলছিলেন যে, 'আমার একান্ত কামনা ছিল, কোন মুজাহিদ আমার ঘরে আসবে, তাহলে আমি মন ভরে তাঁর সেবা করতে পারব। আল্লাহর শোকর, আজ আপনাদের মাধ্যমে আমার সে ইচ্ছা পূরণ হতে যাচ্ছে।'

লোকটি ছিল আমার পুরনো পরিচিত। কাশ্মীর উপত্যকায় প্রথমবার অবস্থানের সময় তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ওখান থেকে চলে আসার পর কে একজন গুজব ছড়িয়েছিল যে, আমি সীমান্ত এলাকায় শহীদ হয়ে গিয়েছি। তিনিও এ খবর শুনেছিলেন এবং অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। এখন জীবিত তার ঘরে মেহমান হওয়ায় তিনি খুবই আনন্দিত হন।

আমাদের পাহারায় নিয়োজিত ছিল গ্রামের বেশ কিছু লোক। গ্রামের প্রত্যেকের ব্যাপারে আমরা অবহিত এবং নিশ্চিত ছিলাম। তথাপি আমরা চাচ্ছিলাম যে, যত তাড়াতাড়ি হোক আমরা সেখান থেকে জঙ্গলে চলে যাব। কারণ, লোকালয়ে আমাদের দীর্ঘ উপস্থিতি মেজবানদের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে। তাই খানা খাওয়া এবং ভিজা কাপড় শুকানোর পর আর বিলম্ব না করে জঙ্গলের দিকে রওনা হলাম।

জঙ্গলের খানিকটা ভেতরে নিরাপদ একস্থানে মাটি খুঁড়ে একটি ঘাঁটি বানিয়ে নিয়েছিলাম। তাতে বিশজন মুজাহিদ থাকতে পারত এবং তার মধ্যে আবশ্যকীয় যাবতীয় আসবাবপত্র রাখা ছিল। অবসর সময়ে আমরা সেখানে বিশ্রাম করে কাটাতাম।

কয়েকদিন পরেই রমযান মাস শুরু হয়ে গেল। কমাণ্ডার আমাদেরকে বলে দিয়েছিলেন, আমরা যেন রমযান মাসে কুরআন তেলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদত অধিক পরিমাণে করি এবং আল্লাহর দরবারে মুসলিম মিল্লাতের মুক্তি ও সমগ্র বিশ্বের মুজাহিদদের জন্যে দু'আ করি।

ক্রুসেন ক্যাম্পে হামলা

একদিন আমি বাংকারে বসে আছি। জেলা কমাণ্ডার তাহের এজাজ ও ডিভিশনাল কমান্ডার মাজেদ জাহাঙ্গীরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হল, এবার ক্রুসেন ক্যাম্পের উপর হামলা করা হবে। এ ক্যাম্পের সৈন্যরা সোগামে তেরজন মুজাহিদকে শহীদ করেছিল। এর প্রতিশোধ নেয়া একান্ত আবশ্যক।

ক্যাম্পটি স্থাপন করা হয়েছিল এক সমতল স্থানে। তার একদিকে ছোট একটি পাহাড়। নিকটেই চন্ডিগ্রাম ও কুলিগ্রামের সেনাক্যাম্প। ফলে তাতে আক্রমণ করা অসম্ভব না হলেও দুষ্কর ছিল নিঃসন্দেহে।

মাগরিবের নামায আদায় করে আমরা ক্যাম্পের দিকে রওনা করলাম। সিদ্ধান্ত হল, মিসাইল টাচ্ দেয়ার পরিবর্তে এবার লাইট-সুইচ ব্যবহার করব। এটা একটা নিরাপদ পদ্ধতি। কারণ, এ পদ্ধতিতে মিসাইল ফায়ার করতে হয় না, আলোর কিরণ পড়ে নিজে নিজে বিস্ফোরিত হয়।

ক্যাম্পে যাওয়ার রাস্তায় ভারতীয় সৈন্যরা দিনরাত পজিশন নিয়ে পাহারায় নিয়োজিত থাকে। পার্শ্ববর্তী ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ক্যাম্পের দিকে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হল।

সাথীদের দু'টি গ্রুপে বিভক্ত করে এক গ্রুপ আগে পাঠিয়ে দিলাম আর অপর গ্রুপকে রাখলাম কয়েক গজ পেছনে। নীরবে হেঁটে আমরা ক্যাম্প থেকে প্রায় চারশ গজ দূরে অবস্থিত পাহাড়ে পৌঁছে গেলাম। এখানে আমাদের থামতে হল। কারণ তার পঞ্চাশ গজ সামনেই সৈন্যরা একটি বাংকার বানিয়ে রেখেছিল।

চাঁদের আলোতে ঝলমল করছিল এলাকা। আমরা শংকিত হয়ে পড়লাম যে, পাছে সৈন্যরা আমাদের গতিবিধি দেখে ফেলে কিনা। সাথীদেরকে কয়েকটি ঝোপের আড়ালে বসিয়ে দিয়ে পিঠে দু'টি মিসাইল নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে ক্যাম্পের দিকে এগুতে শুরু করলাম।

মিসাইল দু'টোর এক একটির ওজন নয় কেজি। তিন ফুট লম্বা ও প্রায় পৌনে তিন ফুট প্রস্থ। একে এম-৫৭ মিসাইল বলা হয়। রাইফেল তো আছেই। এ দু'টি মিসাইল ও রাইফেল বহন করে একটানা তিনঘন্টা আমি ক্যাম্পের দিকে ক্রোলিং করতে থাকি। ক্যাম্পের অবস্থান সম্পর্কে আমার ভালো জানাশুনা থাকলেও একটি পোস্টের অবস্থান আমার জানা ছিল না। হামাগুড়ি দিতে দিতে অজান্তে আমি সেই পোস্টের নিকটে এসে পড়ি।

হঠাৎ দেখতে পেলাম, আমার থেকে আনুমানিক ছয়ফুট ব্যবধানে এক সৈন্য দাঁড়িয়ে। অকস্মাৎ একজন ভারতীয় সৈন্যকে সামনে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে যাই। ভাবলাম, এবার ধরা পড়ে গেছি, আর রক্ষা নেই। সৈন্যটি আমাকে দেখে ফেলেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। আমার আগমন সে টেরই পায়নি। কিন্তু তারপরও আমি যথাস্থানে অসাড় হয়ে পড়ে রইলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, রাত প্রায় দশটা বাজছে। আমার আগে থেকেই জানা ছিল যে, প্রতি ঘন্টা পর পর পাহারাদারদের ডিউটি পরিবর্তন হয়। অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যটিও এখান থেকে চলে যাবে। আমি তার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ঠিক দশটার সময় সে অপর প্রহরীকে ঘুম থেকে তুলে দেয়ার জন্যে চলে গেল। এ সুযোগে আমি দ্রুত পোস্ট পার হয়ে ক্যাম্পের মাত্র পঞ্চাশ গজ ব্যবধানে পিঠ থেকে মিসাইল নামালাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে শান্ত হয়ে ধীর-স্থিরভাবে একটি উপযুক্ত স্থানে মিসাইল স্থাপন শেষে শুয়ে অপেক্ষায় থাকলাম। দেখলাম, প্রায় পনের মিনিট পর অপর প্রহরী এসে হাজির। ঘুমে তার শরীর টলমল করছিল। সেও আমাকে দেখতে পেল না।

আমার কাজ ছিল খুব দীর্ঘ। রাত দেড়টার সময় সব কাজ শেষ করলাম। এবার দু'টা বাজার অপেক্ষা, যাতে আবার পাহারাদার বদলের সুযোগে পোস্ট অতিক্রম করে ঘাঁটিতে ফিরে যেতে পারি।

ঠিক দু'টার সময় পাহারাদার পরিবর্তন হল। এ সুযোগে আমি দ্রুত বেরিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে সাথীদের কাছে পৌঁছে যাই। তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়ে সঙ্গে নিয়ে অতি সাবধানে নিরাপদ পথে আবার বেরিয়ে পড়ি।

ঘুমে সকলের চোখ লাল হয়ে গিয়েছে। পার্শ্ববর্তী এক জঙ্গলে পৌঁছে ঝোপের মধ্যে তাঁদেরকে শুয়ে থাকতে বললাম। সময়টা ছিল রাতের শেষ প্রহর। সেনাক্যাম্প আমাদের একেবারে সামনে।

এবার অপেক্ষা, সূর্য কখন উদয় হবে আর তার প্রথম কিরণ মিসাইলের উপর প্রতিফলিত হবার সাথে সাথে মিসাইল ক্যাম্পের উপর আঘাত হানবে।

অপেক্ষার প্রহর এক সময় শেষ হল। পূর্ব আকাশে সূর্য উদয় হবার পর কিরণ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিসাইল গিয়ে সোজা সেই ব্যারাকের উপর আঘাত হানে, যাকে আমি টার্গেট বানিয়েছিলাম। একটি বিস্ফোরিত হয় ব্যারাকের এক কোণে, অপরটি ঠিক মধ্যখানে।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণে গোটা ক্যাম্প প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। মিসাইল দু'টোতে তেল আর পেট্রোল ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। ব্যারাকটিও ছিল কাঠের তৈরি। ফলে বিস্ফোরণের সাথে মুহূর্তের মধ্যে ব্যারাকে আগুন ধরে যায়।

দুশমনের ক্যাম্পে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে মুজাহিদরা আবেগাপ্লুত হয়ে নারায়ে তাকবীর শ্লোগান দিতে শুরু করে। বহু কষ্টে আমি তাদেরকে থামালাম। তারপর ওয়ারলেস মারফত ক্যাম্পের খবর নেয়ার চেষ্টা করি। এক পর্যায়ে শুনতে পেলাম, ক্যাম্পের এক সেনা-অপারেটর সোগাম ক্যাম্পকে খবর

দিচ্ছে 'আমাদের উপর আযাব নেমে এসেছে। ক্যাম্প পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে। এখন আমাদেরকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করুন; অতি শীঘ্র উদ্ধারকারী গাড়ী পাঠিয়ে দিন।'

এর অল্পক্ষণ পরেই দেখতে পেলাম, সতেরটি গাড়ীর বহর ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে। আমার ওয়ারলেস সেট অন করা। তাতে আমাদের অভিযানের আলোচনাই হচ্ছিল। আমাদের শুনতে বড় সাধ ছিল যে, কতজন সৈন্য মারা পড়েছে।

খানিক পরে সেট মারফত মৃতের সংখ্যাও জানতে পারলাম। সংবাদটা হেড অফিসকে জানাল যে, এ দুর্ঘটনায় ৪০ জন সৈন্য মারা গেছে। কারো আহত হবার খবর পেলাম না। পরদিন পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীরা গুনে গুনে সেই ৪০ টি লাশ ট্রাকে তুলে দেয়।

ডিভিশনাল কমাণ্ডার মাজেদ জাহাঙ্গীর ওয়ারলেস মারফত আমাদেরকে অনতিবিলম্বে লোলাব ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে যাওয়ার আদেশ দিলেন। আদেশ মোতাবেক আমরা অন্যত্র রওনা হই। পথে মাজেদ ভাইও এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হল। এ সফল অপারেশনের পুরস্কার স্বরূপ তিনি আমাদের গ্রুপকে মোটা-তাজা একটি খাসী কিনে দেন। খাসিটি যবাই করে আমরা তৃপ্তি সহকারে আহার করলাম এবং বিজয়ের আনন্দ উদ্‌যাপন করলাম।

অবরুদ্ধ ভাইদের উদ্ধার অভিযান

এরপর কয়েকদিন আমরা জঙ্গলের গোপন বাংকারে অবস্থান করি। এ সময়ে আমরা প্রতিদিন ফজর নামায আদায় করার পর এলাকায় গিয়ে সকালের নাস্তা করতাম।

একদিন ফজর নামায আদায় করে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে আমাদের কাশ্মিরী মুজাহিদ সাথী শমবাবাকে গ্রামে পাঠালাম। শমবাবা অত্যন্ত সাহসী মুজাহিদ। নিবাস কাশ্মীরের কেরালাপুরায়। মাথায় লম্বা লম্বা চুল, তাকেও এখন শের খানই মনে করা হয়। ভারতীয় সৈন্যরা তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু দুর্ধর্ষ এই বীর মুজাহিদ ওদের ধরা-ছোয়া ও কলা-কৌশলের বাইরের লোক।

যা হোক শমবাবা কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে সংবাদ দিল যে, ভারতীয় সৈন্যদের বিশাল এক বাহিনী বানের স্রোতের মত পার্শ্ববর্তী গ্রামে ঢুকে পড়েছে।

এ খবর শুনে আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম। আমাদের দু'জন সাথী ঐ গ্রামে কয়েকজন মুজাহিদের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল। আমার বুঝতে আর বাকী রইল না যে, ওরা সকলেই সৈন্যদের ঘেরাওয়ে আটকা পড়েছে।

কিছুক্ষণ পর খবর যা পেলাম, তাতে তা-ই সত্য প্রমাণিত হল। হরকাতুল আনসারের জেলা কমাণ্ডার আবু উবায়দা ভাই আমাকে ওয়ারলেস মারফত

জানালেন যে, 'আমরা বারোজন মুজাহিদ এক স্থানে আটকা পড়ে আছি এবং ভারতীয় সৈন্যরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আপনার কিছু করা সম্ভব হলে করুন।'

গ্রামে আটকেপড়া সাথীদের চারজন হিজবুল মুজাহিদীনের সদস্য আর বাকীরা হরকাতুল আনসারের। পরিস্থিতি ছিল বড়ই সঙ্গীন। এ খবর আমাদের সুপ্রীম কমাণ্ডারের কানে গেলে তাঁর পক্ষ থেকেও আমাকে আদেশ করা হল, যেভাবে হোক, আটকেপড়া মুজাহিদদের ভারতীয় সৈন্যদের কবল থেকে উদ্ধার কর।

আমার গ্রুপে মুজাহিদ ছিল খুব কম। ওয়ারলেস মারফত আশে-পাশের অন্যান্য সব কয়টি সংগঠনের কাছে সাহায্যের আবেদন জানালাম। অত্র অঞ্চলে যে কয়টি মুজাহিদ সংগঠন আছে, তাঁরা পরস্পর সহানুভূতি ও সহযোগিতার জন্যে সম্মতি জানালে আমি সকলকে বলে দিলাম, যে কয়টি স্থানের সৈন্যদের ভেতরে প্রবেশ করার পথ আছে, তার সবক'টিতেই যেন তারা ওঁৎ পেতে বসে থাকে।

আমি সাকেব ভাটের নেতৃত্বে ছোট একটি গ্রুপকে অবরুদ্ধ এলাকার পেছন দিকে পাঠিয়ে দিলাম, যাতে এ পথে আর কোন সৈন্য ভিতরে ঢুকতে না পারে। সোগাম এবং চণ্ডিগ্রাম ক্যাম্পসমূহের রাস্তায়ও পাহারার ব্যবস্থা করলাম।

এ ছাড়া টকিপুরা এবং লালপুরার মুজাহিদদেরকে নিজ নিজ এলাকায় অবস্থান নিতে বলে দিলাম।

এখন অন্ততঃ এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, অবরোধকারী সৈন্যরা বাইরে থেকে আর সাহায্য পেতে সক্ষম হবে না। কিন্তু অবরোধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের সংখ্যাও প্রায় দু'হাজার। দু'জন কর্নেল তাদের কমাণ্ড দিচ্ছিল।

অবরুদ্ধ মুজাহিদরা যে ঘরে ছিল, তাও সৈন্যদের জানা ছিল। ফলে গ্রামে ঢুকেই তারা সোজা সেই ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে ভেতরে থেকে মুজাহিদরা ফায়ারিং শুরু করে দেয়। ভারতীয় সৈন্যরা মুজাহিদদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

কিছুক্ষণ পর দশজন সাথী নিয়ে আমি তাদের মাত্র একশ' গজ ব্যবধানে পৌঁছে গেলাম। খানিকটা উপরে এক জঙ্গলে পজিশন নিয়ে অবরুদ্ধ মুজাহিদদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করি। তাদেরকে একথা বলে দেয়ার প্রয়োজন ছিল যে, তারা যেন একত্রিত না থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু তা আর সম্ভব হল না।

এবার আমাদের দিকেও মর্টারের গোলা আসতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার সাথীদেরকে সৈন্যদের উপর ফায়ার করার আদেশ দেই। আমি নিজে পিকাগান ও গ্রেনেড লাঞ্চার দ্বারা ফায়ার করতে শুরু করি।

এবার দিশেহারা হয়ে সৈন্যরা আমাদের দিক এলোপাতাড়ি গুলী ছুড়তে শুরু করে। কিন্তু তাদের সব গুলী আমাদের পরিবর্তে জঙ্গলের গাছে গিয়ে আঘাত

হানে। দুপুর দুইটা পর্যন্ত তাদের বেশীর ভাগ ফায়ার জঙ্গলের দিকে এসে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এবার তাদের ধারণা হল, আমরা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছি। কিন্তু মহান আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে তারা আমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারেনি। উল্টো আমাদের সাথীরা যে ঘরে অবরুদ্ধ হয়েছিল, তার পাশের সৈন্যদের অবস্থান ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। ফলে সাথীরা বের হয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়ার সুযোগ পেয়ে যায়।

অপর দিকে ওয়ারলেস মারফত শুনতে পেলাম, সৈন্যরা তাদের অফিসারদেরকে বলছে যে, তারা মুজাহিদের চাপের মুখে সারেন্ডার করতে যাচ্ছে।

জবাবে অফিসার বলছে, 'তোমাদের লজ্জা করছে না, মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুজাহিদের কাছে সারেন্ডার করার কথা মুখে আনছ।'

এ সব কথোপকথন আমার অতি নিকটেই হচ্ছিল। অনুমান করলাম যে, এবার তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, লড়াই করার শক্তি আর তাদের নেই।

দিনের শেষ প্রহরে আবু উবায়দা ভাই ওয়ারলেস মারফত আমাকে খবর জানালেন, 'চারজন মুজাহিদ শহীদ হয়েছে। তাদের দু'জন হরকাতুল আনসারের, আর দু'জন জমিয়তুল মুজাহিদীনের। বাকীরা সকলে নিরাপদ রয়েছে।'

আমি তাকে বললাম, ঠিক সন্ধ্যার সময় আবার হামলা করব, তখন আপনি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবেন।

পরিকল্পনা মোতাবেক সন্ধ্যা ছ'টার সময় আমরা সৈন্যদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালাম। কিন্তু সাথীরা অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হল না। সাড়ে সাতটার সময় আবার হামলা করলাম। এবার সব ক'জনই নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হল।

পরদিন সকালে ভারতীয় সৈন্যরা নিহতদের লাশ এবং আহতদের তুলে নিতে শুরু করে। এ অভিযানে একজন মেজর, দু'জন ক্যাপ্টেন এবং বত্রিশজন সৈন্য নিহত হয়। তাদের হেলমেট, বুট ও রাইফেলের ম্যাগজিন গ্রামের আশে-পাশে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে ছিল।

আমাদের মিশন সমাপ্ত হওয়ায় ওয়ারলেস মারফত সাথীদেরকে নিকটবর্তী একস্থানে জড়ো হবার আদেশ দিলাম। কিন্তু তারা আগেই পাশের একটি গ্রামে চলে যায়। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তাদের দেখা না পেয়ে আমরা সামনে অগ্রসর হতে শুরু করি।

তখন প্রায় মধ্য রাত। আমরা গ্রামের একটি রাস্তা দিয়ে পথ অতিক্রম করছি। পার্শ্ববর্তী একটি দোকানের ছাদে কয়েকজন সৈন্য বসা ছিল। অন্ধকারে আমি তাদেরকে চিনতে পারিনি। কাছে গিয়েই একজন সৈন্যের কাঁধে হাত রেখে সজোরে চাপ দিলাম। কিন্তু সে একটুও নড়াচড়া করল না। আমি উচ্চস্বরে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে?

সে বলল, 'আমি একো কোম্পানীর লোক।'

শুনে আমি চমকে উঠি। ভাবলাম অন্যদেরকে অবরোধ থেকে উদ্ধার করে এবার নিজেই বুঝি অবরোধে ধরা দিলাম। নিজেকে সামলে নিয়ে আমি সাহসের সাথে বললাম, 'একো কোম্পানীর লোক হলে তুমি এখানে স্থিরভাবে বসে থাক।'

সৈন্যটি করুণ সুরে বলল, 'ঠিক আছে স্যার।'

এরপর বিলম্ব না করে আমি দ্রুত জঙ্গলের দিকে চলে এলাম। সৈন্যটি মনে করেছিল, আমি তাদেরই অফিসার।

সে রাতটা আমরা বরফের উপর বসে বসে জেগে কাটিয়ে দেই। ভোর হলে মাজেদ জাহাঙ্গীর ভাই ও সুপ্রীম কমাণ্ডারের সাথে আমাদের যোগাযোগ হল। তাঁরা আমাদের এ সফল অভিযানের জন্যে সীমাহীন আনন্দ প্রকাশ করেন। এছাড়া দশ হাজার রুপি, এক হাজার রাউণ্ড গুলি এবং তিনটি মিসাইল পুরস্কার দিয়ে তারা আমাদেরকে আরো বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন।

রমযান মাসের সফল অভিযান

আমরা পবিত্র রমযান মাসে রোযা রাখা এবং জিকির-আজকারে সময় কাটানোর পরিকল্পনা করেছিলাম। বরফপাত এবং শীতের তীব্রতা এখনো কমেনি। আমি জেলা কমাণ্ডার তাহের এজাজ ভাইকে দাওয়াত করলাম, যেন রমযানের কয়েকটা দিন তিনি আমাদের সাথে অতিবাহিত কর।

রমযানের ৭ তারিখে তিনি এবং ব্যাটলিয়ন কমাণ্ডার আবদুল আকবর ভাই আমাদের ক্যাম্পে আগমন করেন। পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে তাঁদের জন্য ইফতারীর আয়োজন করা হল। এশার নামাযের পরে তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'মেহমানদের কোথায় রাখবেন?'

বললাম, জঙ্গলে।

তাঁরা বলল, 'বরফ খুব বেশী আর রাতও হয়ে গেছে অনেক। আমরা এখানেই থেকে যাই।'

কিন্তু লোকালয়ের এই বিপদসংকুল স্থানে তাদেরকে রাখতে আমি অপারগতা প্রকাশ করলাম। অগত্যা তাঁরা জঙ্গলের দিকে রওনা হল। রাত সাড়ে দশটায় আমরা আমাদের গোপন ঠিকানায় উপনীত হলাম।

তাহের ভাই বললেন একটানা সফল অভিযানের পর এখন রমযান মাসের এ বাকী দিনগুলো আপনার আরামে কাটানো দরকার। পাঁচদিন তাঁরাও আমাদের সঙ্গে অতিবাহিত করলেন।

আমাদের আরো কয়েকটা দিন বিশ্রাম করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদের তা সহ্য হল না। কে একজন তাদেরকে জানিয়ে দিল যে, তাহের এজাজ অমুক ক্যাম্পে শের খানের সাথে আছেন। আমাদের ইন্টেলিজেন্সও সঙ্গে

সঙ্গে আমাদের অবহিত করলেন যে, 'আপনার' গোপন আস্তানা এখন আর 'গোপন' নেই। কাজেই দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।'

খবর শুনে আমরা রাতারাতি মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্র ও অতি প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সঙ্গে করে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে রওনা হলাম। আমার কয়েকজন সাথী তাহের ভাইয়ের সঙ্গে দূরবর্তী এক আস্তানায় চলে যায় আর আমি অন্যান্য সাথীদের নিয়ে অন্য একদিকে রওনা হই।

দিনটি ছিল রমযান মাসের তের তারিখ। বেশ কিছু পথ অতিক্রম করে আমরা শামরিয়াল নামক এক গ্রামে উপস্থিত হই। এখানে রাতের খানা খেলাম। সাহরী খাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সামনের ছোট্ট নদীটি পার হয়ে ওপারে গিয়ে বিশ্রাম করব ও সাহরী খাব।

নদীর কূলে গিয়ে দেখতে পেলাম, প্রচন্ড শীতের কারণে পানির উপরিভাগ জমে গেছে। ভাবলাম, জমাটবাধা পানির আস্তরের উপর দিয়ে হেঁটেই আমরা নদী পার হতে পারব। সকলের আগে ফয়সাল ভাই সাহসিকতার সাথে নদীতে পা রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে পানির জমাট আস্তর ভেঙ্গে তিনি গলা পর্যন্ত ডুবে যান।

আমরা বড় কষ্টে তাকে উদ্ধার করে আনলাম। তারপর সকলে মিলে পরামর্শ করে নতুন পদ্ধতিতে নদী পার হয়ে চা-নাস্তা খেলাম। শীতের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পেলে একটি সড়কে গিয়ে পৌঁছলাম, যে সড়ক দিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা অবাধে চলাফেরা করে থাকে। শত্রুবাহিনী এ পথেই আমাদের আস্তানায় হানা দিতে যাবে বলে আমার ধারণা। মনে মনে আমি তাদেরকে মুজাহিদ হত্যার মজা দেখানোর এই পরিকল্পনা নেই, যা অন্যান্য সাথীরা জানত না।

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমি রাস্তার উপর থেকে বরফ সরিয়ে এবং রাস্তার নীচে মাটি খুঁড়ে কয়েকটি মাইন পুঁতে রাখলাম। দু'জন সাথী ছাড়া আর কেউই এ খবর জানতে পারেনি। মাইনের সাথে রিমোট-সিস্টেমও স্থাপন করে রাখি।

অবশেষে পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে গিয়ে আমরা সাহরী খেয়ে পুনরায় জঙ্গলের দিকে রওনা হলাম। বরফের আস্তর তখন চার ফুট উঁচু। আমরা এই বরফের উপরই ফযর নামায আদায় করে নেই। তারপর সেখান থেকে একটু উপরে গিয়ে গাছের আড়ালে বসে শত্রুর আগমনের অপেক্ষায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

ভোর পাঁচটা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত আমরা ভারতীয় সৈন্যদের গাড়ীর অপেক্ষা করতে থাকি। আমার ধারণা মতে তাদের এ পথে আমাদের আস্তানায় হানা দিতে যাবার কথা।

তিনটার পর হঠাৎ দেখতে পেলাম, সৈন্যরা আমাদের আস্তানায় হানা দেয়ার জন্যে ধেয়ে যাচ্ছে। সাথে তাদের দু'টি জীপ ও একটি বড় গাড়ী।

সাথীরা ইংগিতে ফায়ার করার অনুমতি চাইল। কিন্তু আসল রহস্য তাদের অজানা। আমি কেন ফায়ার করছি না বা তাদেরকে ফায়ার করার অনুমতি দিচ্ছি

না, তারা তা বুঝে ওঠতে পারেনি। বললাম, ধৈর্য ধর, এরা আমাদের ফেলে আসা আস্তানায় হানা দিতে যাচ্ছে। ফেরার পথে দেখবে মজা।

আমরা বসে রইলাম, অপেক্ষা কখন ওরা ফিরে আসে। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেলাম, ওরা ব্যর্থ অভিযানের আনন্দে উৎফুল্লচিত্তে ফিরে আসছে। একজন সৈন্য বাঁশি বাজিয়ে উল্লাস প্রকাশ করছে।

প্রথমে আসল একটি জীপ। আমাদের টার্গেট অতিক্রম করে চলে গেল। আমি হাত সংবরণ করে রাখলাম। তাতে সৈন্য ছিল এক থেকে দু'জন। একজন গোয়েন্দা এবং একজন কর্নেলও তাতে ছিল। পরক্ষণে বড় গাড়িটি যেই মাত্র আমার পুঁতে রাখা মাইনের উপর এসে পৌঁছল, সঙ্গে সঙ্গে রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা বিস্ফোরণ ঘটালাম।

গাড়ীটি বিশ ফুট উপরে শূন্যে উঠে যায়। যে লোকটি বাঁশি বাজাচ্ছিল, তার অর্ধেক দেহ বাঁশিসহ ছিটকে একটি দেবদারু বৃক্ষের উপর গিয়ে আটকে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে গাড়ীতে আরোহী আঠারজন সৈন্যের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি একটি গাছের উপর পড়ে যায়। জীপে আরোহণকারী বাকী চারজন্য সৈন্যও একই সাথে মারা পড়ে।

মাইনের রিমোট-সিস্টেমে একটি রিসিভার থাকে। আমি মাইন পুঁতে রিসিভারের সাথেও কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য রেখে দিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য, বিস্ফোরণের পর সৈন্যরা যখন তদন্ত করতে আসবে এবং রিসিভার ওঠানোর চেষ্টা করবে, তখন তারাও যেন বিস্ফোরণের শিকার হয়।

বিস্ফোরণে গোটা এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। নদীর ওপারের ক্যাম্প থেকে দ্রুত সৈন্যরা এসে যায়। খুঁজে খুঁজে তারা লাশ একত্র করতে শুরু করে। কয়েকজন সৈন্য অকুস্থলের এদিকে-ওদিকে ঘোরাফেরা করছিল।

অল্পক্ষণ পরেই তারা তা পেয়ে যায়। মাটি থেকে ওঠানোর পর আরো কয়েকজন সৈন্য তা দেখার জন্যে আশে-পাশে জড়ো হয়। রিসিভারের সাথে এক কিলোঃ বারুদ রেখে দিয়েছিলাম। মাইন পেয়ে গেছে মনে করে সৈন্যরা সম্ভবতঃ খুশিই হয়েছিল।

আরো কয়েকজন সৈন্য তা দেখার জন্যে জড়ো হওয়া মাত্র আমি বোতামে টিপ দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার অভিপ্রায় অনুযায়ী পুনরায় প্রচন্ড বিস্ফোফণ ঘটে। আরো কয়েকজন সৈন্যের ইহলীলা সাঙ্গ হয়। আমাদের এ সফল অভিযানে শত্রুদের ক্যাম্পে শোকের ছায়া নেমে আসে।

আবার অবরুদ্ধ অবস্থায়

সাথীদের নিয়ে এবার আমি নিরাপদ অবস্থানের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সাবধানতার খাতিরে দূরের কোন এক লোকালয়ে গিয়ে ইফতার করার

সিদ্ধান্ত নেই। লোকালয়ে পৌঁছে আমরা ইফতার করে তাহের ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম।

আমাদের কুশলাদি জেনে তাহের ভাই আমাদেরকে তাঁর কাছে চলে যেতে বললেন। কিন্তু তিনি তখনো আমাদের থেকে অনেক দূরে থাকায় আমরা সেদিকে না গিয়ে পার্শ্ববর্তী আস্তানায় চলে গেলাম। এ সাফল্যের কারণে তাহের ভাই খুশী হয়ে আমার দলের মুজাহিদদের জন্যে দশ হাজার রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেন।

এ অভিযানের পর আমরা দর্দপুরা থেকে ফলারোস চলে যাই। সেখানে প্রায় দশদিন বিশ্রাম করি। একাদশ দিবসে আমরা প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা করছিলাম। ইত্যবসরে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে ফায়ারিং এর শব্দ আসতে শুরু করে। আমাদের কয়েকজন সাথী তখন উক্ত এলাকায় অবস্থান করছিল।

ওয়ারলেস মারফত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারলাম, তারা ভারতীয় সৈন্যদের ফাঁদে আটকা পড়েছে। রাওলাকোটের আদেল ভাইয়ের তো পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছিল না।

আমার পেরেশানীর আর সীমা রইল না। আস্তানা অতিক্রম করে সাথীদের কাছে গিয়ে জানতে পারলাম যে, রাস্তার উপর টহলদার সৈন্যরা সক্রিয় রয়েছে। এর অল্পক্ষণ পর হঠাৎ দেখতে পেলাম, আমাদের চারিদিকেও সৈন্য আর সৈন্য। অর্থাৎ– আমরাও অবরোধে পড়ে গেছি। অগত্যা একদিন একরাত পর্যন্ত অসহায়ভাবে ওখানেই পড়ে থাকতে হল।

সৈন্যদের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, কোন প্রকারে বের হওয়ার সুযোগই পেলাম না। অপরদিকে আমার সাথীরা গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছে। টানা একদিন এক রাত অপেক্ষার পর সৈন্যদের চাপ কিছুটা কমে আসলে আমিও সাথীদের সাথে মিলিত হলাম।

আদেল ভাইয়ের এখনো কোন হদিস পাওয়া যায়নি। তাই ভারতীয় সৈন্যদের উপর আমার মনে প্রচন্ড ক্রোধের জন্ম হল। ওরা একদন্ডও আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না।

সাথীদের প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দিলাম। সৈন্যদের উপর আক্রমণ করে আদেল ভাইকে মুক্ত করে আনতে হবে। একটু সামনে অগ্রসর হওয়ার পর এক সাথী উচ্চস্বরে বলে উঠে, 'ওই তো আদেল ভাই!'

তাকিয়ে দেখি আদেল ভাই আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। কাছে আসার পর জানতে পারলাম, তিনিও একদিন পর্যন্ত জঙ্গলে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। তাকে অক্ষত অবস্থায় পেয়ে শান্ত হলাম এবং আস্তানায় ফিরে চললাম।

পরদিন জেলা কমাণ্ডার তাহের এজাজ আমাকে ফলারোস ত্যাগ করে টকিপুরা চলে যেতে বলল। সেখানে কী একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে বলে তিনি জানালেন।

আদেশ মত আমি টকিপুরা চলে গেলাম। তাহের এজাজ ভাই আমাকে সোগাম ক্যাম্পের উপর আক্রমণ করার আদেশ দিলেন। তাই সঙ্গীদের নিয়ে আবার সোগাম অভিমুখে রওনা হয়ে গেলাম।

আধাপথ অতিক্রম না করতেই খবর পেলাম যে, একজন জেনারেল চণ্ডিগ্রাম ক্যাম্প পরিদর্শনে আসছে। সুতরাং আগে তাকে 'স্বাগতম' জানানো প্রয়োজন। প্রথম প্রোগাম আপাততঃ মুলতবী করে সঙ্গে সঙ্গে আমি চণ্ডিগ্রামের দিকে রওনা হলাম।

১৯৯৫ সালের ১৪ই এপ্রিল রাত আটটায় সাথীদের নিয়ে আমি ক্যাম্পের কাছে উপনীত হই। প্রথমে সাথীদেরকে বিভিন্ন পজিশনে বসালাম। তারপর চারজন মুজাহিদ আর দু'টি মিসাইল নিয়ে আমি নিজে ক্যাম্পের আরো কাছে চলে যাই। মিসাইল দু'টো ক্যাম্প থেকে দু'শ গজ ব্যবধানে স্থাপন করলাম।

রাত ঠিক দশটার সময় মিসাইলে টাচ্ দেয়া হল। একটি মিসাইল অ্যামুনিশন ডিপোর উপর গিয়ে আঘাত হানে। আর দ্বিতীয়টি আঘাত হানে সৈন্যদের আবাসিক ব্যারাকে।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের উভয় স্থানেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। পরে জানতে পারলাম যে, আমাদের এ অভিযান অত্যন্ত সফল হয়েছে। ওয়ারলেস মারফত আমরা চন্ডিগ্রামের খবর সংগ্রহ করলাম, যা ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারকে প্রদান করা হচ্ছিল। 'ক্যাম্পে প্রচন্ড হামলা হয়েছে। বিস্ফোরণে বহু সৈন্য মারা গেছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে আছে অসংখ্য সৈন্য। কাজেই অনতিবিলম্বে সাহায্য পাঠানো হোক।'

একদিকে ব্যারাক বিধ্বস্ত হওয়ায় গোটা ক্যাম্পের সব সৈন্য ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে গেছে। অপরদিকে অ্যামুনিশন ডিপো থেকেও লাগাতার বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। এসব তামাশা আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করছিলাম। বড় মজা লাগছিল তখন।

দু' ঘন্টা পর সাহায্য নিয়ে সেখানে গাড়ীর বহর এসে পৌঁছে। পরে ওয়ারলেস মারফত জানতে পারলাম যে, আমাদের এ অভিযানে চল্লিশজন সৈন্য নিহত এবং সত্তরজন গুরুতর আহত হয়েছে। তাহের এজাজ এ সফল হামলার জন্যে অভিনন্দন জ্ঞাপন ছাড়াও আমাদের জন্য পঁচিশ হাজার রুপী পুরস্কার ঘোষণা করেন।

কয়েকদিন বিশ্রাম নেয়ার পর তাহের এজাজ ভাইয়ের মাধ্যমে জানতে পারলাম, সংগঠন আমাকে আযাদ কাশ্মীর চলে যাবার আদেশ করেছে। আমি এ আদেশ সানন্দে পালন করে কয়েকদিন পরই নিরাপদে আযাদ কাশ্মীর চলে আসি।

সমাপ্ত

মজলুম মুসলমানের রক্তস্নাত এক উপত্যকা কাশ্মীর। এককালের ভূস্বর্গ এখন ভারতীয় হায়েনার হিংস্রতার ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, হত্যা, লুণ্ঠন, নারীর সম্ভ্রমহানী এ উপত্যকার এখন নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রতিনিয়ত মানবতা পিষ্ট হচ্ছে ভারতীয় দানব বাহিনীর ভারী বুটের আঘাতে।

কিন্তু তাই বলে বীর কাশ্মিরীরা নিশ্চুপ বসে নেই। জুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদ আর আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিঘাত করে তাঁরা আযাদী অর্জনে বদ্ধপরিকর। হাজারো শহীদের রক্তস্নাত কাশ্মীরের জিহাদ এখন গণ-জিহাদে রূপান্তরিত। কাশ্মীরের প্রতিটি গৃহ এখন দুর্ভেদ্য দুর্গ, প্রত্যেক মুসলমানই এখন বীর মুজাহিদ। এই গণ-জিহাদের নেতৃত্ব প্রদানকারী কয়েকজন বীর সিপাহ্সালারের ঈমানদীপ্ত কাহিনী নিয়ে রচিত এ বইটি।

বইটির প্রতিটি কাহিনীর পরতে পরতে রয়েছে জিহাদ, শাহাদাত ও আল্লাহর মদদে ধন্য একদল মুজাহিদের বিচিত্র যুদ্ধ-কৌশলের হৃদয়কাড়া উপাদান। এক কথায় শহীদী খুনরাঙা জিহাদের দর্পণ বলা চলে বইটিকে । এ শুধু আপনাকে বই পড়ার আনন্দই জোগাবে না, ঈমানের সৌরভও বিলাবে।

জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন্স